প্রকাশক :
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

পরিবেষক :
ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

ছবি ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
নবশক্তি প্রেস
১২৩, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা-১৪

ব্লক :
প্রসেস সিণ্ডিকেট
৫০, ভোলানাথ পাল লেন

গ্রন্থনা :
ইস্টএণ্ড ট্রেডার্স
২০, কেশব সেন স্ট্রীট

মুদ্রক :
শ্রীরণজিৎ কুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা-১৪

পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা



শ্রীযুক্তা লীলা রায়কে

॥ বাংলার নারী জাগৃতির প্রগতিশীল আন্দোলনে
অগ্নি-স্বাক্ষরা বিপ্লববাদের দুঃসাহসী সংগ্রামে
সমাজবাদী আদর্শের নির্ভীক অনুসরণে
স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর অনন্য সহযোগীরূপে
যাঁর অমূল্য অবদান স্মরণের ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকবে
তাঁর করকমলে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে
অর্পণ করলাম ॥

॥ সমর ॥

ভূমিকা • ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার

প্রোপাগ্যাণ্ডা বা অপপ্রচার বর্তমান যুগের একটি বৈশিষ্ট্য। বিশ্বযুদ্ধের সময় এই নূতন অস্ত্রের আবিষ্কার হয়। তারপর মুসোলিনি, হিটলার ও রাশিয়ার কমিউনিস্ট দলের নেতাগণ এটাকে একটা বিশেষ সূক্ষ্ম শিল্পকলায় পরিণত করেন। গভর্ণমেণ্টের হাতে পড়ে এর প্রভাব মারাত্মক হয়ে উঠেছে। স্বাধীন ভারতেও গোড়া থেকেই গভর্ণমেণ্ট নিজের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য এই অস্ত্রের যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত,—স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রসঙ্গে গান্ধীজীর ঘটনাতিরিক্ত মাহাত্ম্য প্রচার। একমাত্র তাঁর অসহযোগ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহই যে ভারতবর্ষকে ইংরেজের অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত করেছে একথা প্রচার করবার জন্য কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট প্রথম থেকেই বিশেষ সজাগ ছিলেন। তাই ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট মধ্যরাত্রে যখন সারারাত্রি দিল্লীতে উৎসব চলল এবং বড় বড় নেতারা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী বিবৃত করলেন তখন সুভাষচন্দ্র বসুর নামও কেউ উল্লেখ করেননি।

কিন্তু সত্যকে চিরদিন চেপে রাখা যায় না। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহই যে আমাদের স্বাধীনতা লাভের একমাত্র কারণ—এটাকে জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ বলে এখন আর অনেকেই গ্রহণ করতে চান না। অপপ্রচারের ফলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে যে সত্যটা চাপা পড়ে ছিল তা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে। এখন অনেকেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে নেতাজীর অবদানও খুব বড়। কিন্তু এই ধারণা এখনও সাধারণের মনে পুরামাত্রায় বদ্ধমূল হয়নি। এর জন্য প্রয়োজন নেতাজীর সম্বন্ধে সত্য কাহিনী বহুল পরিমাণে দেশের মধ্যে প্রচার করা।

তা ছাড়া আর একটা কথা আছে। নেতাজীর কার্যাবলী সম্বন্ধে যেটুকু দেশের সাধারণ লোকে জানতে আরম্ভ করেছে তা তাঁর জীবনের বহিরঙ্গ

মাত্র। নেতাজীকে বুঝতে হলে তাঁর জীবনের মূল উৎস কোথায় সেটারও অনুসন্ধান করতে হবে। যাঁরা সংসারে বড় কাজ করেন তাঁরা প্রেরণা পান তাঁদের অন্তর্নিহিত উপলব্ধি থেকে। তাঁদের জীবনের আদর্শ, নীতি, চিন্তাধারা ও লক্ষ্য প্রভৃতি ভালরূপ না বুঝলে তাঁদের যথার্থ মূল্য ও স্বরূপ বোঝা যায় না। এদিক থেকে নেতাজীর সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা হয়নি। এই অভাব দূর করার জন্য এই গ্রন্থের লেখক কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেইগুলির সঙ্গে আরও কিছু যোগ করে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। জন্মভূমি সম্বন্ধে নেতাজীর আদর্শ কি ছিল, যার প্রেরণায় তিনি দেশের মুক্তির জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে পূর্ণতর জীবন লাভের আশা করেছিলেন—রাজনীতিকে তিনি কোন্ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেছিলেন—তাঁর ব্যক্তিত্বের কোন্ বৈশিষ্ট্যে লক্ষ লক্ষ নর-নারীর হৃদয়ে তিনি নেতৃত্বের গৌরবময় আসন প্রতিষ্ঠিত করে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজার অর্ঘ্য পেয়েছিলেন—এই রকম অনেক প্রশ্নের উত্তর পাঠক এই গ্রন্থে পাবেন।

নেতাজীর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য চিরদিন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এক প্রধান স্থান লাভ করবে। গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে একে একে কংগ্রেসের সকল নেতারাই নিজেদের বিচারবুদ্ধি গান্ধীজীর পাদপদ্মে বিসর্জন দিয়ে অন্ধ বিশ্বাসে তাঁর নির্দেশমত চলেছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তীব্র ভাষায় গান্ধীজীর মত ও পথের প্রতিবাদ করেছেন—কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে গান্ধীজির সম্মোহন শক্তি এত প্রভাবশালী ছিল যে মুখে প্রতিবাদ করলেও তিনি কাজের বেলায় গান্ধীজীর অনুসরণ না করে পারেননি। এই যুগে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কেবল সুভাষচন্দ্র বসুই গান্ধীজীর প্রভাব অতিক্রম করে নিজের স্বাধীন মত ব্যক্ত করতে এবং গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথে না চলে ভারতের মুক্তিলাভের অন্য উপায় নির্ধারণ করার সাহস ও শক্তি দেখিয়েছেন। আর কেবল উপায় নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর নির্ধারিত পথে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর ডাক শুনে সেদিন আর কেউ আসেনি,—তবু তিনি একলাই চলেছেন। কংগ্রেসের দুয়ার বন্ধ দেখে অমনি তিনি ফিরে যাননি,—বারে বারে সে রুদ্ধ দ্বারে কঠোর আঘাত করেছেন। এই অসীম শক্তি ও সাহসের যে পরিচয় নেতাজীর জীবনে পাই তার উৎস কোথায়—তা জানবার সময় এসেছে। কারণ আজ দেশে যে ঘোর দুর্দিন দেখা দিয়েছে তাতে নেতাজীর জীবনের এই বৈশিষ্ট্যই আমাদের একমাত্র আদর্শ

হওয়া উচিত। এছাড়া আমাদের উদ্ধারের আর কোন উপায় নেই। নেতার প্রতি যুক্তিহীন বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাহীন পূজা আজ ভারতবাসীকে সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আজ নেতাজীর আদর্শ ভারতবাসীর কাছে ফুটিয়ে তুলতে হবে। আলোচ্য গ্রন্থখানি এই উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছে। আমি আশা করি দেশবাসী মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠে নেতাজীর সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানতে পারবেন, এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হবার চেষ্টা করবেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার

পরিচয়

নেতাজী সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদপত্রে কতগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। প্রবন্ধগুলি নেতাজীর জীবনকাহিনী সম্বন্ধে নয়,—জীবনাদর্শ সম্বন্ধে লেখা। নেতাজীর জীবন-মানসের উৎস, তাঁর নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব, রাজনীতির দৃষ্টিকোণ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর অবদান এবং আজাদ হিন্দের বিপ্লববাদী বৈশিষ্ট্য,—এরূপ অনেক বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধগুলিতে। নেতাজীর সমন্বয়ী সমাজবাদের আদর্শ, সমাজবাদ ও কম্যুনিজম সম্বন্ধে নেতাজীর চিন্তাধারা, সমাজবাদী আদর্শের ভিত্তিতে নতুন ভারত রচনায় তাঁর পরিকল্পনা, ভারতীয় সমাজবাদী আন্দোলন সম্বন্ধে নেতাজীর প্রত্যাশা—সমাজবাদী চিন্তাধারা ও কার্যক্রম সম্বন্ধে নেতাজীর এরূপ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী এই প্রবন্ধগুলির মূল বক্তব্য বিষয়। গান্ধীজী ও নেতাজীর জীবন-দর্শনের ঐক্য ও পার্থক্য কোথায় একটি প্রবন্ধ তার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ। অপর একটি প্রবন্ধে যুব আন্দোলন সম্বন্ধে নেতাজীর আদর্শ বর্ণনা করা হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণকালে নেতাজীর বিপ্লববাদী ব্যক্তিত্ব এবং নেতাজীর তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের যে সুযোগ আমার হয় তাহাও প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। এই বইটি মূলত সেই প্রবন্ধাবলীরই একটি সংকলন।

বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার সময় প্রবন্ধগুলি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। নেতাজীর এরূপ অনুরাগীদের আগ্রহে এই প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রণের প্রয়াস। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় নেতাজীর বিভিন্ন ভাবাদর্শ প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে একই উদ্ধৃতি বা উক্তির কয়েকবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। পৃথক্ উদ্দেশ্যে পৃথক্ ভাবে লেখার জন্য যে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, আশা করি সহৃদয় পাঠকেরা সেকথা অনুধাবন করবেন।

আজকের রাষ্ট্র-নায়কদের ঔদাসীন্য, উপেক্ষা এবং সংকীর্ণতা সত্ত্বেও নেতাজীর জীবন ও আদর্শ এবং তাঁর বিপ্লববাদের কাহিনী ভারতবর্ষের

ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে যুগে যুগে আদর্শবাদীদের মনে বীর-জীবনের, বিপ্লবী জীবনের, স্বপ্নাচারী জীবনের অমর প্রেরণা সঞ্চার করবে। নেতাজীর জীবন ও আদর্শের প্রতি একজন আদর্শানুবর্তীর পরম শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপেই এই রচনাগুলির রূপায়ণ।

নেতাজীর রাজনৈতিক অবদানের ঐতিহাসিক স্বীকৃতির নির্ভীক স্বাক্ষররূপে বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই বইটির ভূমিকা লিখেছেন। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজীর বৈপ্লবিক ভূমিকাকে পূর্ণভাবে স্বীকার না করে যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়—এই সিদ্ধান্তটি প্রামাণ্য আস্থার সঙ্গে প্রকাশ করার জন্য ডঃ মজুমদার দিল্লীর কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনায় কেন্দ্রীয় কমিশনের সভাপতির পদকে বর্জন করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। এরূপ নির্ভীক-চেতা ঐতিহাসিকের প্রতি সমগ্র ভারত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করবে। এই বইটির ভূমিকা লেখার জন্য আমি শ্রদ্ধেয় ডঃ মজুমদারের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

'নেতাজীর মত ও পথ' নামের বইটি পুনর্মুদ্রণের জন্য বহু অনুরোধ এসেছে। কিন্তু শুধু পুনর্মুদ্রণ নয়,—বইটি নতুন তথ্যের আলোতে নতুন করে লেখা প্রয়োজন। কিন্তু কাজের চাপে একাগ্র মন নিয়ে লেখার সুযোগ করে ওঠা সম্ভব হয়নি বলে সে ইচ্ছা এখনও অপূর্ণ রয়েছে। তাই এই প্রবন্ধগুলির পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করে সে ইচ্ছার আংশিক পূরণের চেষ্টা করা হলো।

দ্বিতীয় সংস্করণে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ সংযোজিত হলো। এই লেখাগুলিও বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। নেতাজীর অনুগামী বাংলাভাষী জনসাধারণের কাছে এই লেখাগুলি সমাদৃত হওয়ায় কৃতজ্ঞ বোধ করছি।

এই বইয়ের রচনাগুলি পুনর্মুদ্রণের সুযোগ পাওয়ায় যুগান্তর, আনন্দবাজার, লোকসেবক ও জয়শ্রীর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধাবান প্রকাশক শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়ালের আন্তরিকতার জন্যই 'নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা' প্রকাশ করা সম্ভব হলো।

জয় হিন্দ্!

সমর গুহ

বিষয় সূচী

নেতাজীর
স্বপ্ন ও সাধনা

ভারত-পথিক

ইতিহাসের বুকে যারা রেখে যান অবিস্মরণের সোনার স্বাক্ষর তাঁরা শুধু কীর্তিতেই বড় নন,—তার চেয়েও অনেক বড় তাঁরা নিজেদের জীবন-কল্পনার অনুভূতিতে। অন্তরের কোন্ আবেদনে তাঁদের জীবন স্বপ্নময় হয়ে ওঠে সেই অন্তঃশীলার সন্ধান জানা সম্ভব না হলে শুধু কীর্তির পরিমাপ দিয়ে সেই মহান্ ব্যক্তিত্বের জীবন-মূল্য বিচার করা যায় না।

কোন্ অমৃতের আমন্ত্রণে সুভাষচন্দ্র প্রমূর্ত হলেন যুগনায়ক নেতাজীরূপে তারই উৎস সন্ধান করা হয়েছে 'ভারত-পথিক' এবং 'ভারত পথিকের ভারত-স্বপ্ন' এবং অন্যান্য প্রবন্ধ কয়টিতে।

হিমালয়ের ডাক শুনেও আবার কেন ফিরে এলেন ভারত-পথিক রাজনীতির হিংস্র-কুটিল আবর্তে, এই রাজনীতিকে দেখলেন তিনি কোন্ দৃষ্টিভঙ্গীতে,—তার পর্যালোচনা করা হয়েছে 'নেতাজীর রাজনৈতিক সাধনা' এবং 'নেতাজীর চোখে রাজনীতি' নামক প্রবন্ধে। নেতাজী যে স্বামীজীর উত্তর-সাধক সুভাষচন্দ্রের সেই পরিচয় বর্ণিত হয়েছে পরের লেখাটিতে।

ইতিহাস নেতাজীকে অভিনন্দিত করেছে এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর ও বিপ্লবীরূপে। নেতৃত্বের কোন্ বৈশিষ্ট্যে তিনি ইতিহাসের এই স্বীকৃতি লাভ করলেন 'নেতাজীর নেতৃত্ব' আখ্যার অন্য প্রবন্ধটি তারই একটি দার্শনিক নিরীক্ষা।

ভারত-পথিক

সন্ন্যাসী হয়েও বিবেকানন্দ ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক। কিন্তু প্যাট্রিয়টিজমের প্রচলিত অর্থে বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দেওয়া যায় না। তেমনি প্যাট্রিয়টিজম কথাটিকে সর্বোত্তম বিশেষণে বিভূষিত করেও এই শব্দটির সীমিত সংজ্ঞায় নেতাজীর ভারত-প্রেমের মর্মার্থ অনুধাবন করা যায় না। নেতাজীর ভারত-প্রেম যে পরম অনুভূতি থেকে উৎসারিত রাজনৈতিক স্বদেশপ্রেমের সংজ্ঞায় তার সামান্য ভাবার্থ মাত্র প্রকাশ পায়। নেতাজীর কাছে ভারত-প্রেম তাঁর জীবনধর্ম,—রাজনৈতিক বৃত্তি নয়। স্বদেশসেবার মন্ত্র নেতাজীর জীবনে মঞ্জুরিত হয়েছে আত্মোৎসর্গের আবেদনে। নেতাজী তাই বলেছেন, "নিজের জীবনকে পূর্ণরূপে বিকাশ করে ভারতমাতার পদাম্বুজে অঞ্জলিরূপে নিবেদন করবো,—এই আন্তরিক উৎসর্গের ভিতর দিয়ে পূর্ণতর জীবনলাভ করবো,—এই আদর্শের দ্বারাই আমি অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। স্বদেশসেবা বা রাজনীতির পর্যালোচনা আমি সাময়িক বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিনি।" এই আত্মোৎসর্গের অনুভূতিতে নেতাজীর প্রাণ-গঙ্গা কী প্রবল আবেগে প্রবাহিত হয়েছে তার আরেকটি তরঙ্গ-সংকেত উনিশ শ' চল্লিশ সালে আমরণ অনশনব্রতী সুভাষচন্দ্রের একটি পত্র। অনশন শয্যা থেকে তিনি লিখেন সরকারকে, "এই মর জগতে সব বিনাশ হয়ে

যায়, এবং যাবেও। কিন্তু বিনাশ নেই স্বপ্ন, আদর্শ ও মনীষার। আদর্শের সাধনায় ব্যক্তি বিলীন হতে পারে, কিন্তু তার অবলুপ্তির পরে আদর্শ পুনর্মূর্ত হয়ে ওঠে সহস্র আত্মায়। এ-ই আত্মার ধর্ম। ব্যক্তি আত্মাহুতি দেবে জাতিকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্য। আজ আমি প্রাণ অর্পণ করব,—যেন ভারত বেঁচে উঠতে পারে, লাভ করতে পারে গৌরবময় মুক্তি।") এই আত্মিক ধর্মের পরম আবেদনে নেতাজী স্বদেশ-সেবাব্রতের সাধনা গ্রহণ করেছিলেন বলেই তাঁর কাছে ভারত-প্রেম শুধু প্যাট্রিয়টিজম নয়,—তার চেয়ে অনেক বেশী। জন্মভূমি ভারত নেতাজীর কাছে এক মহাতীর্থ। এই মহাতীর্থের জীবন-বাণী প্রচারই তাঁর জীবনের মৌল ধর্ম।

নেতাজীর কাছে জন্মভূমি ভারততীর্থের এক মহত্তর অনুভূতি। নেতাজী সারা জীবন ভরে বিশ্বাস করেছেন যে এই ভারত-তীর্থের একটি বাণী আছে, একটি মিশন আছে। তিনি তাই বলেছেন, "উগ্র স্বদেশ-প্রেমিকের আখ্যা পাওয়ার ঝুঁকি নিয়েও আমি বলব যে ভারতের একটি বাণী আছে এবং তাহার জন্যই আজও ভারত বেঁচে আছে। এই বাণী শব্দের মধ্যে রহস্যের কিছুই নেই। ভারতকে বিশ্বের সংস্কৃতি ও সভ্যতায় নতুন কিছু অবদান তুলে ধরতে হবে।"

কোন্ প্রাণদায়িনী শক্তিতে ভারতের জীবনধারা মহাকালের নিরন্তর সংঘাতেও এমনি অব্যাহত রইল? যুগে যুগে ভারতে পরিবর্তন ঘটেছে, ভারত নতুন যুগের সঙ্গে এগিয়েও গেছে তবুও মূলত একই সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারা প্রবাহিত রয়েছে ভারতের জাতীয় জীবনে। বর্তমানের অভিযাত্রায় অতীতের প্রাণ সঞ্চরণ সম্ভব হয়েছে ভারতের একটি বিশিষ্ট জীবন-ধর্মের অবদানে। ভারতের এই জীবনধর্ম হল তার সমন্বয়বাদ। ভারত আত্মমুখী নয়, আবার আত্ম-বিবাগীও নয়। ভারতের দৃষ্টি চিরকাল সর্বজনীন।

নেতাজীর আশা ও বিশ্বাস ভারত তার এযুগের জীবনধর্ম গড়ে

তুলবে এই সমন্বয়ী জীবন-দর্শনের আবেদনে। বিশ্বের যেখানে যে-কোন কল্যাণকর আদর্শ গড়ে উঠবে, ভারত সাগ্রহে তার অনুধাবন করবে, সানন্দে তার প্রতিটি কল্যাণকর অবদান গ্রহণ করবে নিজের জীবনধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে, নিজের ইতিহাস ও দর্শনের রসায়নে তাকে নিজস্ব করে নিয়ে। কিন্তু কেউ কেউ জাতীয় সমৃদ্ধির নামে বা সমাজবিপ্লবের নামে একদিকে পাশ্চাত্য জীবনধারা এবং অন্যদিকে কম্যুনিজম ও রাশিয়ার অন্ধ অনুসরণ প্রয়াসী। তাদের কাছে ভারতের জীবন-বৈশিষ্ট্যের কোন দাম নেই,—ভারতীয়তা, সমন্বয় ইত্যাদি শব্দগুলি জাতীয় ভাবালুতার ঝংকার মাত্র। একদল মনে করেন,—আর্থিক বৈভবের জন্য চাই পাশ্চাত্যের ভোগবাদী বৈষয়িক জীবন-দর্শন। আরেক দল মনে করেন বিপ্লব চাই,—ভারতের সমাজ-ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে দিয়ে চাই সম্পূর্ণ নূতন জীবন এবং কম্যুনিজম হল এই বিপ্লবের জীবন-দর্শন এবং রুশিয়া তারই স্রষ্টা। এই আত্মবিস্মৃত ভ্রান্ত পথিকদের দু'দলকে লক্ষ্য করেই নেতাজী তাই বলেছেন, "যারা আধুনিকতার অত্যুৎসাহে অতীতের গৌরবকে ভুলে যায়, আমি তাদের দলে নই। প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিত্তিতেই আমরা নতুন ও আধুনিক জাতি গড়ে তুলব। এক কথায় আমাদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কল্যাণকর দিকগুলির পরিপূর্ণ সমন্বয় সাধন করতে হবে।" কম্যুনিজমের অনুসরণ-প্রয়াসীদের লক্ষ্য করেও তিনি বলেছেন, "মার্ক্স ইজমের (কম্যুনিজম) তরঙ্গ এদেশে এসে পৌঁচেছে। এই তরঙ্গের আঘাতে কেউ কেউ চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। মার্ক্সের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করলে আমাদের দেশ সুখে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে বলে অনেকে মনে করেন এবং দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রাশিয়ার দিকে আঙুল দিয়ে দেখান। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, আমি অন্য দেশের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানের অন্ধ অনুকরণের ঘোর বিরোধী। প্রগতির জন্য রাশিয়ার দিকে চেয়ে থাকা আমাদের নির্বুদ্ধিতা হবে।" 'ভারতীয় সংগ্রাম' বইটিতে একথাটিই তিনি

খুব সোজাসুজিভাবে ব্যক্ত করে বলেন যে, "ভারত কখনও রাশিয়ার দ্বিতীয় সংস্করণে পরিণত হবে না।"

ভারত তা' হলে কোন্ পথে অগ্রসর হবে? নেতাজী খুব স্পষ্ট করে বলেছেন, ভারতের জীবন-দর্শন হবে সমন্বয়বাদ এবং এ-যুগে তার রাজনৈতিক রূপায়ণ হবে সমাজবাদের আদর্শে। কিন্তু এই সমাজবাদ কম্যুনিজম নয়,—এই সমাজবাদের রচনা হবে জীবন ও জগতের বিভিন্ন মূল্য-মানের অবদানে রচিত একটি সমন্বয়ী দর্শনে। এযুগের ভারতবর্ষকে রচনা করিতে হবে সমাজবাদের এই নয়া-দর্শন এবং তার বাস্তব রূপায়ণের পরিকল্পনা। নেতাজী তাই ১৯৩৩ সালে বলেছেন, "আমি পরিপূর্ণ সমাজবাদ চাই। কিন্তু ভারতকে তার সমাজবাদী আদর্শ ও পন্থা নিজেকেই উদ্ভাবিত করতে হবে। ভারতে যে সমাজবাদ গড়ে উঠবে, অনেক দিক দিয়ে তার অবদান হবে মৌলিক ও নতুন এবং সারা বিশ্বও এই সমাজবাদী আদর্শে উপকৃত হবে।" এই কথাটিই সমাজ-দর্শনের ঐতিহাসিক ধারায় ব্যাখ্যা করে ১৯৩৩ সালে আবার তিনি বলেছেন, "স্বাধীন ভারতে নতুন ও মৌলিক পরীক্ষার প্রয়োজন হবে। অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। সতের শতাব্দীতে ইংলণ্ড বিশ্বকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের চিন্তাধারা উপহার দিয়েছে। ফ্রান্স সাম্য, মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রের আদর্শে বিশ্বের সংস্কৃতিকে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। উনিশ শতাব্দীতে জার্মানী বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে মার্ক্সীয় দর্শন। বিংশ শতাব্দীতে প্রোলেটারিয়েট রাষ্ট্র গঠন করে বিশ্বকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে রাশিয়া। বিশ্বের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক জীবনে এর পরবর্তী অধ্যায়ের অবদান তুলে ধরতে হবে ভারতকে।"

এই সমন্বয়-ধর্মই নেতাজীর কাছে ভারত-বাণীর মর্মার্থ। সমন্বয় ধর্মের অনুভূতিতে স্বাধীন ভারত তার সমাজ-দর্শন গড়ে তুলবে এবং ভারতের এই সমাজদর্শন এক বিশ্বজনীন আবেদনে সারা পৃথিবীর সামনে

তুলে ধরবে মানব-প্রগতির এক নূতন আলো,—এই স্বপ্ন ও বিশ্বাস নেতাজীর কর্ম-জীবনকে অপূর্ব প্রেরণায় আদর্শোদ্দীপ্ত করেছে। এই ভারত-বাণীকে সার্থক করে তোলার জন্যই তিনি গ্রহণ করেছেন ভারত-পথিকের মহান্ ভূমিকা। ভারত-পথিক তাঁর স্বপ্ন-সাধনাকে সার্থক করে তোলার প্রয়াসে এযুগের ভারত-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় পূর্ণ করেছেন। অনাগত ভারতের দ্বিতীয় অধ্যায়কে পূর্ণ করার জীবন-ব্রত আজ গ্রহণ করবে কোন্ অভিযাত্রীর দল ?

—যুগান্তর

ভারত-পথিকের ভারত-স্বপ্ন

পৃথিবীর আর কোন দেশেই বোধ হয় জাতীয়তা, জাতীয় ঐক্য ও দেশপ্রেমের প্রমূল্য এমনতর আত্মিক ও সাংস্কৃতিক অনুভূতির উপর গড়ে ওঠেনি, যেমন করে গড়ে উঠেছে ভারত-ভূমিতে ভৌগোলিক সংহতিতে ভারতবর্ষ এক অপূর্ব দেশ, কিন্তু এই বিশাল দেশের ভারতীয়তাবোধের মূল উৎস ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক সংজ্ঞার উর্ধ্বে। দু হাজার বছরেরও আগে থেকে মাটি-জল-মানুষের একটি বিস্তীর্ণ ভূমিকে 'জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরিয়সী'রূপে আত্মিক অনুভূতির মহান্ আরাধনায় অধিষ্ঠিত করার এরূপ ঐতিহ্য বিশ্বের আর কোথাও নেই। এই দিক থেকে ভারতীয়তাবোধ অনন্য, অসাধারণ এবং এক অন্তঃশীলারূপে সুগভীর।

পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রীয় জাতীয়তা বা 'স্টেট ন্যাশনালিজমের' অনুকরণে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বুনিয়াদ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে যে প্রয়াস দেখা যায়, তার অনৈতিহাসিকতা ও সাময়িকতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে স্বামী বিবেকানন্দ সর্বপ্রথম একথা বলেন যে, রাজশাসন বা ভৌগোলিক সংহতি ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করেনি,—ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে ঋষি ও মনীষীদের আত্মিক ও সাংস্কৃতিক ভাবাত্মক অবদানে। গত তিন হাজার বছরের ইতিহাসে ভারত বারবার রাজনৈতিক শক্তি বা সংঘাতে, তথা একই

রাজশাসনে ঐক্যবদ্ধ বা বহু রাজশাসনে বিখণ্ডিত হয়েছে, কিন্তু পুরুষপুর থেকে কামরূপ বা কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকার মানুষের মনে অখণ্ড ভারতীয়তাবোধের অনুভূতি কোনদিন বিখণ্ডিত হয়নি। ভারতের চার কোণে শংকরাচার্যের চতুর্মঠ স্থাপন, সমগ্র ভারততীর্থে আটান্ন পীঠের অধিষ্ঠান, প্রাত্যহিক মন্ত্রের মধ্যে গঙ্গা-যমুনা ও নর্মদা-গোদাবরী এবং কাশী ও কাঞ্চির সংযোজন, সঙ্গীত ও শিল্পকলায় উত্তর-দক্ষিণের সমন্বয়,—এমনি আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য-গ্রন্থনে ভাব-ধর্মী ঐক্য ও আত্মিক প্রেমের এক অবিনাশী প্রমূর্তিরূপে গড়ে উঠেছে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ। ভারতীয়তা বোধের এই অন্তর্রূপ এযুগে সর্বপ্রথম অভিব্যক্ত করেন বিবেকানন্দ এবং তারই অনুরণন প্রগাঢ় কণ্ঠে এবং আধুনিক সংজ্ঞায় পুনরায় উদ্গীত হয় ভারত-পথিক সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে।

আত্মিক অনুভূতিতে একাত্ম-প্রাণ বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্রের কাছে দেশপ্রেম তাই পাশ্চাত্য প্যাট্রিয়টিজমের অনুসরণে একটি ভৌগোলিক সংস্থার প্রতি রাজনৈতিক আনুগত্য জ্ঞাপনের তাৎপর্যে সীমাবদ্ধ নয়, তাঁদের কাছে ভারতবর্ষ এক চিরন্তন অধ্যাত্ম-মূল্যের চিন্ময়ী মূর্তি। এজন্যই বিবেকানন্দ নিজের পরিচয় রেখে গেছেন ভারত-তীর্থের 'পরিব্রাজক'রূপে এবং সুভাষচন্দ্র আত্মপরিচয় দিয়েছেন 'ভারত-পথিক' নামে। এজন্যই এই মহান্ ভারত-সন্তানদ্বয়ের কাছে জন্মভূমি ভারতবর্ষ শুধু একটি জল-মাটির দেশ নয়, এক 'দেবাত্ম মাতৃভূমি'—'এ ডিভাইন মাদারল্যাণ্ড'। এজন্যেই ভগিনী নিবেদিতার ভাষায় "The Queen of his (Vivekananda) adoration was his motherland." এবং এই প্রেরণাতেই আবেগোষ্ণ কণ্ঠে বিপ্লবী সুভাষ বলেছেন, "নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকাশ করে ভারতমাতার পদাম্বুজে অঞ্জলিরূপে নিবেদন করবো, এই আদর্শেই আমি অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। স্বদেশসেবা বা রাজনীতি আমি সাময়িক বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিনি।"

ভারতের যে নেতৃত্ব আহমেদনগর দূর্গে 'ভারত আবিষ্কার' করেও ভারতের আত্মাকে আবিষ্কার করতে পারেনি, তাঁদের কাছে ভারতবর্ষ ছিল ভৌগোলিক সংগঠনে আবদ্ধ একটি বহু জাতির সংযুক্ত জাতি বা 'মাল্টি ন্যাশনাল নেশন' মাত্র এবং তারই ফলে সেই নেতৃত্বের অনুভূতিতে ভারত-ব্যবচ্ছেদের সিদ্ধান্ত কোন প্রচণ্ড আত্মিক মন্থন সৃষ্টি করেনি। (কিন্তু ভারত-ব্যবচ্ছেদের ওয়াভেল পরিকল্পনার সংবাদ যেদিন সুভাষচন্দ্রের কাছে গিয়ে পৌঁছে, সেদিনে ব্যাকুল কণ্ঠে আত্মহারা সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুণ থেকে ভারতবাসীকে উদ্দেশ করে বার-বার বেতার ভাষণে বলেছিলেন, "আমাদের মাতৃভূমি বিখণ্ডনের পাকিস্তানী পরিকল্পনার আমি ঘোর বিরোধী। আমাদের দেবাত্ম মাতৃভূমিকে কোনমতেই খণ্ডিত করা চলবে না—"আওয়ার ডিভাইন মাদারল্যাণ্ড শ্যাল নট বি কাট।")

ভারত-ব্যবচ্ছেদের চরম অপরাধের পরে আজ আবার ভাষার সংঘাতে রাষ্ট্র বিখণ্ডন প্রয়াসের নতুন কম্পন সৃষ্টি করেছে। ভাষা কোনদিন ভারতের সংহতি আনেনি, আবার এদেশের বহু ভাষা অসংহতির ইন্ধনও যোগায়নি। 'জননী জন্মভূমি ভারতমাতা'র সুদীর্ঘ ইতিহাসে হিন্দীর জন্ম তো মাত্র কয়েক শতাব্দীর। হিন্দীই ভারতের ঐক্য বিধানের একমাত্র বুনিয়াদ,—এমন কৃত্রিম রাষ্ট্র-গ্রন্থীর কথা নেতাজী কোন সময়েই স্বীকার করেননি। ভুখা-বেকারী এবং শিক্ষা-সমস্যার সমাধানের উপরেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র জোর দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। সবার উপরে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন ভারতের ঐক্য, সংহতি ও ভারতীয়তা-বোধের সুগভীর অনুভূতির ভিত্তিতে এক সৃজনানুগ ও শক্তি-ধর্মী ভারতীয় জাতীয় মানসিকতা সৃষ্টির উপরে।

বিশ্বের কত প্রাচীন সভ্যতা আজ ইতিহাসের জীর্ণ কংকালে পরিণত হয়েছে, কিন্তু অতীতের দূরান্ত থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়ে কেন ভারতের জীবনধারার এক বিস্ময়কর প্রাণচাঞ্চল্য আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে? ইতিহাস সমীক্ষণের আলোকে নেতাজী তার উত্তর

দিয়ে বলেছেন, "ভারতের একটি মিশন আছে।...তাই মিশর বা ব্যাবিলন, কোয়েনিশিয়া বা গ্রীসের মত ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতা মরে যায়নি। অতীতের দিনের মত আজকের দিনেও ভারত-বাসীর জীবনে প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। এরূপ ধারাবাহিকতা মানব-ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রী ঐতিহ্যের অন্ধ অনুকরণে যারা উদ্বেল বা ভারতের বুকে কম্যুনিজমের স্বর্গরচনার আগ্রহে যারা দিশেহারা,—সেই পরানুশ্রয়ীদের সতর্ক করে দিয়ে নেতাজী বলেছেন, 'বাইরের আলো ও অনুপ্রেরণা গ্রহণ করার সময় আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে, আমরা অন্য কোন দেশকে অন্ধভাবে অনুকরণ করতে পারি না। অন্য দেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাকে অনুধাবন করার পরে আমাদের জাতীয় প্রয়োজনের অনুপাতে তা আমরা গ্রহণ করবো।"

ভারত স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু এখনও এক বলিষ্ঠ ভারতীয় জীবন-দর্শন রচনা করা সম্ভব হয়নি। তাই একদিকে লণ্ডন-ওয়াশিংটন এবং অন্যদিকে মস্কো-পিকিংয়ের স্বার্থ-তরঙ্গ এসে আমাদের আঘাত করছে। ভারতে আজ প্রয়োজন নেতাজীর আদর্শব্রতী এক ভারত-ধর্মী প্রবল জাতীয়তাবাদ। 'ভারতের একটি বাণী আছে,'—নেতাজীর এই স্বপ্ন নতুন ভারতের চিত্তলোকে এক বিপুল-আহ্বান সৃষ্টি করতে সক্ষম হলে তবেই ত্যাগ, সংগ্রাম ও বিকাশের আমন্ত্রণে ভারতের তরুণ-মনকে নতুন ভাবোদ্দীপনায় স্বপ্নাচারী করে তুলতে সক্ষম হবে। 'নেতাজীর জীবনবাদই আমাদের জীবনবাদ'—এই পরম অনুভূতিতে তরুণ ভারতের বুকে নতুন প্রাণ-চাঞ্চল্য সৃষ্টি হোক। ভারতীয়তাবোধের আমন্ত্রণে জয় হোক ভারত-পথিকের ভারত-স্বপ্ন!

—আনন্দবাজার

স্বামীজীর উত্তরসাধক নেতাজী



স্বামীজী ও নেতাজী ভারতের জাতীয় পুনর্জাগরণ ও পুনঃ-প্রতিষ্ঠার শুধু মহত্তম অগ্রদূত নন, এই দুই কালজয়ী মহাপ্রাণ এ-যুগের নবজাগ্রত ভারতবর্ষের এক যুগধর্মী জীবন-দর্শনের জীবন্ত প্রতীক। ভাব, চিন্তা ও কর্মবাদের দর্শনে বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র অবিচ্ছেদ্য। বস্তুত, স্বামীজীর জীবন-ইতিহাসের অনুধাবন ব্যতীত সুভাষ-জীবনের ঐতিহ্য বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ। এই দুই যুগ-পুরুষের জীবনকথার যথার্থ পর্যালোচনা করতে হলে বলতে হয় যে একই প্রাণপ্রবাহের, একই জীবন-দর্শনের দুই ঐতিহাসিক পর্ব হলেন এই দুই অগ্নিহোত্রী,—স্বামীজী প্রাক্-যুগের, নেতাজী উত্তর-যুগের। নেতাজীকে স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্য বা মানসপুত্র বলা হয়। কিন্তু এরূপ পরিচয়ও পূর্ণাঙ্গ নয়। স্বামীজী ও নেতাজী একই জীবনধর্মের দ্বয়ী তরঙ্গ,—কালের সামান্য ব্যবধানে শুধু যুগ-ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এক পর্ব আগে জন্মালে নেতাজী হতেন স্বামীজী এবং পরের পর্বে আবির্ভূত হলে বিবেকানন্দ হতেন সুভাষচন্দ্র। স্বামীজী ও নেতাজীকে না বুঝলে আধুনিক ভারতের নবজাগরণের প্রাণধারাকে বোঝা সম্ভব নয়,—আগামী দিনের নব ভারত রচনার স্বপ্ন-সাধনার উদ্‌গীতিও থাকবে তা'হলে অসম্পূর্ণ।

আধুনিক কালের ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অনেক রাজ-

নৈতিক নেতার জীবনী নিয়ে আলোচনা হয়েছে। গান্ধীজী লাভ করেছেন জাতির পিতার আসন। আরও কেউ কেউ রাষ্ট্রগুরু ও রাষ্ট্রীয়তার জনকের শ্রদ্ধা ও অভিব্যক্তি লাভ করেছেন ভারতের জনতা ও ইতিহাসের কাছে। কিন্তু বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভূমিকার যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপণ এখনও করা হয়নি। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে জাতীয় চেতনা প্রবল হয়ে উঠেছে,—কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে যিনি ভারতের এই নবজাগ্রত চেতনার উৎস, অনুভূতি, কল্পনা ও আকারের সত্তা নিরূপণ করে ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মান নতুন মূল্যায়নে নির্ণীত করে ভারতবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় গর্বের নতুন ভিত্তি রচনা করেছেন তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ তাই ভারতের জাতীয় পুনর্জাগরণের উদ্গাতা,—"ফাদার অব ইণ্ডিয়ান রেনেশাঁ।" সেই রেনেশাঁর বাস্তব রূপায়ণের বিপ্লবী যুগনায়ক হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

বিবেকানন্দ যে দৃষ্টি দিয়ে ভারতীয় ইতিহাসের বিচার করেছেন এবং আগামী দিনের জীবনধর্মের জন্য যে জীবন-বাণীর সন্ধান করেছেন নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনাকে উদ্দীপ্ত করেছে সেই দর্শন ও জীবন-বাণী। বৈদান্তিক বিবেকানন্দ আধুনিকতাবাদী, বিজ্ঞানধর্মী,—নেতাজীও তাই। কিন্তু বিবেকানন্দের আধুনিকতা ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীন মূল্যকে বাদ দিয়ে নয়। উনবিংশ শতাব্দীর আর সব যুগ-নেতাদের সঙ্গে এখানেই বিবেকানন্দের পার্থক্য। নতুন যুগের নতুন কাঠামে চিরন্তন ভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে বিবেকানন্দ চেয়েছেন আধুনিক ভারতের জীবনধর্ম রচনা করতে। ভারতীয় প্রমূল্যকে অস্বীকার করে নয়, ভারতীয় ইতিহাসের ধারাকে বর্জন করেও নয়,—তিনি এ যুগের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদ, বৈষয়িক-বাদকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন বাহনরূপে,—প্রাণ-শক্তিরূপে নয়। অতীতের আচার বা কালের ব্যবধানে আজ কুসংস্কারে পরিণত

হয়েছে,—যে নীতি নিয়ম, আজ যার দাম জঞ্জাল বা জীর্ণ বন্ধনের বেশি নয়,—বিবেকানন্দ নির্মমভাবে তা' বর্জন করার নির্দেশ দিয়ে আমূল সংস্কারের কথা বলেছেন।

নেতাজীর দৃষ্টিও অবিকল স্বামীজীর ন্যায়। 'বেদের যুগে ফিরে চল',—এই ধ্বনিকে নেতাজী যেমন তিরস্কার করেছেন, তেমনি তিনি অগ্রাহ্য করেছেন আধুনিকতার নামে উগ্র পাশ্চাত্য বিলাসবাদ বা সুখবাদকে। বিবেকানন্দের মতই নেতাজী বলেছেন যে, পৃথিবীর বহু প্রাচীন জাতির জীবনসত্তা নিঃশেষ হয়ে গেছে কিন্তু বহু ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে, নানা রূপান্তরের পথে নিজের জীবন-ধর্মকে অবিকৃত রেখে ভারতবর্ষ আজও বেঁচে আছে। ভারত, ভারতের ইতিহাস, ভারতের মানুষ,—ভারতবর্ষ নেতাজীর কাছে জননী জন্মভূমি। বিবেকানন্দের কাছে 'যৌবনের উপবন বার্ধক্যের বারাণসী' এই 'দেবভূমি ভারতবর্ষ'। বিবেকানন্দ বলেছেন, "ভারতের একটি বাণী আছে" এবং মনীষী রোলাঁর ভাষায় এই বাণী নিয়েই 'হৃদয় দিয়ে' বিবেকানন্দ অর্ধ পৃথিবী জয় করে এসেছেন। নেতাজীর কণ্ঠেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে এই ভারত-বাণীর মর্মকথা। ভারতবর্ষ ও ভারতের ইতিহাস, ভারতের সংস্কৃতি ও চিরন্তনী জীবনধর্মের প্রতি স্বামীজী ও নেতাজীর যে অগাধ আস্থা ও আনুগত্য, এ শুধু রাজনৈতিক স্বাদেশিকতা বা প্যাট্রিয়টিজমের অভিব্যক্তি নয়,—এর তাৎপর্য তার চেয়েও অনেক সুগভীর। চিরন্তনের যে ডাকে মানুষ সর্বত্যাগী হয়, তারই উৎসে জন্মলাভ করেছে স্বামীজী ও নেতাজীর ভারত-প্রেম। স্বামীজী তাই 'দেবভূমি ভারতবর্ষের'—'পরিব্রাজক', নেতাজী ভারত-বাণীর উদ্গাতা—'ভারত-পথিক'।

স্বামীজীর কাছে, ভগ্নী নিবেদিতার ভাষায় "The Queen of his adoration is his motherland." নেতাজীর কাছেও 'রাজনীতি পেশা বা বৃত্তি নয়,'—জন্মভূমির সেবা তাঁর "জীবনের জপ-তপ ও স্বধ্যায়।" বিবেকানন্দ তাই স্বদেশ-প্রেমের অগ্নি-

পরীক্ষার শর্ত দিয়ে বলেছেন, "তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব কর যে কোটি কোটি লোক অনাহারে মরছে? এদের ভাবনা কি তোমার রক্তের সঙ্গে মিশে শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে? এদের জন্য কি নাম, যশ, স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পত্তি,—এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলতে পার?" কিন্তু এই প্রশ্ন করেই স্বামীজী আবার ভেবেছেন দেশপ্রেমের এই দীক্ষার জন্য "লেকচার-ফেকচারে কিছু হবে না,—এজন্য প্রয়োজন জ্বলন্ত জীবন্ত প্রতীক।" ভারত-প্রেমের এই জ্বলন্ত প্রতীক স্বামীজী নিজে এবং তাঁরই উত্তর-সাধক নেতাজী সুভাষচন্দ্র। আদর্শ সাধনার পথে জীবন-মৃত্যু যেন কিছুই নয়,—এমনি স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্বিতায় অনশনব্রতী সুভাষচন্দ্র তাই কারাগার থেকে লিখতে পেরেছিলেন, "আদর্শের সাধনায় ব্যক্তি বিলীন হতে পারে, কিন্তু তার অবলুপ্তির পরে আদর্শ পুনর্মূর্ত হয়ে ওঠে সহস্র আত্মায়। এই আত্মার ধর্ম। আজ আমি প্রাণ অর্পণ করব,—যেন ভারত বেঁচে উঠতে পারে, লাভ করতে পারে গৌরবময় মুক্তি।" জীবন ও মৃত্যু এমন সমার্থের ঘটনা সুভাষচন্দ্রের জীবনকে প্রাণজয়ী করে তুলছে। আদর্শের জন্য মৃত্যু ও লাঞ্ছনাকে অস্বীকার করার এমনি অপূর্ব ঐতিহ্য পৃথিবীর ইতিহাসে, অন্তত এযুগে, আর দ্বিতীয় নিদর্শন নেই। বিবেকানন্দের ভারত-প্রেমের অগ্নিহোত্রী প্রতীক হলেন সুভাষচন্দ্র।

বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র,—দুজনেই দুর্বার বিপ্লবী। কোন বাধা, কোন স্তব বা নিন্দা এই দুই বিপ্লবীকে তাঁদের জীবন-ব্রত থেকে কিঞ্চিৎ বিচ্যুত করতে পারেনি। বিবেকানন্দের নিজস্ব মতবাদের জন্য বৈদান্তিক সন্ন্যাসীরা তাঁকে একঘরে করে নানাভাবে প্রচণ্ড বাধা দিয়েছিল। বিবেকানন্দ সনাতন ধর্মের প্রমূল্যে বিশ্বাসী হয়েও সনাতনী হতে চাননি। তিনি সন্ন্যাসের প্রচলিত নিষ্কর্মবাদকে প্রবল কর্ম-ধর্মে রূপান্তরিত করেছেন, নারী ও শূদ্র সমাজের সম-অধিকারবাদের সপক্ষে সদর্পে ঘোষণা করেছেন, বর্ণাশ্রম ধর্মের

প্রচলিত রীতিকে অস্বীকার করে শূদ্র সমাজের জাগরণ ও প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে সমগ্র সমাজকে ব্রাহ্মণ্য জীবন-ধর্মের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প প্রকাশ করেছেন। তিনি শিবের পাশে জীবকে এনে নতুন মানবতাবাদের স্বপ্ন দেখেছেন। বিজ্ঞানের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত করেছেন ধর্ম, ম্লেচ্ছতার অপবাদের সমস্ত ভ্রূকুটিকে উপহাস করে আবার তিনি ভারতের বাণীকে বিশ্বজনীন বিস্তৃতিতে পরিব্যাপ্ত করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এমনি সত্যার্থী বিপ্লবী যাঁরা, স্বামীজীর কথায় "নীতি নিপুণ পণ্ডিতদের নিন্দা-স্তবে লক্ষ্মীদেবীর আসাযাওয়ায়, আজ বা কালের মৃত্যুতে,—তাঁরা বিচলিত হন না।"

সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠেও এমনি আপস বিরোধী বিপ্লবী দুর্জয় ধ্বনি ঃ "একটু আধটু সংস্কারে কিছু হবে না, ভারতের যা চাই তা' হল আমূল রূপান্তর।" এমনি সত্যার্থী বিপ্লবীর প্রকৃতির জন্যই গান্ধীজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও গান্ধীবাদের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করতে রাজী হননি। গান্ধীবাদের বিরোধিতা করতে যেয়ে কত বড় বড় নেতা ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছেন কিন্তু সারা জীবন গান্ধীজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রেখেও নেতাজী নিজস্ব জীবনবাদের বিদ্রোহকে জয়যুক্ত করেছেন। স্বামীজীর ন্যায় সুভাষচন্দ্রের সমগ্র অস্তিত্বে রয়েছে বিপ্লবীর 'চরম ঔদ্ধত্য'। ভারত থেকে অজানার অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়ার আগে তাই মান-সম্ভ্রম ও ভবিষ্যতের প্রতি একবার দৃকপাতও করেন নি। আজাদ হিন্দের অগ্নি-ভাস্বর কাহিনী রচনা করে আবার সেই বিপ্লবী মিলিয়ে গেছেন অন্ধকারের অন্তরালে। ধর্ম-বিপ্লবী বিবেকানন্দ আবার পূর্ণমূর্ত হয়ে উঠেছেন রাষ্ট্রবিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের মধ্যে।

বিশ্বের মৌল স্বরূপের উপলব্ধিতে স্বামীজী ও নেতাজীর সত্য দর্শনও ঘটেছে একই দৃষ্টিভঙ্গীতে। নিত্য সত্য বা অ্যাবসল্যুট ট্রুথের কোন বাহ্য প্রকাশ সম্ভব নয়,—তাই সত্যের যে প্রকাশ তা' আপেক্ষিক, রিলেটিভ। স্বামীজীর নিজের ভাষায় "সকল সত্যই

আপেক্ষিক সত্য, রিলেটিভ ট্রুথ,—নিত্য সত্য বা অ্যাবসল্যুট ট্রুথ মন-বুদ্ধির অগম্য। সত্য নিত্য কিন্তু বিভিন্ন মন-বুদ্ধির কাছে বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়।" একই সত্যানুভূতি প্রতিধ্বনিত হয়েছে ভারত-পথিকের আত্মজীবনীতে। সুভাষচন্দ্রের ভাষায়ঃ Truth as is known to us is not absolute, but relative. It is relative to our common mental constitution,—to our distinctive characteristics as individual." কিন্তু সমস্ত আপেক্ষিক সত্যের মর্মবাণীতে বিবেকানন্দের মতই সুভাষচন্দ্রও অনুভব করেছেন আত্মার স্পন্দন ধ্বনি। সুভাষ নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছেনঃ "কেন আমি আত্মায় বিশ্বাস করি? কারণ, এ আমার প্রত্যক্ষ প্রয়োজন, আমার প্রকৃতির দাবী। আমি অনুভব করি যে আমি শুধু অণু-পরমাণুর সৃষ্টি নই। আমি আমার জীবনে এক গভীর উদ্দেশ্যের সন্ধান পাই।"

ভারতের ইতিহাস, সত্যের আপেক্ষিকতাবাদ ও বিবর্তনবাদে বিশ্বাস,—এই ত্রয়ী প্রমূল্যের সংযুক্তিতে গড়ে উঠেছে স্বামীজী ও নেতাজীর সমন্বয়ী জীবনদর্শন। দুজনেই এই সমন্বয়ের বাণীকে এযুগের ভারত-বাণী বলে ব্যক্ত করেছেন এবং এই যুগধর্মী ভারত-বাণী প্রচার করার জন্যই স্বামীজীর ন্যায় অবিকল্প ভাষায় নেতাজীও অনুভব করেছেন,—'আমার জীবনের একটি উদ্দেশ্য আছে,—আই হ্যাভ এ মিশন টু ফুলফিল।' সমন্বয়ের বাণী ভারতের চিরন্তনী জীবন-ধর্ম,—ভারত একান্তে কিছু গ্রহণ করেনি, আবার সর্বান্তে কিছু বর্জনও করেনি। অধ্যাত্মধর্মের গাঙ্গেয় ধারাকে অবিকৃত রেখে সমন্বয়ের পথে বার বার ভারতের জীবনধর্মে যুগানুসারী পরিবর্তন ঘটেছে। আজ বিশ্বের নানা প্রান্তে একান্তবাদী জীবন-দর্শন গড়ে উঠেছে। বিবেকানন্দ বলেছেন যে, কোন একান্তদৃষ্টি নয়,—বিভিন্ন মূল্যের যুগোপযোগী গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে সমন্বয়ী জীবন-দর্শন। বস্তুও

চাই, আত্মাকেও অস্বীকার করা চলবে না। বিজ্ঞানও চাই, ধর্মও চাই, আধুনিক পথে এগিয়ে যেতে হবে কিন্তু প্রাচীনের কল্যাণকর ঐতিহ্যকে উপেক্ষা না করে,—অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদ, প্রাচীনতা ও আধুনিকতা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনধর্ম, এমনি বিভিন্ন প্রমূল্যের সমন্বয়ে গড়ে তুলতে হবে নতুন ভারতের জীবনবাদ এবং এই জীবনবাদের আলোকবর্তিকা নিয়ে ভারত আধুনিক বিশ্বের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে রচনা করবে বিশ্বজনীনতার মিলন সঙ্গীত। এই বিবেকানন্দের সমন্বয়ের বাণী। নেতাজী হুবহু এই কথাই বলেছেন। তিনি কোন মতবাদকে শেষ কথা বলে গ্রহণ করেন নি,—সব মতবাদেই কিছু-না-কিছু সার বস্তু আছে। তাই দিয়ে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছেন সমন্বয়ী জীবন-বাদ। তিনি নিজেই বলেছেন:

"This synthesis is called by the writer Samyavad—an Indian word which means literally the Doctrine of Synthesis or Equality. It will be India's task to work out this synthesis".

সুভাষচন্দ্র 'জড় ও চৈতন্যের, দেহ ও আত্মার সুবর্ণ সেতু রচনার' আহ্বান জানিয়ে বলেছেন—"অতীতের কৃষ্টি ও সভ্যতার ভিত্তিতে আমাদের একটি আধুনিক জাতি গড়ে তুলতে হবে।" আরও তিনি বলেছেন "স্বাধীন ভারতের জীবনবাদ গড়ে উঠবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কল্যাণময় প্রমূল্যের পরিপূর্ণ সমন্বয়ে।" বিবেকানন্দ ধর্ম ও দার্শনিক মূল্যায়নে যে সমন্বয়বাদের কথা বলেছেন, নেতাজী তারই প্রয়োগ প্রয়াসী হয়েছেন আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক সমাজ-দর্শনে।

আরো এক দিকে নেতাজী স্বামীজীর অনুবর্তী। আধুনিক ভারতের পুনর্জাগরণের নীতি ও পদ্ধতির দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে বিবেকানন্দের অনুসারী সুভাষচন্দ্র। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অপপ্রয়োগে মধ্যযুগ ও তার পরবর্তীকালে ভারতে যে মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে তা শান্তি—

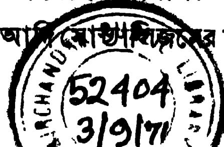
অহিংসার উচ্চ বুলির আড়ালে এক চরম কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিষ্ক্রিয়তাবাদ মাত্র,—এঁরা দু'জনেই ভারত ইতিহাসের পর্যালোচনায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। দু'জনেরই তাই মনে হয়েছে শান্তিবাদ ও অহিংসা-তত্ত্বকে আতিশয্যময় প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ নিষ্ক্রিয়তার অবসাদে ভারতকে পঙ্গু করে দেওয়া এবং উচ্চতত্ত্বের নামে ক্লৈব্যবৃত্তিকে ঢেকে রাখার সুযোগ দেওয়া। বিবেকানন্দ তাই অহিংসা বা শান্তিবাদের পরিবর্তে নতুন ভারতের জন-মানসে সৃষ্টি করিতে চেয়েছেন শক্তিবাদের অগ্নি-স্পন্দন। বলিষ্ঠ ওজস্বিতার তেজ-বৃত্তির আমন্ত্রণে তিনি এযুগের ভারতকে শুনাতে চেয়েছেন 'অভীমন্ত্র'। তাই তিনি বলেছেন: "অহিংসা ঠিক, নির্ব্যূঢ় সত্য কিন্তু তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা,—বীর্য প্রকাশ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাটা-লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক ভোগ পরকালেও তাই।" বিবেকানন্দ ওই ধর্ম ছাড়া আর যা কিছু বলেছেন তার সব কথার সারকথা—শক্তিবাদ, 'অভীধর্ম'। তিনি গোটা ভারতবর্ষকে এই অভীধর্মে দীক্ষিত করে জাতীয় জীবনে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন বীরত্ববাদের মানসিকতা।

নেতাজীর কর্মপদ্ধতি ও জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীতেও সেই শক্তিবাদের কথা। তেমনি ভারত ইতিহাস পর্যালোচনায় সুভাষচন্দ্র বলেছেন, "রাজনৈতিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে ভারতের পতন হলো কেন? ভাগ্য ও অলৌকিকতায় ঘোর বিশ্বাস এবং অহিংসাতত্ত্বে আতিশয্যের পথে যে শান্তিবাদী সন্তোষের মনোভাব সৃষ্টি হয়, তাই ভারতের পতনের কারণ।" আতিশয্যময় শান্তিবাদী অহিংসতত্ত্বের জন্যই সুভাষচন্দ্র গান্ধীবাদী ও গান্ধী নেতৃত্বকে অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। গান্ধীজীর সঙ্গে নেতাজীর যে ভাব-সংঘাত এবং তার ফলে যে কর্ম-দ্বন্দ্ব ঘটেছে তার মূলে রয়েছে শান্তিবাদ ও শক্তিবাদের

বৈপরীত্য। সুভাষচন্দ্র নীতি হিসেবে সত্যাগ্রহের পদ্ধতি গ্রহণ করেও বাংলা ও ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছেন এবং 'আজাদ হিন্দে'র অপূর্ব কীর্তি বিদ্রোহী নেতাজীর শক্তিবাদী দর্শনের জীবন্ত প্রতীক। এই শক্তিবাদের অনুসরণের প্রেরণায় সুভাষচন্দ্র প্রাথমিক জীবনে সবরমতী ও পণ্ডীচারী আশ্রমবাদের প্রতিবাদে বলেছিলেন, "এই নিষ্ক্রিয়তাবাদের আমি প্রতিবাদ করি। ...আজ ভারতের প্রয়োজন—একটি প্রবল কর্মবাদী দর্শন—এ ফিলসফি অব অ্যাক্টিভিজম।"

সুভাষচন্দ্র নিজের রাজনৈতিক মতবাদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—"আমি চাই ভারতে একটি সোস্যালিস্ট রিপাবলিক।" একবার নয়, শতবার নেতাজী সোস্যালিজমের কথা বলেছেন, কিন্তু এই সোস্যালিজমের মর্মার্থ কি? এই সোস্যালিজম কি মার্ক্সবাদী দর্শন অনুসারী কম্যুনিজমের নামান্তর মাত্র? না, সুভাষ অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন: "এই সোস্যালিজমের জন্ম ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতায়,—বিবেকানন্দের আহ্বানে।" তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন: "যারা রাশিয়ার কাছ থেকে প্রেরণা খুঁজে বেড়ায় তিনি তাদের দলে নন।" স্বামীজী-নেতাজীর এই যোগসূত্রটির প্রতি তাঁদের জীবনকারদের দৃষ্টি বিশেষ আকর্ষিত হয়নি। ভারতের উচ্চতম নেতাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম সোস্যালিজমের আদর্শের কথা উচ্চারণ করেছেন, পাশ্চাত্য জগতে অনেক সোস্যালিস্ট নেতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের কথাও বলেছেন। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট কণ্ঠে বলেছেন—আমি একজন সোস্যালিস্ট—'আই অ্যাম এ সোস্যালিস্ট'।

বৈদান্তিক বিবেকানন্দের এই সোস্যালিজমের মূল উৎস কোথায়? কম্যুনিস্টরা প্রাক্-মার্ক্স যে সোস্যালিজমকে 'ইয়োটোপিয়ান' বা কাল্পনিক বলে পরিহাস করেছেন স্বামীজী ও নেতাজীর সোস্যালিজমের প্রেরণার উৎস সেই আদি সোস্যালিজমের মানবতাবাদ।



বৈদান্তিক বিবেকানন্দ সর্ব মানুষের মধ্যে যে আত্মার একত্ব দর্শন করেছেন এবং তার ফলে তাঁর চৈতন্যে যে গভীর মানবতাবাদের আবেদন সৃষ্টি হয়েছে তারই ফলে মানুষে মানুষে দেখেছেন তিনি সমতা ও ঐক্য এবং তাই থেকেই তিনি ঘোষণা করেছেন সাম্যের নীতি। এই যে ঐক্য ও মানবতাধর্মী ভারতীয় সাম্যবাদী দর্শন, তাই বিবেকানন্দের সোস্যালিজমের মূল উৎস। মার্ক্স সাম্যের সূত্র সন্ধান করেছেন শ্রমজীবীদের উৎপাদনের অংকে। শ্রমজীবীরা সবাই উৎপাদন করে কিন্তু সবাই সমাংশে উৎপাদন করে না। সুতরাং যে বস্তুনৈতিক দর্শন থেকে সমতার মূল্যায়নের সৃষ্টি তার মধ্যে একটি বড় ফাঁক রয়ে গেছে,—সে ফাঁক উৎপাদনে বিভিন্ন ব্যক্তির যোগ্যতা বৈষম্যের ব্যবধান। তাই আজও কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে সমতার ভিত্তিতে সাম্যবাদ স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু আত্মার অভিন্নতায় বিশ্বাসী মানবতাবাদী সোস্যালিজমে বৈষম্যের অবকাশ নেই। এই মানবতাবাদের অবদানে কী গভীর মর্মবেদনায় স্বামীজী ভারতের জনগণের দুরবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছেন, ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বর্ণ-সংঘর্ষ বিশ্লেষণ করেছেন, বৈশ্যযুগের পরে বর্ণবিলুপ্তির অবসানে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ নিয়ে শূদ্র সমাজের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার বার্তা ঘোষণা করেছেন। বিভিন্ন কার্য বিভাগের প্রকৃতিভেদে যে তার মূল্যভেদ হয় না কী সুস্পষ্ট কণ্ঠে তিনি সে কথা ব্যক্ত করে জানিয়েছেন, "তুমি নয় বেদ পাঠ কর, আমি না হয় ছেঁড়া জুতা সেলাই করি, তাতে কি হল? আমি বেদপাঠে অপটু, তুমি জুতা সেলাইয়ে। এটা কার্য বিভাগ মাত্র।" কী বজ্রকণ্ঠে তিনি ভারতের উচ্চবর্ণদের 'চলমান শ্মশান' বলে তিরস্কার করে এবং উচ্চবর্ণদের বিলুপ্তির কথা ঘোষণা করে দীন-দরিদ্র পদদলিত কোটি কোটি চাষাভুষা, তাঁতি-জোলা, ভারতের নগণ্য মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার নতুন সমাজ সৃষ্টির আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "ভারতের উচ্চবর্ণেরা, তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক! বেরুক লাঙ্গল ধরে,

চাষার কুঠির ভেদ করে, জেলে, মালী, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য থেকে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুজাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত থেকে।” তারপরেই এদের ‘অটল জীবনীশক্তির’ কথা বলে বলেছেন, “এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে, আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরে না।” এরা যারা ‘সহস্র সহস্র বৎসর নীরবে অত্যাচার সয়েচে’ তাদের হয়ে এমন মানবতার বাণী, এমন সহমর্মিতার উদাত্ত কণ্ঠস্বর কোন সোস্যালিস্টের কণ্ঠেও কি এমনি করে শোনা গেছে ?

নেতাজীর সোস্যালিজমের প্রেরণাও স্বামীজীর এই ‘জীবশিববাদী’ মানবতাবাদ। জড়বাদী কম্যুনিজম নয়,—এই মানবতাবাদী সোস্যালিজমের কথা ও সমন্বয়বাদী সোস্যালিজমের ধ্বনি তুলে নেতাজীও বলেছেন, “আমার কোন সন্দেহ নেই যে ভারত ও বিশ্বের মুক্তি নির্ভর করছে সোস্যালিজমের উপরে। কিন্তু এই সোস্যালিজমের আদর্শ ও পদ্ধতি ভারতকেই গড়ে তুলতে হবে।” কম্যুনিজম সাম্যের নামে পার্টিবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে, স্বাধীনতা ও মানবতাবাদের আদর্শ রচনায় ব্যর্থ হয়েছে। তাই মানবসমাজকে কম্যুনিজমের পরের অধ্যায়ে নিয়ে যেতে হবে এবং সেই সমন্বয়ধর্মী মানবতাবাদী সোস্যালিজমের আহ্বান জানিয়ে এবং বিবেকানন্দের সাম্যবাদের স্বপ্নের বাণী শুনিয়ে নেতাজী বলেছেন, “ভারতকে বিশ্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের পরের অধ্যায়ে এগিয়ে যেতে হবে” এবং সেই নূতন জীবনদর্শনই হবে বিশ্বের কাছে এযুগের ভারত-বাণী।

বিবেকানন্দ বিপ্লবী, সমন্বয়বাদী,—আধুনিক বিজ্ঞান ধর্মের সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রমূল্যের সমন্বয় প্রয়াসী। নেতাজীও তাই,—বিপ্লববাদের পথে তিনি এমন একটি জীবন্ত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে

চেয়েছেন যার কাঠামো হবে বস্তুবাদ কিন্তু চিন্ময়ী সত্তা হবে চিরন্তনী আধ্যাত্মিক প্রমূল্য।

ভারত-পথিক নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "যে আদর্শের জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়েছিলাম তাই পেলাম বিবেকানন্দের বাণীতে,—যার জন্য আমার সমগ্র সত্তা উৎসর্গ করতে পারি। বয়স তখন সবে মাত্র পনের। আমার জীবনে এক প্রচণ্ড বিপ্লব ঘটে গেল। বিবেকানন্দ আমার জীবনে প্রবেশ করলেন।" ইংরেজীতে তিনি এই কথাটি লিখেছেন—'বিবেকানন্দ এনটার্ড মাই লাইফ'। বিবেকানন্দের আদর্শ গ্রহণ করে দীক্ষা নিলেন না সুভাষ, বিবেকানন্দ প্রবেশ করলেন সুভাষচন্দ্রের মধ্যে,—সুভাষের সর্বসত্তা বিবেকানন্দময় হয়ে গেল। নেতাজী স্বামীজীর শুধু মন্ত্রশিষ্য বা মানসপুত্র নন, তার চেয়েও অনেক বেশি। বিবেকানন্দ পুনর্মূর্ত হলেন সুভাষচন্দ্রের মধ্যে,—নেতাজী হলেন কালান্তরে বিবেকানন্দের উত্তর-সাধক। তাই আবার বলি, স্বামীজী ও নেতাজী একই ভাবপ্রবাহের দুইটি যুগধর্মী প্রচণ্ড তরঙ্গ এবং এমনি তরঙ্গ যাদের প্রত্যাঘাতে মানবসমাজে ইতিহাসের নতুন অধ্যায়, নতুন প্রমূল্য সৃষ্টি হয়।

নেতাজীর রাজনৈতিক সাধনা

রাজনীতি কি? জীবনে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জনে আর দশটা বৃত্তির মত রাজনীতিও যেন একটা পেশা মাত্র,—এ পেশায় আদর্শ ও অনুভূতির চেয়ে কূটনৈতিক পারদর্শিতাই বেশী প্রয়োজন,—সাধারণ জনতার কাছে রাজনীতি ক্রমশঃ এই তাৎপর্যই লাভ করতে সুরু করেছে। আজ তাই রাজনীতি বা রাজনৈতিকদের প্রতি জনসাধারণের তেমন শ্রদ্ধার ভাব নেই, যেমন ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে। পাশ্চাত্যের বুনিয়াদি দেশগুলিতে রাজনীতি সাধারণত পেশাদারী মূল্যেই পরিচিত। কিন্তু ভারতের মত অনুন্নত ও পশ্চাদ্-পদ দেশে রাজনীতি যদি আদর্শের আবেদন হারিয়ে পেশার গতানুগতিকতায় বিচ্যুত হয়ে যায় তা' হলে জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন প্রচেষ্টা বৈপ্লবিক রূপান্তরের আগ্রহ হারিয়ে অনিবার্যভাবেই সংস্কারের মন্থরতায় শিথিল হয়ে পড়বে। আজকের ভারতীয় রাজনীতিতে তারই লক্ষণ যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা অর্জনের আগে রাজনীতির প্রধান আবেদন ছিল আদর্শ, ত্যাগ ও সংগ্রামের, কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর যুগে রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই মূল্যমানের অভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রাজনীতি কোন পেশা নয়—স্বদেশ সেবার পরম আদর্শ—সেবাব্রতের এই অনুভূতিই নেতাজীকে দিয়েছিল রাজনৈতিক জীবন

বরণের মূল প্রেরণা। রাজনীতি সম্মান দেবে, সমাজে বিত্ত ও প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ করবে,—নেতাজীর মনে মুহূর্তের জন্যও এই পেশাদারী মোহ সৃষ্টি হয়নি। গান্ধীজী যেমন রাজনীতিকে বলেছেন 'ধর্ম', নেতাজীও তেমনি রাজনীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন 'সম্মিলিত সাধনা', তথা 'Collective Sadhana' নামে। ধর্ম বা সাধনার আবেদন পেশাদারীতে নয়,—আদর্শানুরাগের নিষ্ঠা ও হৃদয়ের অনুভূতিতে। কি দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি রাজনীতিকে গ্রহণ করেছেন নেতাজী নিজেই তার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, "রাজনীতি আমি সাময়িক বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিনি। নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকাশ করে ভারতমাতার পদাম্বুজে অঞ্জলিরূপে নিবেদন করবো,—এই আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম, এই আদর্শই আমার জীবনের জপ-তপ ও স্বধ্যায়।" রাজনীতি যখন এমনি আদর্শানুরাগের অনুভূতিতে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে তখন রাজনৈতিকের কর্ম ও মননায় আসে দুর্দম শক্তির প্রেরণা, শত পারদর্শিতা বা বিশেষজ্ঞ বুদ্ধি যে কাজ করতে পারে না, আদর্শানুরাগের হৃদয়াবেগ সে কাজকে সহজেই সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই দেখা যায় সংস্কারের পথে যে কাজ সম্পন্ন করতে লাগে এক শতাব্দী, বিপ্লবের পথে সেই কাজই সৃজনশীল হয়ে ওঠে মাত্র এক যুগের স্বল্পকালীন প্রচেষ্টায়। এরূপ সৃজনশীল অবদান তখনই সম্ভব হয় যখন রাজনীতি ত্যাগ ও সংগ্রামের স্বপ্নসৌরভে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং সত্যিকার রাজনৈতিক তথা স্বদেশ-সেবাব্রতীর মনে স্বদেশসেবার আকাঙ্ক্ষা আদর্শবাদের আবেগে উদ্বেলতার সঞ্চার করে। এমনি উদ্বেলতার অনুভব নেতাজীর সমস্ত কর্ম ও জীবনকে অনুরণিত করেছে বলেই তিনি বলতে পেরেছেন, "আমি স্বীকার করি আমি স্বপ্ন বিলাসী। স্বপ্নই আমি ভালবাসি। এই স্বপ্ন আমার কাছে জীবন্ত সত্য। এই স্বপ্ন থেকেই আমি উদ্দীপনা লাভ করি, প্রাণে আমার কাজ করবার প্রেরণা আসে, এই স্বপ্নের অভাবে আমাব বেঁচে থাকাই অসম্ভব হত।"

রাজনীতি পেশা নয়—আদর্শব্রত

নেতাজী রাজনীতিকে দেখেছেন পেশা বা বৃত্তিরূপে নয়—স্বদেশ তথা জনতার সেবাব্রতরূপে। এই দৃষ্টিভঙ্গীই নেতাজীকে সর্বত্যাগী আত্মভোলা বিপ্লবীর দুর্গম জীবনপথের অক্লান্ত পথিক হওয়ার প্রেরণা দিয়েছে। আদর্শের অনুভূতিতে রাজনীতিক যখন নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারে তখন তাঁর জীবন যে কি মহান্ কল্পনায় রূপান্তরিত হয়ে ওঠে নেতাজী নিজ জীবনের উপলব্ধি দিয়ে রাজনৈতিক কর্মীদের সেকথা অনুধাবন করার জন্য বলেছেন, "অবিরাম নিঃস্বার্থ কর্ম কর্মীর জীবনকে এক নূতন মানুষে রূপান্তরিত করে দেয়। যে সত্যিকার আদর্শবাদী তার লক্ষ্য হবে জীবনের রূপান্তর করা। এই রূপান্তর সাধন করতে হলে বাইরে থেকে চলবে না,—মানুষের জীবন নূতন আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে হবে। আদর্শের চরণে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে,—ঐ আদর্শের অনুসরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে হবে। আদর্শের চরণে আত্ম-বলিদান করতে পারলে মানুষের চিন্তা, কথা ও কাজ এক সুরে বাধা হয়ে যাবে, সমস্ত জীবন এক আদর্শসূত্রে গ্রথিত হয়ে যাবে। সে তখন খুঁজে পাবে নূতন রস, নূতন আনন্দ, জীবনের নূতন অর্থ,—তখন সমগ্র বিশ্ব জগৎ হয়ে উঠে নূতন আলোতে উদ্ভাসিত।"

রাজনীতির পুরস্কার

রাজনীতিকের মন যখন এমনি আদর্শানুরাগের অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে তখন মান-যশ-প্রতিষ্ঠার কোন আকাঙ্ক্ষা তাকে প্রলুব্ধ করতে পারে না, বরং শত দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনার পুরস্কারও তার জীবনে এনে দেয় তৃপ্তি ও আনন্দবোধের আস্বাদ। সে তখন নেতাজীর মত বলতে পারে "We must live from within—অন্তরের মধ্যে বাস করা এবং অন্তরেব বিকাশে জীবনতরী ভাসিয়ে দেওয়াতে পরম শান্তি রয়েছে।" নেতাজীর এই অনুভূতি হয়েছিল

বলেই নিঃস্বার্থ কর্ম-সাধনার আনন্দোৎসের সন্ধান দিয়ে তিনি বলেছেন, "আনন্দের উৎপত্তি আদর্শানুরাগে, যে ব্যক্তি মহান্ আদর্শকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসার দরুন দুঃখ যন্ত্রণা পায়, তার কাছে দুঃখ-ক্লেশ অর্থহীন নয়। দুঃখ তার কাছে রূপান্তরিত হয় আনন্দ বলে এবং সে আনন্দ অমৃতের মত তার শিরায় শিরায় শক্তি সঞ্চার করে দেয়। আদর্শের চরণে যে আত্মসমর্পণ করতে পারে সে-ই জীবনের অন্তর্হিত রসের সন্ধান পেতে পারে।" এই রসের সন্ধান লাভ করে আদর্শবাদী সুভাষচন্দ্র তাই উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত করেছেন, "আদর্শকে ষোল আনা পেতে হলে নিজেকে ষোল আনা দেওয়া চাই। ত্যাগ ও উপলব্ধি—renunciation and realisation—একই বস্তুর এ-পিঠ আর ও-পিঠ। এই ষোল আনা দেওয়া আর ষোল আনা পাওয়ার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।"

আদর্শ—মৃত্যুঞ্জয়ী

আদর্শানুরাগ জনসেবাব্রতীর জীবনকে যখন সুরভিত করে তোলে তার জীবন তখন দুর্জয় প্রচেষ্টার দুঃসাহসিক অভিযানে হয়ে ওঠে নিঃশঙ্ক ও নির্ভীক। আদর্শানুরাগীর এই নির্ভীকতাই নেতাজীকে অটল রেখেছিল ১৯২৮ সালের মান্দালয় জেলের অনশনের সঙ্কল্পে।

আদর্শের মৃত্যু নেই—আদর্শবাদীর জীবনাবসানও তাই নব-জীবনের রূপান্তর মাত্র—এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের শক্তিতেই নেতাজী ১৯৪০ সালের অনশনকালে বৃটিশ সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, "এই মরজগতে সব বিনষ্ট হয়ে যায় এবং যাবেও, কিন্তু মনীষা, আদর্শ ও স্বপ্নের—Ideas, Ideals and Dreams-এর বিনাশ নেই। আদর্শের সাধনা করতে যেয়ে ব্যক্তি লয় পেতে পারে কিন্তু ব্যক্তির অবলুপ্তির পরেও আদর্শ সহস্র আত্মায় পুনর্জন্ম লাভ করে। এমনি করেই বিবর্তনের চাকা এগিয়ে যায় এবং এ-যুগের স্বপ্ন ও আদর্শ পরের যুগে মূর্তিমন্ত হয়ে ওঠে।" নিজের আদর্শ ও সাধনা সম্বন্ধে সুগভীর উপলব্ধি ছিল বলেই কর্মজীবনের জয়পরাজয়কে

আনন্দোচ্ছ্বাস বা হতাশা-ব্যর্থতার মাপকাঠি দিয়ে বিচার না করে তিনি বলেছেন, "আমার সম্বন্ধে আমি বলতে পারি, আমি কাজ করে যাব, তারপর যাহা হয় হবে।"

নেতৃত্বের কল্পনা

রাজনীতিকে তিনি জনসেবাব্রতের সাধনারূপে গ্রহণ করেছিলেন বলেই নেতাজীর নেতৃত্বের কল্পনাও ছিল স্বতন্ত্র। নেতৃত্ব শুধু যোগ্যতা বা পারদর্শিতা নয়,—নেতাজীর কাছে তাত্ত্বিক জ্ঞান বা বিশেষজ্ঞতাও নেতৃত্বের প্রধান মাপকাঠি নয়। নেতাজী মনে করেন, যে-ব্যক্তির যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার সম্বল আছে সে-ব্যক্তি যদি নিজেকে নিঃস্বার্থ অনুভূতিতে নৈর্ব্যক্তিক করে তুলতে পারে এবং জনসেবাব্রতই যদি হয় তার জীবনের সাধনা তা' হলে সে-ব্যক্তি যথার্থভাবে জনতার অন্তরে প্রবেশ করে জনমনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সন্ধান লাভ করতে পারে এবং দিতে পারে জাতীয় জীবনের নির্ভুল পথনির্দেশ। নেতাজী তাই খাঁটি নেতৃত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "প্রথমত, নেতাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ হতে হবে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে স্বার্থচিন্তা যদি নিজের মনোভাবকে জড়িয়ে রাখে তা' হলে সেরূপ নেতা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বদলে দেশকে পেছিয়ে দেবে। স্বার্থচিন্তা নেতার অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত করলে চরম ব্যর্থতা অনিবার্য। যাঁরা জাতির ভাগ্য নিয়ে নাড়াচাড়া করেন তাঁদের পক্ষে তাই মানবিক স্তরে যতখানি সম্ভব নিঃস্বার্থ হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, নেতার ব্যক্তিগত অনুভূতিকে জনতার অনুভূতির মধ্যে ডুবিয়ে দিতে হবে যেন জনতার মন নেতার ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কিন্তু নেতার অনুভূতি যেন আবার রহস্যতার অন্ধগলিতে আটকা পড়ে না যায়,—তাই নেতৃত্বের তৃতীয় প্রয়োজন,—ইতিহাসের বিশ্লেষণ, সমালোচনা ও অনুধাবনের ভিত্তিতে যুক্তিশীল বিচার-ধারা।"

চাই দুর্দম কর্মবাদ,—সন্ন্যাসবাদ নয়

ত্যাগ, আদর্শ ও নিঃস্বার্থ সেবাব্রতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় নেতাজীর জীবন-সাধনাকে অনেকে সন্ন্যাসবাদের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। কিন্তু নেতাজীর সেবাব্রতের সাধনা সন্ন্যাস-বাদ নয়। নেতাজী মূলত অধ্যাত্মবাদী হয়েও সন্ন্যাসবাদকে সমর্থন করতে পারেননি। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, "একজন সন্ন্যাসী যে আদর্শকে গ্রহণ করে সমাজের সম্মিলিত জীবনে যদি সে-আদর্শ মূর্তিমন্ত না হয়ে ওঠে, তা' হলে সে-আদর্শের প্রতি কোন মূল্য আরোপ করা চলে না। শত শত মহাপুরুষ এদেশে আবির্ভূত হয়েছেন, অথচ তাঁদের আবির্ভাব সত্ত্বেও আজ দেশ কি শোচনীয় অবস্থায় পড়ে রয়েছে। জাতিকে বাঁচাতে হলে আজ সাধনার ধারা অন্যদিকে পরিচালিত করতে হবে। জাতিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিত্বের সার্থকতা নেই,—একথা আজ সকলকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। এজন্য আজ প্রয়োজন সম্মিলিত সাধনা—Collective Sadhana."

রাজনৈতিক সাধনা

নেতাজীর কাছে রাজনীতি যশ, মান, প্রতিষ্ঠা বা অর্থবৃত্তি লাভের পেশা নয়। তিনি রাজনীতিকে গ্রহণ করেছেন জনসেবাব্রতের সাধনারূপে। এই সাধনাকে তিনি সন্ন্যাসবাদের নেতিধর্মী-তাৎপর্যে পলাতক হতে দেননি। সমাজ-জীবনের সম্মিলিত রূপান্তর সাধন হলো নেতাজীর রাজনৈতিক সাধনার মর্মার্থ। রাজনীতিতে যেখানে সাধনার আমন্ত্রণ নেই সেখানে জাতীয় জীবনের আমূল রূপান্তর ঘটান বা নবজন্মের রচনা করা সম্ভব নয়। রাজনীতি ব্যাপক জন-সেবাব্রতের সাধনায় দীপ্তিমান্ হয়ে উঠলে তবেই সম্ভব হয় নয়া বিপ্লবের পূর্বাভাস রচনা। কিন্তু জাতির জীবনের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের আবেদন রাজনৈতিক পেশাদারীর মরু-বালিতে বিচ্যুত হয়ে ভারতের শতাব্দীর সাধনা আজ স্থবির হয়ে পড়ার উপক্রম

হয়েছে। গান্ধীজী রাজনীতিকে ধর্মের মূল্য দিয়েছেন, নেতাজী রাজনীতিকে নিয়েছেন জনসেবাব্রতের সাধনারূপে। ভারতের জনতা যদি গান্ধীজী ও নেতাজীর নব-ভারত রচনার স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে চায় তা' হলে রাজনীতিকে পেশাদারীর আবিলতা থেকে আদর্শ-সাধনার বেগবতী ধারায় নতুনভাবে জীবন্ত করে তুলতে হবে।

—যুগান্তর

নেতাজীর চোখে রাজনীতি

*রাজনীতি পেশা নয়—স্বদেশসেবার পরম আদর্শ। সেবাব্রতের এই মহান্ আদর্শই নেতাজীকে রাজনীতিতে টেনে এনেছিল। রাজনীতির মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের সার্থকতা। রাজনীতি যশ-মান দেবে, সমাজে দেবে প্রতিপত্তি, দেবে বিত্ত ও সমৃদ্ধির সন্ধান—একথা নেতাজীর মনে কোন মোহ সৃষ্টি করেনি। রাজনীতিতে কি পাওয়া যাবে, আর যাবে না—সে কথাও নেতাজীর মনকে দ্বন্দ্বময় করেনি। জনগণের সেবা করবার সুযোগ পেয়ে নিজের জীবন সুন্দর হয়ে ফুটে উঠবে—এই স্বপ্নই নেতাজীকে কুসুমিত জীবনের ভোগ-বিলাসের আহ্বান বিসর্জন দিয়ে বিপ্লবীর কাঁটা-ভরা পথের দুর্বার আকর্ষণে ডেকে এনেছিল। কেন রাজনীতি গ্রহণ করলেন নিজেই তার উত্তর দিয়ে নেতাজী বলেছেন, "রাজনীতি আমি সাময়িক বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিনি। নিজেব জীবন পূর্ণরূপে বিকাশ করে ভারতমাতার পদাম্বুজে অঞ্জলি নিবেদন করবো—এই আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। এই আদর্শই আমার জীবনের জপ-তপ ও স্বধ্যায়।

রাজনীতি কি পেশা?

রাজনীতি কি আর দশটা জীবিকা অর্জনের বৃত্তির মত একটি পেশা মাত্র? কি করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা যায়, কি করে ক্ষমতা

ও যশ মান লাভ করা যায়, কি করে রাজনীতির দাবা চালিয়ে—এমন কি, আর্থিক সুযোগ সমৃদ্ধিরও সন্ধান করা যায়—এজন্যই কি রাজনৈতিক জীবন গ্রহণ করা? আজ অনেকের মনেই এ প্রশ্ন জেগেছে,—রাজনীতি বুঝি আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আর্থিক সমৃদ্ধি লাভের একটি পেশা মাত্র। পরাধীন ভারতে জনগণের মনে এ প্রশ্ন জাগেনি, সেদিনের ত্যাগ ও লাঞ্ছনা বরণের ইতিহাস ভারতের রাজনৈতিক কর্মীদের ললাটে এঁকে দিয়েছিল জনগণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উষ্ণ লিপিকা। কিন্তু আজ? স্বাধীন ভারতের রাজনীতি যেন আজ জীবিকা অর্জনের একটা পেশা বা বৃত্তির সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাদের হাতে আজ রাজ্য কর্তৃত্বের বাগডোর, তাদের দিকে চেয়ে আজ অনেক কষ্টে মনে করতে হয় যে, রাজনীতির মূলোদ্দেশ্য—স্বদেশসেবা। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ও যশ, মানাকাঙ্ক্ষা—এমন কি আর্থিক সমৃদ্ধির লোভ—রাজনীতিবিদদের জীবনে আজ কুৎসিত কলঙ্কের ছায়াপাত করছে।

বামপন্থী মহলে আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব

যাঁরা রাষ্ট্র কর্তৃত্বের সঙ্গে জড়িত নন, যাঁরা নিজেদের সমাজ-বিপ্লবী বামপন্থী বলে পরিচয় দেন, তাঁদের জীবন-তথ্য রাজনৈতিক আচার-ব্যবহারও যেন জনগণের মনে এখন আর রেখাপাত করতে পারে না। তাঁদের জীবনেও যেন রাজনীতি আর্থিক বৃত্তি না হলেও ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠালাভের একটি উৎকট বৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে আদর্শ অনুরাগ মানুষকে আত্মত্যাগী করে জনগণের কল্যাণ কামনার প্রেরণায় ডুবিয়ে দেয়, যে আদর্শের অনুসরণে কর্মীর জীবন ও কর্মধারা তেজোদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে,—আজ তার খুব কম সন্ধানই পাওয়া যায় রাজনীতি ও রাজনৈতিক জীবন যাপনের পরিচয়ে। রাজনৈতিক জীবনে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যে দলাদলি, যে মতানৈক্য এবং পারস্পরিক সমালোচনা ও নিন্দাবাদ,—কি একটি দলের কর্মীদের মধ্যে, কি

আন্তর্দলীয় কর্মীবৃন্দের মধ্যে তার অনেকখানি কারণ রাজনৈতিক আদর্শের মূলগত প্রেরণার এই বিচ্যুতি। রাজনীতি এখন বহুলাংশে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা বা আকাঙ্ক্ষা অর্জনের একটি পেশা বা বৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতির এই দৃষ্টিভঙ্গী রাজনৈতিক জীবনকেও আজ ক্লেদাক্ত করে তুলেছে।

রাজনীতি বৃত্তি নয়,—সেবাব্রত

রাজনীতি বৃত্তি বা পেশা নয়,—রাজনীতি জনসেবার একটি মহান্ ব্রত। এই মূল কথাটির বিস্মৃতি ঘটলেই ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় রাজনীতি শুধু আবর্তময় হয়েই ওঠে না, একটি জাতির জীবনও অগ্রগতির স্বতঃস্ফূর্ত স্পৃহা ও কর্মবেগ হারিয়ে ফেলে। জাতির জীবনে বৈপ্লবিক রূপান্তর আনার স্বপ্ন একমাত্র সর্বত্যাগী ও আত্মভোলা আদর্শানুরাগী কর্মীরাই সম্ভব করে তুলতে পারে। যে কর্মীর নিজস্ব বলে কিছু থাকবে না, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কল্যাণ কামনায় তার সর্বানুভূতি ডুবিয়ে দেবে,—এমনি একটি আদর্শবাদীর কল্পনা প্রবুদ্ধ করেছিল যুবক সুভাষকে রাজনৈতিক জীবন গ্রহণে। সুভাষচন্দ্র তাই বলেছেন ঃ

কর্মীর আনন্দ কোথায় ?

"অবিরাম নিঃস্বার্থ কর্ম কর্মীর জীবনকে এক নূতন মানুষে রূপান্তরিত করে দেয়। যে সত্যকার আদর্শবাদী তার লক্ষ্য হবে জীবনের রূপান্তর করা। এই রূপান্তর সাধন করতে হ'লে বাইরে থেকে চেষ্টা করলে চলবে না,—মানুষের জীবন নূতন আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে হবে। আদর্শের চরণে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে,—ঐ আদর্শের অনুসরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে হবে। আদর্শের চরণে আত্মবলিদান করতে পারলে মানুষের চিন্তা, কথা ও কাজ এক সুরে বাঁধা হয়ে যাবে, তার ভিতর বাহির এক হয়ে যাবে, সমস্ত জীবন তার এক আদর্শসূত্রে

গ্রথিত হয়ে যাবে। সে তখন খুঁজে পাবে নূতন রস, নূতন আনন্দ, নূতন অর্থ,—তার কাছে সমগ্র বিশ্বজগৎ হয়ে যাবে নূতন আলোকে উদ্‌ভাসিত।" স্বদেশ সেবক কর্মীর মন যখন এমনি আদর্শ অনুরাগে পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন শত দুঃখ, কষ্ট ও লাঞ্ছনাবরণেও সে সন্ধান পায় নূতন তৃপ্তি ও আনন্দবোধের। আদর্শ অনুসরণের এই সন্তোষ ও মর্যাদাবোধই কর্মী জীবনের পরম প্রাপ্তি। নেতাজী তাই বলেছেন, "We must live from within—অন্তরের মধ্যে বাস করা এবং অন্তরের বিকাশে জীবন-তরী ভাসিয়ে দেওয়াতে পরম শান্তি রয়েছে"। যে এই তৃপ্তি ও শান্তির সন্ধান পায়, সে সুভাষচন্দ্রের ভাষায় বলতে পারে, "আনন্দের উৎপত্তি আদর্শানুরাগে। যে ব্যক্তি মহান্ আদর্শকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসার দরুন দুঃখ-যন্ত্রণা পায়, তার কাছে দুঃখ-ক্লেশ অর্থহীন নয়। দুঃখ তার কাছে রূপান্তরিত হয় আনন্দ বলে এবং সে আনন্দ অমৃতের মত তার শিরায় শিরায় শক্তি সঞ্চার করে দেয়। আদর্শের চরণে যে আত্মসমর্পণ করতে পারে সেই জীবনের অন্তর্নিহিত রসের সন্ধান পেতে পারে।" আদর্শবাদী যুব-নেতা সুভাষের কণ্ঠে তাই সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল: "আদর্শকে ষোল আনা পেতে হলে নিজেকে ষোল আনা দেওয়া চাই। ত্যাগ ও উপলব্ধি—renunciation and realisation—একই বস্তুর এ-পিঠ আর ও-পিঠ। এই ষোল আনা পাওয়া আর ষোল আনা দেওয়ার জন্য আমার মন-প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে।" তিনি রাজনৈতিক কর্মীর জীবনাদর্শের নির্দেশ দিয়ে আরো বলেছেন, "নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে যে জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে চায় অন্তরের আত্মবিশ্বাস, আদর্শানুরাগ ও আনন্দবোধই তার জীবনের সম্বল।"

আদর্শের মৃত্যু নেই

আদর্শানুরাগ নেতাজীকে দুর্ধর্ষ ও দুর্জয় জীবন যাপনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। মৃত্যু বা ভয় তাঁর মনকে দোলা দিতে পারেনি, বা

জয়-পরাজয়ের চিন্তা তাঁর মনকে দ্বিধাসঙ্কুল করতে পারে নি। ১৯৪০ সালে আমরণ অনশনের সংকল্প করে নেতাজী সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে আদর্শবাদীর কাছে মৃত্যুভয় এক অতি তুচ্ছ কল্পনা, কারণ আদর্শবাদীর মৃত্যু নবজীবনের রূপান্তর মাত্র। তিনি লিখেছিলেন, "এই মরজগতে সব বিনষ্ট হয়ে যায় এবং বিনষ্ট হয়ে যাবেও কিন্তু মনীষা, আদর্শ ও স্বপ্নের—Ideas, Ideals and Dreams-এর বিনাশ নেই। আদর্শের সাধনা করতে যেয়ে ব্যক্তি লয় পেতে পারে কিন্তু ব্যক্তির অবলুপ্তির পরও আদর্শ সহস্র আত্মায় পুনর্জন্ম লাভ করে। এমনি করেই বিবর্তনের চাকা এগিয়ে যায় এবং এ যুগের স্বপ্ন ও আদর্শ পরের যুগে মূর্তিমন্ত হয়ে ওঠে।"

আদর্শ জীবন অপরাজেয়

যে আদর্শবাদী তার জীবন তথাকথিত পরাজয়ে ব্যর্থ হয় না, জয়ের পরেও আনন্দ-উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হয় না। সে নেতাজীর মত জানে, "আমার সম্বন্ধে আমি বলতে পারি, আমি কাজ করে যাব তারপর যাহা হয় হবে।" সে পাওয়ার জন্য কাঙ্গাল হয় না, দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে এবং নেতাজীর মতই বলতে পারে, "সারা জীবন কেবল দিয়ে যেতে হবে,—নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কাঙ্গাল হয়ে যেতে হবে,—প্রতিদানে কিছুই না চেয়ে"। যদি সে কিছু না পায়, কি আসে যায় তার! আদর্শবাদ ও আদর্শবাদীর জীবন কখনো ব্যর্থ হয় না। সে নেতাজীর মতই বলতে পারে, "আদর্শকে যদি বাস্তবের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলবার সুযোগ না পাই, তা হলেও আমার জীবন ব্যর্থ হবে না, মহান্ আদর্শ যদি প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করে থাকি, কায়মনকে যদি সে মহান্ আদর্শের সুরে বেঁধে থাকি, আদর্শের মধ্যে যদি নিজের অস্তিত্ব মিশে থাকে,—তা' হলেই আমি সন্তুষ্ট। আমার জীবন জগতের কাছে ব্যর্থ হলেও আমার কাছে ব্যর্থ নয়।" আদর্শবাদের একান্ত অনুসরণ কর্মীকে দৃঢ়নিশ্চয় ও

আশাবাদী করে তোলে। সে পরাজয়ের ঘনান্ধকারেও ভবিষ্যতের জ্বলন্ত বিশ্বাসে বলতে পারে, যেমন করে নেতাজী আজাদ হিন্দের শেষ পর্বে রণক্ষেত্র থেকে পশ্চাদ্‌গামী ব্যর্থ মনোরথ সহকর্মীদের ডেকে বলতে পেরেছেন,—"বিপ্লবী সেই আদর্শের ন্যায়পরায়ণতায় যে আস্থাবান্ এবং অকপটে যে বিশ্বাস করে আদর্শের জয় অনিবার্য। পরাজয় বা ব্যর্থতায় যে নিরাশ হয়ে পড়ে সে বিপ্লবী নয়। বিপ্লবীর ধর্ম হলো,—শ্রেয়স্করের জন্য আশা রাখো! কিন্তু চরম আঘাতের জন্য তৈরী থাকো।"

সন্ন্যাস নয়, দুর্দম কর্মবাদ চাই

নেতাজীর আদর্শ জীবনের কল্পনা সন্ন্যাসবাদ নয়। সন্ন্যাসবাদের পলাতক মনোবৃত্তিকে তিনি সমর্থন করেননি। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন,—"একজন সন্ন্যাসী যে আদর্শকে গ্রহণ করে সমাজের সম্মিলিত জীবনে যদি সে আদর্শ মূর্তিমন্ত না হয়ে ওঠে, তাহলে সে আদর্শের প্রতি কোন মূল্য আরোপ করা চলে না।...শত শত মহাপুরুষ এদেশে আবিভূ ত হয়েছেন, অথচ তাঁদের আবির্ভাব সত্ত্বেও আজ দেশ কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় পড়ে রয়েছে। জাতিকে বাঁচাতে হ'লে আজ সাধনার ধারা অন্য দিকে পরিচালিত করতে হবে। জাতিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিত্বের সার্থকতা নেই,—এ কথা আজ সকলকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। এজন্যে আজ প্রয়োজন সম্মিলিত সাধনা,—"Collective Sadhana."

নেতাজী তাই আশ্রম-জীবনকে সমর্থন করতে পারেননি, তিনি চেয়েছেন এক দুর্দম কর্মজীবন। আশ্রমবাদের সমালোচনা করে নেতাজী বলেছেন, "আশ্রমবাদের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক মূল্য যাই হোক না কেন, এই মতবাদ যুগধর্মসাপেক্ষ নয়। আধুনিকতা মাত্রেই মন্দ এবং আত্মাই একমাত্র স্বীকার্য এবং যোগধ্যান অর্থাৎ প্রাণায়াম ও ধ্যান ধারণার চেয়ে মহান্ ও উচ্চতর বৃত্তি মানুষের পক্ষে আর

কিছুই নাই,—এই নিষ্কাম আদর্শ অগ্রহণীয়। It is this passivism, not philosophic but actual, inculcated by this school of thought, against which I protest. We have to live in the present and adapt ourselves to modern conditions. ভারতকে কল্যাণে মুক্তিতে মহিমায় গরীয়সী করে তুলতে হলে এ যুগের প্রয়োজন একটি কর্মবাদী দর্শন —A Philosophy of Activism". তিনি দেহ ও আত্মার দাবীর সমন্বয়-সাধন করে এক সুন্দর ও সুসমঞ্জস জীবনের কল্পনায় বলেছেন, "দেহের সাথে আত্মার গভীর সংযোগ রয়েছে। দেহকে অস্বীকার করলে শুধু দেহই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, আত্মাও ক্ষুণ্ণ হয়। দেহ ও আত্মা,—এই দুইয়ের সমন্বয়-সাধনেই সত্যিকার জাতীয় কল্যাণ। ভারতবর্ষ আজ এই কল্যাণ কামনা করে।"

আদর্শের স্বপ্নে বিভোর হও !

রাজনীতি ও রাজনৈতিক কর্মীর জীবনাদর্শে আজ চরম বিভ্রান্তি এসেছে। রাজনীতি পেশা নয়,—জনসেবার আদর্শ। আদর্শ শুধু বুলি নয়, শুধু সমাজ-জীবনের জন্য নয়,—ব্যক্তি-জীবনের জন্যও। কর্মীর জীবন আদর্শবাদে রূপান্তরিত না হলে আদর্শবাদ প্রচার অর্থহীন। নিজের জীবন ও কর্ম, আদর্শবাদ এবং ব্যক্তিগত জীবনের আচার-ব্যবহারের মধ্যে সঙ্গতিবিধান সম্ভব হলেই সত্যিকার রাজনৈতিক কর্মী হওয়া সম্ভব। আদর্শ অনুরাগ কর্মীর সমস্ত দেহ-মনকে নূতন প্রেরণায় রূপান্তরিত করবে। তার জীবনে ও কর্মে দেবে নূতন আনন্দবোধের সন্ধান। তবেই এইরূপ কর্মীর সমাবেশে দেশের রাজনীতি জনগণের সত্যিকার কল্যাণ ও জাতীয় জীবনের রূপান্তর সাধনে সম্ভব হবে। যে আদর্শ প্রচার করে সর্বপ্রথম তার জীবন, তার মাননা ও আচার-ব্যবহার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত না হলে কোন আদর্শবাদেরই সার্থক রূপায়ণ হয় না। যে আদর্শবাদী

সমস্ত জীবন তার আদর্শের স্বপ্ন-সৌরভে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। তবেই সে নেতাজীর মত বলতে পারবে, "আমি স্বীকার করি আমি স্বপ্নবিলাসী। স্বপ্নই আমি ভালবাসি। এই স্বপ্ন আমার কাছে জীবন্ত সত্য। এই স্বপ্ন থেকেই আমি উদ্দীপনা লাভ করি, প্রাণে আমার কাজ করবার প্রেরণা আসে। এই স্বপ্নের অভাবে আমার বেঁচে থাকাই অসম্ভব হতো।"

—যুগান্তর

নেতাজীর নেতৃত্ব

মানব ইতিহাসে যাঁরা দেশ ও কালোত্তীর্ণ নেতারূপে যুগে যুগে মানুষের মনে পরম বিস্ময় ও শ্রদ্ধার তরঙ্গ সঞ্চার করবেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। তবু অন্যতম বললেই নায়কতার ইতিহাসে নেতাজীর স্থান যথার্থভাবে নির্ণয় করা হয় না। মহাকাব্যের রচয়িতারা তাঁদের রচনায় নায়কের যে কল্পনা করেছেন নেতাজীর নেতৃত্ব অনেক দিক দিয়ে সেই কল্পনার সীমাও অতিক্রম করে একটি মহিমান্বিত বীর-চরিত্রের ঐতিহ্য রচনা করেছে যাকে অপূর্বতার গৌরবদান করে নিঃসন্দেহে কল্পনাতীত বলে আখ্যা দেওয়া যায়। এ যুগের ভারত-ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র শুধু তাই দেশগৌরব নন, শুধু নেতাও নন,—তিনি নেতাজী। গান্ধীজীর পরে নেতৃত্বের এমন সর্বজনীন ও মহদ্বিত ঐতিহাসিক আসন একমাত্র সুভাষচন্দ্রই লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।

সুভাষ-নেতৃত্বের উৎস

নেতাজীর নেতৃত্বের মূল উৎস তিনটি। জীবনের প্রারম্ভ থেকে তিনি অনুভব করেছেন,—'আমার জীবনে একটি উদ্দেশ্য আছে সে জন্য আমার বেঁচে থাকা।' জীবন-স্বপ্নের এই কল্পনা নেতাজীর সমগ্র জীবনধারায় প্রবাহিত হয়েছে প্রাণোদ্দীপ্তা অন্তঃসলিলার

মত। সুভাষ-নেতৃত্বের দ্বিতীয় উৎস তাঁর গভীর ভারত-প্রীতি। ভারত ইতিহাসের পেছনে রয়েছে একটি চিরন্তনী সৃজন-মানস,—যার অবদানে ভারত যুগ থেকে যুগান্তরের পথে নব নব সার্থকতার আমন্ত্রণে মানবসমাজের সামনে তুলে ধরেছে উজ্জ্বলতম আদর্শের এক মৃত্যুহীন আলোকবর্তিকা। ভারত ইতিহাসের এই অভিযাত্রায় এযুগের আলোকবর্তিকার বাহকরূপে নেতাজীরও একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে,—এই বিশ্বাস নেতাজীকে কর্মের প্রেরণা সঞ্চার করেছে। সুভাষ-নেতৃত্বের তৃতীয় উৎস তাঁর গভীর অধ্যাত্ম-বোধ। বস্তুত, অধ্যাত্মবোধকে সুভাষ-জীবনের ঐকান্তিক মূল উৎসও বলা যায়। বিবেকানন্দের 'দরিদ্র নারায়ণের সেবায়' সুভাষ যদি অধ্যাত্মবোধ উৎসারণের উপায় খুঁজে না পেতেন তা'হলে সমাজ ও সংসার হয়তো কর্মের বন্ধনে সুভাষচন্দ্রকে আবদ্ধ রাখতে পারতো না। গান্ধীজীর ন্যায় নেতাজীও ভারতের জনচিত্তকে জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন এজন্যে যে তাঁর অন্তরে জনসাধারণের জন্য ছিল গভীর দরদ ও মমত্ববোধ। বুদ্ধির অনুশীলনদ্বারা এই মমত্ববোধ সুভাষ-চিত্তে সঞ্চারিত হয়নি, আধ্যাত্মিক একাত্মবোধে বিবেকানন্দ ও গান্ধীজীর মত নেতাজীও ভারতবাসীকে পরমাত্মীয়তার আমন্ত্রণে আপন করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। জনচিত্তকে আপন করে নেওয়ার উপরে নির্ভর করে মহতি নেতৃত্বের সার্থকতা এবং এজন্যেই গান্ধীজী ও নেতাজীর পরিচয় ভারতের অপ্রতিম জননেতা রূপে।

সুভাষ-নেতৃত্বের দার্শনিক ভিত্তি

নেতাজীর নেতৃত্বকে অনেকে বীর্যবত্তা, বৈপ্লবিক দুঃসাহস ও সংগ্রামী বামপন্থার দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু একটি মৌলিক জীবন-দর্শনের প্রেরণা ব্যতীত কোন নেতৃত্বই মৃত্যুঞ্জয়ী বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে না। নেতাজীর জীবন-মানসের বিকাশ হয়েছে দু'টি জীবন-দর্শনের সংঘাতে,—একদিকে ভারতীয়

গান্ধীবাদের অহিংসাব্রতের ঐকান্তিক আমন্ত্রণ, অন্যদিকে পাশ্চাত্য মার্কসীয় দর্শনের বস্তুতান্ত্রিক বিশ্লেষণ। নেতাজীর কাছে দু'টি মতবাদই আতিশয্যপূর্ণ মনে হয়েছে। মানবসমাজের চিরন্তনী বিবর্তন ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে সত্য ও বাস্তব মূল্যবোধের আপেক্ষিক রূপায়ণের প্রকৃতি নেতাজীকে কোন মতবাদ সম্বন্ধে একান্তব্রতী করে তুলতে পারেনি। একদিকে বিবর্তনবাদ ও অন্যদিকে আপেক্ষিকতা-বাদ নেতাজীকে ইতিহাস ও জীবন-মূল্য বিচারে বহুবাদী করে তুলেছে। এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাসের গতি বিশ্লেষণ সুভাষ-মানসে দর্শনের যে পরশপাথরের স্পর্শ দিয়েছে তার পরিচয় সমন্বয়বাদে। কোন দর্শনকে একান্তভাবে গ্রহণ না করে জীবন ও সমাজের বিভিন্ন মূল্যের সমন্বয়-সাধনের পথে যুগে যুগে যুগোপযোগী সমাজ-দর্শন রচনা করে জনতার সামনে জীবন-যাত্রার পথ-সন্ধান দেওয়াই জননেতাদের দায়িত্ব। নেতাজী একথা বিশ্বাস করেছেন এবং নিজের দার্শনিক ও সামাজিক মতবাদকে এমনি সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গীতে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

সুভাষ-নেতৃত্বের স্বকীয় বিকাশ

সুভাষ-নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে গান্ধী-নেতৃত্বের বিপুল প্রভাবকে অতিক্রম করে। ভারতের জাতীয় জীবনে গান্ধী-নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আগে স্বদেশী আন্দোলনে বহু প্রথিতযশা নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটেছিল কিন্তু সেই নেতৃত্বের যাঁরা গান্ধীপন্থীর অনুসারী হতে পারেনি তাঁরা পরবর্তী কালে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছেন। গান্ধীযুগে গান্ধীজী ব্যতীত আর যে সকল নেতার অভ্যুদয় ঘটেছে এবং গান্ধীজীর তিরোধানের পরে ভারতের জনজীবনে জাতীয় নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করেছেন তাঁদের প্রতিটি নেতৃত্বের বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন সম্ভব হয়েছে গান্ধী-নেতৃত্বের প্রতিফলনে। একমাত্র সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে স্বকীয় প্রতিভা এবং স্বাধীন কর্মধারার অবদানে। সুভাষের

নেতৃত্বশক্তির উৎস যে কত মৌলিক ও প্রাণবান, গান্ধী-নেতৃত্বকে বহু ক্ষেত্রে অস্বীকার করে তিনি সে কথা প্রমাণ করেছেন। বস্তুত, গান্ধী-নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ না করেও একমাত্র সুভাষচন্দ্রই ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। গান্ধী-নেতৃত্ব ক্রমে ক্রমে নূতন কর্মপন্থা ও সংগ্রামী ধারায় অগ্রসর হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে গান্ধী-নেতৃত্বের সমালোচনা, বিরোধিতা এবং সময় সময় বিদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ করায় ভারতের জাতীয় আন্দোলন এবং গান্ধী-নেতৃত্বকে অগ্রবর্তী ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে যে বহুলাংশে সাহায্য করেছে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের দক্ষিণ ও বামপন্থী সংঘাতের ইতিহাসের যথার্থ অনুধাবন সেকথাকে অস্বীকার করতে পারবে না। গভীর আত্ম-বিশ্বাস, স্বাধীনচিন্তা এবং জীবন-দর্শনের অবিকম্প প্রেরণার বলেই সুভাষচন্দ্র বামপন্থী নেতৃত্বের প্রতিভূরূপে গান্ধী-নেতৃত্বের অবিসংবাদী প্রভাবের যুগে নিজের নেতৃত্বকে জাতীয় ভূমিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সংগ্রাম, সংগঠন ও সমাজদর্শন

সংগ্রামই সুভাষ-নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য এবং আপসহীন বামপন্থীর ঐতিহ্য ও আজাদ হিন্দের দুর্ধর্ষ অভিযান তার নিদর্শন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব-মূল্য তাঁর একমাত্র সংগ্রামী ভূমিকাতেই সীমাবদ্ধ, —অনেকে এরূপ মন্তব্য করে থাকেন। সংগ্রামী ভূমিকা সুভাষ-নেতৃত্বের একটি বিশিষ্ট দিক কিন্তু রাজনৈতিক সমাজ-দর্শন ও সংগঠন প্রতিভাও নেতাজীর নেতৃত্ব-পরিচয়ে কম মূল্যবান নয়। ভারতে সমাজবাদী আদর্শ প্রচারে নেতাজী অন্যতম অগ্রদূত। কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মপন্থার সঙ্গে নেতাজীই কিষাণ-মজদুর-ছাত্র সংগঠনের উদ্দেশ্যে সমাজবাদী কর্মসূচী জাতীয় আন্দোলনের সামনে সর্বপ্রথম উত্থাপন করেন এবং স্বাধীন ভারতকে 'সোস্যালিস্ট রিপাব্লিক'-রূপে

গঠন করার কথা ঘোষণা করেন। সেযুগে কম্যুনিস্ট মতবাদ ছাড়া সমাজবাদের অন্য ব্যাখ্যা করা এক তুরূহ কাজ ছিল, কিন্তু বামপন্থী নেতা হয়েও একমাত্র নেতাজীই মার্কস্‌বাদের অন্ধ অনুসরণ-মুক্ত সমাজবাদী আদর্শ,—যে আদর্শের বনিয়াদ গড়ে তোলা হবে সমন্বয়ী জীবন-দর্শনের অবদানে এবং ভারতের ইতিহাস ও পরিবেশের প্রয়োজনে, নব্যতম মূল্যমান ও সাংগঠনিক পরিকল্পনায় যার নব রূপায়ণ হবে এক ঐতিহাসিক কর্তব্য,—একমাত্র নেতাজীই সেকথা বহু বিরূপ সমালোচনা অগ্রাহ্য করেও ভারতের জাতীয় মানসের সামনে এক সুস্পষ্ট বিশ্বাসে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

ভারত সমাজবাদী যুগে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে এবং সমাজবাদকে সৃজনশীল উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা জাতীয় জীবনে গড়ে তুলবার বলিষ্ঠ প্রয়াস সৃষ্টি হয়েছে। সমাজবাদের এরূপ সৃজনশীল গঠনমূলক রূপায়ণে নেতাজীর অগ্রণী ভূমিকা অনস্বীকার্য। সংগ্রামী ঐতিহ্য ও আদর্শবাদী স্বকীয়তা ছাড়াও সংগঠন প্রতিভাও সুভাষ-নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। স্বাধীন ভারত গড়ে তুলবার সুযোগ নেতাজীর হয়নি। তিনি সংগ্রামী দল গঠনে তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের উদ্বোধন করে এবং নিজস্ব শাসন, নিয়ন্ত্রণ, অর্থ, পরিকল্পনা ও সংগঠনের মাধ্যমে আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের সঙ্গে আজাদ হিন্দ্‌ সরকার গঠন করে নেতাজী গঠনমূলক প্রতিভার যে অক্ষয়কীর্তি রচনা করেছেন তাতে একথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে শুধু সংগ্রাম নয়, সংগঠন প্রতিভায়ও, সুভাষ-নেতৃত্ব তার অবিস্মরণীয় ঐতিহ্য রচনা করতে সক্ষম হয়েছে স্বাধীন ভারতের প্রতিচ্ছবি রূপে।

নেতৃত্বের কষ্টিপাথর

যে নেতৃত্ব ইতিহাসের বুকে অবিস্মরণীয় চিহ্ন রেখে যায় সে নেতৃত্ব শুধু আত্মপ্রচেষ্টার দ্বারা গড়ে ওঠে না। নেতাজী এমনি

যুগোত্তীর্ণ নেতৃত্বের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, "নেতৃত্ব একটি জন্মগত শক্তি। অপর সকল প্রতিভার মত রাজনৈতিক প্রতিভাতে একটি সহজাত বোধশক্তি গোড়া থেকেই একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এই জন্মগত প্রতিভাকেও শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা উজ্জ্বল করে তুলতে হয় এবং তার জন্য চাই নিরন্তর অনুশীলন।" নেতাজীর মতে মহান্ নেতৃত্বের জন্য চারিটি গুণের একান্ত প্রয়োজন: "প্রথমত, নেতাকে সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হতে হবে। সজ্ঞানেই হোক আর অজ্ঞানেই হোক, কোনরূপ স্বার্থচিন্তা-যুক্ত হলে নেতাকে পথের পরিবর্তে বিপথে পরিচালিত করবে; দ্বিতীয়ত, নেতার ব্যক্তি-চেতনা গণচিত্তের বিরাট সংবেদনের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে এবং তা' হলেই জনমনের গতি ও প্রকৃতি ঠিকমত অনুধাবন করা সম্ভব হবে, কিন্তু যুক্তিধর্মী মনের দ্বারা সর্বদা জাগ্রত না রাখলে নেতাকে মিস্টিসিজ্‌ম গ্রাস করে ফেলতে পারে; তৃতীয়ত, নেতার কর্তব্য হবে যুক্তি-বিচার ও বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে বিশেষভাবে ইতিহাস পাঠকরা,—নেতার অন্তর্দৃষ্টি বা ইণ্টুইশন মিস্টিসিজ্‌মের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হলে যেন যুক্তিধর্মী জ্ঞান তাকে উদ্ধার করতে পারে; চতুর্থত, নেতাকে আন্তর্জাতীয় ঘটনাবলী উত্তমরূপে বুঝতে হবে। "মন যখন এমনি নিঃস্বার্থবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে শুদ্ধ স্বচ্ছ ও সংযত হয় তখনই জনসাধারণের মনের কথা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা নেতা বুঝতে সক্ষম হন। এই অন্তর্দৃষ্টির নির্দেশকে নির্ভুলভাবে অনুধাবনের জন্য নেতার পক্ষে যুক্তিধর্মী এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় তথ্যাবলী সম্বন্ধে সুপরিজ্ঞাত থাকা প্রয়োজন।" নেতাজীর মতে এই সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী হলেই সত্যিকার জননেতা হওয়া সম্ভব।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা

সুযোগ্য ও ঐতিহাসিক নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। এই চতুর্বর্গীয় গুণাবলী দ্বারা নেতাজী

তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বারবার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আই. সি. এস. পদ বর্জন, মান্দালয় জেলে অনশনব্রত অবলম্বন, আঠাশ সালে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন, ত্রিশ সালে মনুমেণ্টের তলায় পুলিশ বেষ্টনী অগ্রাহ্য করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ত্রিপুরীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগ ও ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন, হলোয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের আন্দোলন, কারাগারে আমরণ অনশন, ভারত ত্যাগ, ইয়োরোপ থেকে সাবমেরিনে এশিয়া আগমন, আজাদ হিন্দ্ গঠন এবং আবার রহস্য-ময় অজানা পথে অন্তর্ধান,—এরূপ প্রতিটি ঘটনায় সঙ্কল্প ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে ক্ষমতা নেতাজী দেখিয়েছেন,—নেতৃত্বের মূল্য বিচারে বিশ্বের বৈপ্লবিক ইতিহাসে তা' সমগ্র মানবসমাজের এক অমূল্য নিদর্শন হয়ে থাকবে।

বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতা

নেতাজী বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার যে ঐতিহ্য রচনা করেছেন তার তুলনা নেই। তাঁর স্বার্থশূন্য গণদরদী মনে অধ্যাত্মবোধের ফল্গুধারা চির প্রবাহিত ছিল বলেই জীবন-মৃত্যুকে অনায়াসে অগ্রাহ্য করে তিনি মান্দালয় ও প্রেসিডেন্সী জেলে আমরণ অনশন করে বৃটিশ সরকারের লৌহ-চিত্তকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর এই সময়কার পত্রাবলী কালজয়ী নেতৃত্বের সাধনা ও সংকল্পের এক অপূর্ব স্মারণিক। নেতাজী এপ্রিল মাসে পুলিশ বেষ্টনী অগ্রাহ্য করে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বীরত্বের যে ইতিহাস রচনা করেন, ভারত থেকে পলায়ন, সাবমেরিণ যোগে শত্রু পরিবেষ্টিত অকূল সমুদ্র পার হয়ে সিঙ্গাপুরে আগমন এবং আজাদ হিন্দের দুঃসাহসিকতা ও বীর্যবত্তার কাহিনী,—সেই ইতিহাসকে আরও এক অপূর্ব বিভায় তাঁর বীরজীবনের জ্যোতির্মণ্ডলকে যেভাবে দীপ্তিময় করে তুলেছে ভারত ও বিশ্বের ইতিহাসে সেকথা মহৎ ব্রতের আদর্শ-সাধনায় দেশ ও

দেশান্তরের দুর্ধর্ষ অভিসারীদের, চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে। নেতাজী বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার যে অপূর্ব ঐতিহ্য রচনা করেছেন তার মূলে রয়েছে তাঁর নিঃস্বার্থবৃত্তি ও গভীর অধ্যাত্মবোধ। এই দ্বয়ী বৃত্তির প্রসাদ না পেলে মৃত্যুর বুকে দাঁড়িয়ে জীবন নিয়ে এমন নির্ভীক অভিযান কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

নৈর্ব্যক্তিক মানসিকতা

ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক মন গড়ে তোলা অসম্ভব। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে যতখানি নৈর্ব্যক্তিক মানসিকতা অর্জন সম্ভব ততখানি পরিমাণে ব্যক্তির মন নিঃস্বার্থবোধের প্রেরণায় হয় নিস্পৃহ। মন নিঃস্বার্থ হলে প্রবলভাবে সক্রিয় হয়েও বহুলভাবে নিস্পৃহ হওয়া সম্ভব। নিস্পৃহা ও নিরাসক্তির প্রভাবে মনকে শুদ্ধ ও সংযত করা সম্ভব হলে কোন কাজে জয়লাভের ফলে সে মন যেমন মাত্রাহীনভাবে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না, তেমনি পরাজয়েও বিমর্ষ হয়ে ভেঙ্গে পড়ে না। গভীর নিঃস্বার্থবোধ সুভাষ-মানসকে এমনভাবে নিস্পৃহ করে গড়ে তুলেছিল যে তার ফলে কোন পরাজয়ই নেতাজীকে পর্যুদস্ত করতে পারেনি। অনেক নেতৃত্ব জয়ের পথে অনন্য হয়ে ওঠে কিন্তু পরাজয়ের আঘাতে আবার মুহূর্তের মধ্যে খান খান হয়ে ভেঙ্গে যায়। কিন্তু নেতাজী-নেতৃত্ব ছিল অন্য ধাতুতে গড়া।

গান্ধী-নেতৃত্বের বিরোধিতা করতে গিয়ে নেতাজী নির্মমভাবে আহত হয়েছেন। কখনো কখনো সুভাষ-নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য কোন প্রচেষ্টার ত্রুটি করা হয়নি। কিন্তু সুভাষ-নেতৃত্ব প্রতিটি আঘাত অটুট ধৈর্য, বুদ্ধির স্থিরতা এবং সাহসের দৃঢ়তার দ্বারা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। হলোয়েল আন্দোলনে ব্যর্থ হয়েও নেতাজী নিরাশ হন নি,—আবার অজানার অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে গড়ে তুলেছেন তিনি আজাদ হিন্দ্। আজাদ হিন্দের জয় পরাজয়

এবং পশ্চাদপসরণ কালে ব্যর্থতার অবসাদ অস্বীকার করে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও তাঁর অনুসারীদের মনে যে অপূর্ব আশাবাদ সৃষ্টি করেছিলেন, চরম পরাজয়কেও যিনি বিজয়ের দুর্জয় প্রেরণায় রূপান্তরিত করে যুদ্ধোত্তর ভারতে তার দুর্বার তরঙ্গ প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন,—সুভাষ-নেতৃত্বে সেই অপূর্ব ইতিহাস আদর্শব্রতী মানবগোষ্ঠীর চিরন্তন প্রেরণা হয়ে থাকবে।

নেতাজীর নেতৃত্ব শুধু ভারতের নয়, সমগ্র মানবসমাজের এক অবিস্মরণীয় প্রেরণা। যাঁরা মানবসমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দুঃসাহসিক নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করে ইতিহাসের যাত্রাপথে নিজেদের অক্ষয় পদচিহ্ন রেখে যাবেন, তাঁদের সামনে যুগে যুগে নেতাজীর বৈপ্লবিক নেতৃত্ব চির-উজ্জ্বল বর্তিকার ন্যায় অবিকম্প প্রেরণা সঞ্চার করবে।

—যুগান্তর

নেতাজীর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ শুধু জল মাটিতে গড়া একটি মৃন্ময় ভূমি নয়,—নেতাজী এই প্রাচীন ভূমিকে অনুভব করেছেন চিন্ময়ী দেবাত্ম মাতৃভূমি-রূপে। দেশপ্রেমের যে রাজনৈতিক সংজ্ঞা নেতাজীর জীবনকে মহাবিপ্লবীরূপে প্রতিভাত করেছে তা' গতানুগতিক রাজনৈতিক পেট্রিয়টিজমের পরিমাপে বিচার করা সম্ভব নয়। জীবনের প্রভাতে নেতাজীকে হিমালয় ডাক দিয়েছিল অধ্যাত্ম সাধনায়, কিন্তু বুদ্ধদেব ও বিবেকানন্দের ন্যায়,—নেতিবাদী পরমার্থের সন্ধানে নয়,—ভারতের প্রতিটি মানুষের কল্যাণের ভিতর দিয়েই তিনি তাঁর রাজনৈতিক সাধনার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন।

নেতাজীর কাছে ভারতের জাতীয়তা তাই শুধু সাধারণ রাজনৈতিক তাৎপর্যে সীমিত নয়। তিনি ভারতীয় জাতীয়তাকে পাশ্চাত্যের অনুসারী 'স্টেট ন্যাশন্যালিজমের' অর্থে গ্রহণ করেননি। নেতাজীর দৃষ্টিতে ভারতের জাতীয়তার মর্মার্থ পরিস্ফুট হয়েছে আত্মিক ও সাংস্কৃতিক প্রমূল্যে। তাই, শ্রীনেহরুর ন্যায় তিনি ভারতকে বহুজাতির একটি মিশ্রজাতি-রূপে গ্রহণ করেননি,—নেতাজীর কাছে ভারত, ভারতের জাতীয়তাবোধ এক অখণ্ড পূর্ণ সত্তা স্বরূপ।

'নেতাজীর জননী জন্মভূমি' প্রবন্ধটিতে কিভাবে তিনি ভারতবর্ষের জাতীয়তাকে অনুভব করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। দেশপ্রেম বলতে নেতাজীর মনে কোন্ প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল তাই লিপিবদ্ধ হয়েছে 'ভারত-পথিকের ভারত-প্রেম' প্রবন্ধটিতে। এই অনুভূতিটিই আরও স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা হয়েছে 'নেতাজীর দৃষ্টিতে ভারতের ঐক্য ও জাতীয়তা' নামক রচনায়।

নেতাজীর জননী-জন্মভূমি

ভারত ইতিহাস আজ আমাদের ডাক দিয়েছে আত্মত্যাগের, ডাক দিয়েছে অগ্নি, মৃত্যু ও রক্ত স্বাক্ষরের। যুগসন্ধির এই ডাকে সাড়া দেব আমরা কোন্ প্রতিশ্রুতিতে? আমাদের এই জাতীয় প্রতিশ্রুতির অগ্নিহোত্রী হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। জাতীয় জীবনের এই সংকটক্ষণে যে পথ ও পাথেয় আমাদের চাই, যে বীর্যবাণী আমাদের দেবে পথের সংকেত নেতাজীর জীবন ও সাধনা তারই অপূর্ব প্রতীক। এযুগের মহত্তম বীর এবং শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী ও যুবনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র। আজ তাঁরই দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে আমাদের ভারতবর্ষকে, অনুভব করতে হবে মাতৃভূমির বর্তমান জাতীয় সংকট।

নেতাজীর কাছে ভারতবর্ষের স্বরূপ কি? ভারতবর্ষ কি শুধু জল, মাটি ও মানুষের একটি ভৌগোলিক ভূখণ্ড মাত্র? এই দেশের প্রতি আনুগত্যের তাৎপর্য কি নিছক রাজনৈতিক প্যাট্রিয়টিজম? ভগ্নী নিবেদিতা বলেছেন, 'বিবেকানন্দের সমস্ত গর্বের অধিরাণী ছিলেন তাঁর মাতৃভূমি ভারতবর্ষ।' নেতাজীর কাছেও তাই,— ভারতবর্ষ তাঁর কাছে এক আত্মিক চিন্ময় সত্তার জীবন্ত প্রমূর্তি। ভারতবর্ষ তাই বিবেকানন্দের কাছে 'স্বর্গ মৃত্তিকা',—'দেবভূমি'। নেতাজীর কাছেও ভারতবর্ষ দেবাত্মভূমি,—'ডিভাইন মাদারল্যাণ্ড'।

নেতাজী তাই প্রচলিত অর্থে প্যাট্রিয়টিজমের রাজনৈতিক নেতা বা পলিটিক্যাল স্টেটসম্যান নন,—তিনি দেবাত্মভূমি ভারতবর্ষের এক আত্মিক যাত্রী,—তিনি 'ভারতপথিক'। এই নামটি গ্রহণ করে নিজের আত্মজীবনীতে তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর দেশপ্রেমের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে। এরূপ আত্মিক অনুভূতিতে তিনি প্রবুদ্ধ হয়েছেন বলেই নিজের রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, 'রাজনীতি আমি পেশা বা বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিনি, মাতৃভূমি আমার জপতপ ও স্বাধ্যায়, সাধনা ও মুক্তির সোপান।' ভারতবর্ষকে তিনি জননী জন্মভূমিরূপে গ্রহণ করেছেন,—তাই নিজের জীবনাদর্শের কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন, "নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকাশ করে ভারত-মাতার পদাম্বুজে অঞ্জলিরূপে নিবেদন করব,—এই আন্তরিক উৎসর্গের ভিতর দিয়ে পূর্ণতর জীবন লাভ করব।" দেশপ্রেম যাঁদের এমনি আত্মিক অনুভূতির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তাঁরাই জীবনমৃত্যুকে একই ছন্দে গ্রহণ করে হন অবিস্মরণীয়। দাগ রেখে যান তাঁরা ইতিহাসের পাতায়,—নয় দুর্জয় ও দুঃসাহসিক জীবনের মহাকাব্যে,—সৃষ্টি করেন ইতিহাসের নতুন অধ্যায়। নেতাজী তেমনি ইতিহাস-পুরুষ, তাঁর জীবনগাথার ভৈরবগীতি এখনও তাই, ধ্বনিত হয়ে চলেছে ভারতের জাতীয় জীবনে।

নেতাজী বিবেকানন্দের আত্মিক স্বপ্নে দেখেছেন নতুন ভারতের স্বপ্ন। তিনি বলেছেন যে কেউ তাঁকে শ্যভিনিস্ট বলতে পারেন তবু তিনিও বিবেকানন্দের সেই বাণীকে বিশ্বাস করেন যে ভারতের 'একটি বাণী আছে।' তিনি বলেছেন, "আমাকে উগ্র দেশপ্রেমিক বলতে পারেন, তবুও আমি বলবো ভারতের একটি বাণী আছে, একটি মিশন আছে, সেজন্যই আজও ভারত বেঁচে আছে। ভারতকে বেঁচে উঠতেই হবে, কারণ নিজেকে বাঁচিয়ে স্বাধীন ভারত পৃথিবীর সংস্কৃতি ও সভ্যতায় অনেক কিছু দেবে।"

নেতাজী মানব-ইতিহাসের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছেন যে,

মিশর, ব্যাবিলনিয়া, ফোয়েনিসিয়া ইত্যাদি দেশগুলিতে শুধু অতীতের মাটি ও মানুষের বংশধরেরা বেঁচে আছে, কিন্তু তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির কিছুই বেঁচে নেই। তিনি বলেছেন, "মিশর বা ব্যাবিলন, ফোয়েনিসিয়া বা গ্রীসের মত ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতা মরে যায়নি। ছু' বা তিন হাজার বছর আগেকার পূর্ব পুরুষদের ন্যায় আজও মূলত আমাদের একই চিন্তা, একই জীবনদর্শন, একই অনুভূতির প্রভাব রয়েছে, অতীতকাল থেকে আজকের দিনেও ভারতবাসীর জীবনে ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারা অবিচ্ছিন্ন রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই যে ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা,—মানব-ইতিহাসে এটি একটি অপূর্ব ঘটনা।" নেতাজী তাই ভারতবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "অনেক মৃত্যু, অনেক জাগরণের ভিতর দিয়ে ভারত এগিয়ে এসেছে, কারণ ভারতের একটি মিশন আছে, বাণী আছে।"

স্বামীজী ও নেতাজীর এই ভারত-বাণীর স্বরূপ কি? এই ভারতবাণীর মর্মকথা হলো,—সমন্বয়ী জীবনদর্শন। কোন প্রমূল্যই একান্ত নয়, আবার বর্জনীয়ও নয় সব। বিভিন্ন প্রমূল্যের কল্যাণকর যুগধর্মী অংশকে সচেতন মনীষায় সমন্বিত করে কাল ও দেশ-প্রযোজ্য জীবনদর্শন রচনার বাণীই ভারতের বাণী। দেহ ও আত্মা, জড় ও চেতন, অতীত ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, জাতীয়তা ও বিশ্বজনীনতা,—এমনি বিভিন্ন প্রমূল্যের সমন্বয়-সাধনে সৃজনধর্মী মানবতা ও প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে নেতাজী এমনি জীবনদর্শনকে ভারতীয় শব্দে এবং ভারতীয় তাৎপর্যে নাম দিয়েছেন,—'সাম্যবাদ' বা 'সমন্বয়বাদ'। নেতাজী একান্তধর্মী নন বলেই তিনি একবাদী বা 'মনিস্টিকও' নন। তিনি মনে করেন যে, রাশিয়ার কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণীয় আছে, আবার পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের কাছ থেকেও নেবার আছে অনেক। কোন কথাই মানব-সমাজের শেষ কথা নয়, কোন মতবাদ ইতিহাসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও

নয়। এজন্য গভীরভাবে অধ্যাত্মবাদী হয়েও রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পরিকল্পনারও অনেক কিছু গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন নেতাজী। তেমনি তিনি গণতন্ত্রবাদী হয়েও ন্যাশনাল সোস্যালিস্টদের সুনিপুণ শৃংখলা ও পরিকল্পনার দক্ষতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের পক্ষপাতী। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মানবতাবাদ এবং ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বাধীনতাকেও তিনি উচ্চ মূল্য দিয়েছেন। আজকের পৃথিবীর খণ্ড-বিখণ্ড একান্তবাদী সমাজে এযুগের ভারতবর্ষ বিশ্বজনীনতার সমন্বয়ের বাণী নিয়ে যাবে, যেমন স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশে গিয়েছিলেন ভারতের আধ্যাত্মিক প্রমূল্যের বাণী নিয়ে। নেতাজী সে স্বপ্নই দেখেছেন নতুন ভারতের জীবন-বাণীতে।

কিন্তু আজ? আজ শুধু ভারতবর্ষের সীমানাই নয়, ভারত-আত্মাও আজ বিপন্ন। দেশ ভাগ করে একবার বিপদ ডেকে এনেছে ভারতবর্ষ। সেদিন নেতাজী রেঙ্গুন বেতার থেকে আকুল আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, "আমি পাকিস্তান প্রস্তাবের ভিত্তিতে আমাদের মাতৃভূমিকে বিভক্ত করার বিরোধী,—আমাদের দেবাত্ম মাতৃভূমিকে খণ্ড করা চলবে না,—our divine motherland shall not be cut up." দেশভাগের সেই বিপদের পরে ভারতের ভাগ্যে এসেছে আরও কঠোরতর আরেক চরম সংকট।

উত্তর থেকে আজ ভারতের বুকে হাত বাড়িয়েছে এক প্রলুব্ধ ড্রাগন। এ শুধু ভারতের মাটির উপর রক্তনখর বিস্তার নয়, ভারতের আত্মাকে টান দিয়েছে লাল চীন। আজ যে সংঘাত সুরু হয়েছে উত্তর সীমান্তে তা এক প্রচণ্ড আদর্শনৈতিক সংগ্রাম। ভারতকে শুধু সামরিক ক্ষেত্রে পঙ্গু করতে চায় না কম্যুনিস্ট চীন,—চায় ভারতের প্রাণধর্মকে, তার অন্তরাত্মাকে পর্যুদস্ত করতে। তাই কম্যুনিস্ট চীন আজ টান দিয়েছে হিমালয়ের শিকড় ধরে। হিমালয় ভারতের কাছে শুধু উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণীই নয়,—হিমালয় ভারতের যুগযুগান্তের জীবন-মানসের প্রতীক। হিমালয় রক্ষার

প্রশ্ন তাই শুধু রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা রক্ষার প্রশ্ন নয়, ভারতের আর্থিক সত্তাকে রক্ষার প্রশ্ন। বিবেকানন্দ বলেছেন, "ঐ কৈলাস, ওখানে শিবের বাস। শিব এদেশে চিরকাল থাকবেন, চিরকাল ডমরু বাজাবেন।" কিন্তু কৈলাস-মানস আমাদের গেছে,—আজ টান পড়েছে গোটা হিমালয় নিয়ে। ভারতের মৌল সত্তায় এমন সংকট ইতিহাসের আর কোন কালে কোন যুগে আসেনি। ভারতাত্মা হিমালয়,—সেই হিমালয়কে কেড়ে নিতে উদ্যত আজ চীনা কম্যুনিস্ট শক্তি। হিমালয় যদি যায় তা' হলে ভারতের মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারবে না।

কিন্তু না, ভারতের মৃত্যু নেই। যুগ যুগ ধরে ভারত বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবেও। স্বামীজী ও নেতাজীর জননী জন্মভূমি শুধু ভারতের জন্য নয়, বিশ্বজনীন মানবধর্মের জন্য। সুচিন্তিতভাবে তাই ভারতের প্রাণোৎসকে রক্ষা করতে হবে। শান্তিবাদের নামে অনেক অবসাদ, অনেক ক্লীবতা, অনেক নিষ্ক্রিয়তাবাদ আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। আজ আমাদের অভিধর্মে ক্ষাত্র শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে ভারতবর্ষকে আজ চাই ত্যাগ ও মৃত্যুর স্বাক্ষরে নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি। স্বামীজী ও নেতাজীর জীবন ও কর্ম আজ আমাদের ডাক দিয়েছে সেই সংগ্রামের পথে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে,—স্বামীজী ও নেতাজীর জননী জন্মভূমি আজ সংকটাপন্ন। আজ এই সংকট-মুক্তির শপথে বলিষ্ঠ এক দুর্মদ দুর্জয়ী ভারতবর্ষ রচনার সংকল্পই হবে স্বামীজী ও নেতাজীর প্রতি আমাদের জয়ন্তী-ব্রতের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

—আনন্দবাজার

ভারত-পথিকের ভারত-প্রেম

কী বেদনায় আকুল হয়ে ভারত-বিভাগ পরিকল্পনার বিরোধিতায় নেতাজী তাঁর স্বদেশবাসীকে লক্ষ্য করে বেতার ভাষণে বলেছিলেন, 'আওয়ার ডিভাইন মাদারল্যাণ্ড শ্যাল নট বি কাট আপ',—তার মর্মার্থ উপলব্ধি করা সম্ভব হলে তবেই ভারত-পথিকের ভারত-প্রেমের উৎস সন্ধান করা সম্ভব হবে। একান্ত জাতীয়তাবাদী এবং প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমিক্‌রূপে সবাই নেতাজীর পরিচয় দিয়ে থাকেন; কিন্তু পাশ্চাত্য 'ন্যাশন্যালিজম' বা 'প্যাট্রিয়টিজমে'র তুল্যার্থে নেতাজীর ভারত-প্রেমের মান নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যে অনুভূতির আবেগে বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে 'দেবভূমি'রূপে সম্ভাষিত করেছেন, নেতাজীও সেই আবেদনেই ভারতভূমিকে 'দেবতাত্মা মাতৃভূমি' জ্ঞানে তাঁর সমগ্র জীবন-বাণীর অধিষ্ঠাত্রীরূপে বরণ করে নিয়েছেন। বৈদান্তিক হয়েও বিবেকানন্দের সমস্ত সাধনার মূল লক্ষ্য ছিল,—জননী ভারতভূমি। সুভাষচন্দ্রও তাঁর সমগ্র স্বপ্ন ও সাধনার প্রেরণারূপে গ্রহণ করেছেন মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে। ভারত-পরিব্রাজক বিবেকানন্দের মত সুভাষচন্দ্রও তাই নিজের পরিচয় দিয়েছেন ভারত-পথিকরূপে। এই ভারত-পথিক নামটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে সুভাষচন্দ্রের ভারত-প্রেমের মর্মবাণী।

নেতাজী বলেছেন, "ইংরেজ ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্য এনে

দিয়েছে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বস্তুত, আড়াই হাজার বছর আগেও বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের সময়ে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক একতা লাভ করেছিল। অশোকের পরে ভারতবর্ষ অনেক ভাঙা-গড়ার পথে এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু যুগে যুগে পতন এবং তারপরেই প্রগতি ও উত্থানের আমন্ত্রণ দেখা দিয়েছে ভারতবর্ষে।" সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী এবং সাংস্কৃতিক প্রমূল্যের উপাদানে কিভাবে ভারতবর্ষ একাত্ম হয়েছে ও সংহতি লাভ করেছে তার গতি সন্ধান করে নেতাজী লিখেছেন, "ভূগোলের দিক দিয়ে ভারতবর্ষ ঐক্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নৃতত্ত্ব ও ভাষার বৈচিত্র্যও ভারতবর্ষে কোন সমস্যার সৃষ্টি করেনি। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ভারতবর্ষ বহু জাতিকে আপন করে নিয়েছে এবং সর্বসাধারণকে দিয়েছে এক সার্বিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য।" নেতাজীর অভিমতে এই সার্বিক সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আত্মিক প্রমূল্যের সম-অনুভূতির উৎসেই সমগ্র ভারতবাসীর মনে জন্মলাভ করেছে এক গভীর ভারতীয়তাবোধ।

পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন দেশে ও কালে কালে বহু উন্নত জাতি ও সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু আজ সেসব দেশের ভূগোল বেঁচে আছে বটে, কিন্তু ইতিহাস স্থান লাভ করেছে প্রত্নতত্ত্বের জীর্ণপাতায়। কিন্তু শত বিপর্যয়ের মধ্যেও ভারতবর্ষের জীবনস্রোত অবিচ্ছিন্ন রয়েছে। মানব ইতিহাসের এই বিস্ময়কর ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করে নেতাজী ভারত-ইতিহাসের তাৎপর্য নির্ণয়ে জানিয়েছেন, "মিশর বা ব্যাবিলন, ফোয়েনিশিয়া বা গ্রীসের মত ভারতে প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতা মরে যায়নি। দু' বা তিন হাজার বছরের আগেকার আমাদের জীবনে মূলত একই চিন্তা, একই পূর্বপুরুষের ন্যায় আজও জীবনাদর্শ এবং এই অনুভূতির প্রভাব রয়েছে। এরূপ ধারাবাহিকতা ইতিহাসের এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য।'

নেতাজীর কাছে ভারতবর্ষ বৃটিশ-বিরোধী নেতিবাদী রাজনৈতিক প্রয়োজনে সদ্য-সংহত একটি দেশ নয় এবং ভারতবাসীও রাজনৈতিক

প্রয়োজনে নতুন করে সন্নিবিষ্ট একটি মিশ্র জাতি নয়। নেতাজী ভারতবর্ষকে একটি অখণ্ড দেশ এবং ভারতবাসীকে একটি অখণ্ড জাতিরূপে গ্রহণ করেছেন। রাসায়নিক অর্থে মিশ্র ও যৌগিক পদার্থের মধ্যে যে পার্থক্য, বহুজাতিক জাতি ও সমন্বিত জাতির দ্বয়ী অর্থেও রয়েছে সেই তাৎপর্য। ভারতবর্ষে ভাষা ও বংশের বৈচিত্র্য আছে কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে এক অন্তঃসলিলা একাত্ম-ধারা। সাংস্কৃতিক ও আত্মিক প্রমূল্য যাদের মানসিকতায় প্রাধান্য পায় না তাদের পক্ষে ভারতভূমির দেশ ও জাতীয়তার একাত্মবোধের স্বরূপ অনুধাবন করাও সম্ভব নয়। ভারত বিখণ্ডনের কল্পনা তাই রাজনৈতিক অর্থেই শুধু নেতাজীকে বিচলিত করেনি, তিনি একথা উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতীয় সত্তা যদি বিখণ্ডিত হয়ে যায় তা' হলে ভারতীয় প্রাণধারাই পঙ্গু হয়ে যাবে। ইংরেজ সরকার ভারতের এই প্রাণসত্তাকে পঙ্গু করে দেওয়ার যে চক্রান্ত করেছিল তার সংকেত লক্ষ্য করে তিনি পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণের আগেই হরিপুরা ভাষণে এরূপ সম্ভাবনা সম্বন্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। যেদিন দেশভাগের পরিকল্পনার ভিত্তিতে ভারতীয় নেতৃবর্গ ওয়াভেল প্রস্তাব আলোচনায় রাজী হন সেদিন তিনি অস্থির হয়ে বারবার বেতার ভাষণে ভারতীয় নেতৃবর্গকে বলেন, "আমরা ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারত রচনার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করছি। আমি একথা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করেছি যে দেশ ভাগ হলে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে ভারতবর্ষ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের মাতৃভূমিকে বিখণ্ডিত করার পাকিস্তানী পরিকল্পনার আমি তীব্র বিরোধী। আমাদের দেবাত্মা মাতৃভূমিকে খণ্ডিত করা কোনমতেই চলবে না।"

নেতাজী ভারতপ্রাণ। তাঁর স্বপ্ন, সাধনা ও আদর্শের মর্মকেন্দ্র হলো জননী জন্মভূমি ভারতবর্ষ। তাঁর এই ভারত-প্রেমকে অনেকে উগ্র স্বাদেশিকতা বা 'শ্যভিনিজম' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এরূপ কটাক্ষের প্রত্যুত্তরে নেতাজী বলেছেন যে, তিনি সংকীর্ণ রাজনৈতিক

অর্থে ভারত-প্রেমিক নন, ভারতবর্ষ তাঁর কাছে বিবেকানন্দের ন্যায় 'আরাধ্যা দেবী' এজন্যে যে যুগযুগান্তের তপস্যায় ভারতবর্ষে এমন একটি জীবনবোধ গড়ে তুলেছে যার অবদানে এ যুগের ভারতবর্ষ নিজেকে পুনর্গঠিত করে বিশ্বের কাছে তুলে ধরবে তার এক বিশেষ জীবন-বাণী। সুভাষচন্দ্র তাই বলেছেন, "ভারতের একটি বাণী আছে, —ইণ্ডিয়া হ্যাজ এ মিশন টু ফুলফিল এবং এই মিশনকে তুলে ধরতে হবে বিশ্বের কাছে। ভারতের সংস্কৃতির মধ্যে এমন কিছু আছে যা বিশ্বমানবের পক্ষে একান্ত আবশ্যক এবং যা গ্রহণ না করলে বিশ্ব-সভ্যতার প্রকৃত বিকাশ হবে না। অনেক মৃত্যু ও পুনর্জাগরণের ভিতর দিয়ে ভারত এগিয়ে এসেছে, কারণ ভারতের আছে একটি মিশন, একটি জীবন-বাণী।" নেতাজীর রাজনৈতিক আদর্শ তাঁর সমাজবাদী চিন্তাধারা, তাঁর আন্তর্জাতীয়তা ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী, সব কিছুই প্রবুদ্ধ হয়েছে এই ভারতীয় জীবন-বাণীর আমন্ত্রণে। ভারতের এই জীবন-বাণীকে সার্থক করে তোলার জন্য নেতাজী উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন. "ভারতকে বেঁচে উঠতে হবেই, কারণ ভারত নিজেকে বাঁচিয়ে বিশ্বমানবকে বাঁচাবে।"

—আনন্দবাজার

নেতাজীর দৃষ্টিতে ভারতের ঐক্য ও জাতীয়তা

ভারতের জাতীয় জীবন ভিতরে-বাইরে দু দিক থেকেই আজ সংকটের সম্মুখীন। বাইরে হিমালয় সীমান্তে চীনের আক্রমণাত্মক কার্যক্রম, কাশ্মীরে পাক-হিন্দের দ্বন্দ্ব। ঠিক সেই সময়েই ভিতরের জীবনের অনৈক্য ভেদাভেদ ও গৃহবিবাদের ইংগিতবাহী জাতীয় অসংহতি। একই সময়ে ভিতরে ও বাইরের সংকট যে-কোন জাতির পক্ষে গুরুতর উদ্বেগের কারণ। আজ ভারতের নেতৃবর্গ জাতীয় সংহতি ও ভাবাত্মক জাতীয় ঐক্য তথা ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেসন বা ইমোশন্যাল ইন্টিগ্রেশনের কথা অবিরাম বলে চলছেন কিন্তু কি কারণে এই অসংহতির বিক্রিয়া শুরু হয়েছে তার মূল কারণের বিশ্লেষণ খুব কমই হয়েছে। পাকিস্তান প্রস্তাব মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার অনেক আগে থেকেই নেতাজী দেশভাগের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালে পাকিস্তান প্রস্তাবের ভিত্তিতে তৎকালীন বড়লাট ওয়াভেলের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃবর্গের আলোচনাকালে নেতাজী রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুর বেতার থেকে বারবার ভারতীয় নেতৃবর্গকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, 'ভারত যদি বিভক্ত হয় তা' হলে কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন,—সব দিক থেকে ভারত ধ্বংস (ruined) হয়ে যাবে। আজ জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে

নেতাজীর সাবধান-বাণী যথার্থ বলে প্রমাণিত হচ্ছে এবং সবচেয়ে মারাত্মক হয়ে উঠেছে ভারতের জাতীয় জীবনে ঐক্যানুভূতির অভাব।

ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও জাতীয়তার স্বরূপ কি? জাতীয় অসংহতির ভয়াবহ রূপ দেখে অনেকে বলতে আরম্ভ করেছেন যে বস্তুত ভারত কখনো একটি রাষ্ট্র বা জাতি ছিল না,—ইংরেজ শাসনের কঠোর বন্ধনে কৃত্রিমভাবে ভারতে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ও জাতীয়তা গড়ে উঠেছিল। আজ কঠোর কেন্দ্রীয় শাসনের অভাবে সেই ঐক্য ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। বস্তুত অনেক ভারতীয় নেতাই ভারতের রাষ্ট্র ও জাতীয়তার বুনিয়াদকে বিচার করে থাকেন নেপোলিয়ানোত্তর রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তার ইতিহাস ও সংজ্ঞা দ্বারা। কিন্তু নেতাজীর বিশ্লেষণ অনুযায়ী ভারতের জাতীয় ঐক্য ইংরেজ শাসনের সৃষ্টি নয় বা নেপোলিয়ানোত্তর স্টেট ন্যাশনালিজম তথা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের পথে ভারতের জাতীয় ঐক্যের অনুভূতি গড়ে ওঠেনি।

ইয়োরোপীয়ান ঐতিহাসিকেরা অজস্রভাবে এই মত প্রকাশ করেছেন যে ভারতের ঐক্য ও জাতীয়তার জনক ইংরেজ শাসন। নেতাজী এরূপ মতবাদের প্রতিবাদ করে ভারতীয় সংগ্রাম বইটিতে লিখেছেন, "ইংরেজ ভারতবর্ষে রাজনৈতিক একতা এনে দিয়েছে, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বস্তুত ২৫০০ বছর আগে বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের সময় ভারত প্রথম রাজনৈতিক একতা লাভ করেছিল। অশোকের পরে ভারতবর্ষ অনেক ভাঙা-গড়ার ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেছে। পতন এবং তার পরেই প্রগতি ও উত্থাপনের যুগ পর্যায়ে পর্যায়ে ভারতে দেখা দিয়েছে। জাতীয় জীবনের এই উত্থান পতনের মধ্যেও শেষ পর্যন্ত ভারতের জাতীয় প্রগতি অব্যাহত রয়েছে। অশোকের এক হাজার বছর পরে গুপ্ত সম্রাট্দের আমলে ভারতবর্ষ আবার প্রগতির শীর্ষে উঠেছিল। তার নয়শত বছর পরে মোগল

সম্রাটের আমলে ভারত আবার প্রগতির শীর্ষে উঠেছিল। সুতরাং ইংরেজ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক একতা এনে দিয়েছে এ-ধারণা ভুল।”

নেতাজীর মতে, মূলত কোন রাজনৈতিক শাসনে বা পরকর্তৃত্বে অথবা ভৌগোলিক কারণে ভারতের জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠেনি,—ভারতের জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছে ভারতের সমন্বয়বাদী জীবনধর্মের সাংস্কৃতিক অবদানে। নেতাজী ভারতীয় সংগ্রাম বইটিতে তাই লিখেছেন, “সাধারণত ইয়োরোপীয়ান ঐতিহাসিকেরা ভারতের ঐক্যের চেয়ে বৈচিত্র্যের দিকটিই বেশী করে দেখেছেন। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে একজন পর্যবেক্ষকের কাছে ভারতের অন্তহীন বৈচিত্র্যের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে,—তথাপি এই বৈচিত্র্যের অন্তরালে রয়েছে এক ভৌগোলিক ঐক্য। ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য বা রাজনৈতিক আধিপত্যে যে ঐক্য সৃষ্টি হয় ভারতে অন্তর্নিহিত মৌলিক ঐক্য নিঃসন্দেহে তার চেয়ে অনেক সুগভীর। এই ঐক্য রক্ত, বর্ণ, ভাষা, বসন, আচার-ব্যবহার ও সম্প্রদায়ের অগণিত বৈচিত্র্যের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে।”

ভারতে বহু রাজ্য-সাম্রাজ্যের উত্থান পতন হয়েছে, তবু ভারতের জাতীয় ঐক্যানুভূতি ব্যাহত হয়নি, কারণ নেতাজীর মতে ভারতের ঐক্য ও জাতীয়তা গড়ে উঠেছে মূলত সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক প্রমূল্যের সমন্বয়ী অবদানে। নেতাজী তাই লিখেছেন, “ভারত সব সময়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে একই ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। এরূপ সংহতির সবচেয়ে বড় উপাদানের কাজ করেছে হিন্দুধর্ম। উত্তরে বা দক্ষিণে অথবা পূর্বে বা পশ্চিমে যেখানেই কেউ যাক না কেন, সেখানেই দেখতে পাওয়া যাবে যে একই আদর্শ, একই সংস্কৃতি এবং একই ঐতিহ্য প্রচলিত। হিন্দুরা সমগ্র ভারতবর্ষকে এক পবিত্র ভূমিরূপে গণ্য করে। পবিত্র নগরসমূহের মত পবিত্র নদীগুলিও সর্বত্র বিস্তারিত। একজন ধর্মকামী

হিন্দুকে তীর্থ-পরিক্রমাকালে দক্ষিণে রামেশ্বর সেতুবন্ধ ও উত্তরে হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত বদ্রীনাথ দর্শন করতে হয়। শ্রীশঙ্করাচার্য তাই ভারতের চার কোণে চারটি আশ্রম স্থাপন করেন। একই শাস্ত্র সর্বত্র পঠিত ও অনুসৃত এবং রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্য একইভাবে সর্বত্র সমাদৃত।"

হিন্দুধর্মের এই অবদানে কোন গোঁড়ামি ছিল না। তাই নেতাজী মুসলমান আমলে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐক্যানুভূতির প্রগতির কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, "মুসলমানদের আগমনে ভারতে এক নতুন সমন্বয় সৃষ্টি হতে আরম্ভ করে। মুসলমানেরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেনি, কিন্তু এই দেশের জনতার সামাজিক জীবনে পরস্পরের সুখ-দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করেছে। পারস্পরিক সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে এক নতুন শিল্প ও সংস্কৃতি,—যা অতীত থেকে অনেকাংশে পৃথক্ হয়েও সম্পূর্ণ ভারতীয় স্থাপত্যে, চিত্রকলায়, সঙ্গীতে দুইটি সাংস্কৃতিক ধারার সুসঙ্গমে নূতন সৃষ্টি গড়ে উঠেছে।"

ভারতের এই সমন্বয়ধর্মী জাতীয় জীবনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে নেতাজী বলেছেন, "পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট অবদান রয়েছে।" মিশর দেশটি আছে, পিরামিডও আছে, কিন্তু অতীতের মিশরের প্রাণধারা বেঁচে নেই; ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান আছে কিন্তু ব্যাবিলনীয় সভ্যতা নেই; তেমনি গ্রীস আছে গ্রীসের স্থাপত্য আছে কিন্তু গ্রীক সভ্যতার আত্মা বেঁচে নেই। পক্ষান্তরে হাজার বছর আগেকার পূর্বপুরুষদের মত আজও আমাদের জীবনে মূলত একই চিন্তা, একই জীবনের আদর্শ এবং একই অনুভূতির প্রভাব রয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে অতীত কাল থেকে আজকের দিনেও ভারতবাসীর জীবনে ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারা অবিচ্ছিন্ন রয়েছে। এরূপ অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা ইতিহাসের এক বিশিষ্ট পরিচয়। গত তিন হাজার বছরে নতুন আদর্শ অনেক সময়ে নতুন সংস্কৃতি নিয়ে

বাইরে থেকে অনেক গোষ্ঠী এসেছে। এই সমস্ত নতুন আদর্শ ও সংস্কৃতি ভারতের জাতীয় জীবন ধীরে ধীরে আপন করে নিয়েছে। প্রাচীনকালে আমাদের যে সংস্কৃতি ও সভ্যতা ছিল মূলত আজিও তাই রয়েছে। যদিও কালের গতিতে পরিবর্তন হয়েছে আমরা এগিয়ে চলেছি।"

আধুনিক কালে শুধু অতীতের অধ্যাত্মবাদ বা সংস্কৃতির অবদানে যে ভারতীয় ঐক্য ও জাতীয় সংহতির বুনিয়াদ গড়ে তোলা সম্ভব নয় নেতাজী সে সম্বন্ধেও গভীরভাবে সচেতন। তাই আধুনিক ভারতের জীবন-ধর্ম রচনার মূল দৃষ্টিভঙ্গীর নির্দেশ করে তিনি বলেছেন, "অতীতে ভারত সভ্যতার দিকে দৃষ্টি দেয়নি দিয়েছে সাংস্কৃকির দিকে, পার্থিব জীবনের প্রতি লক্ষ্য করেনি, করেছে মনলোক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের দিকে,—তার ফলে বিজ্ঞানের প্রগতি উপেক্ষিত হয়েছে,—দৈহিক ও পার্থিব জীবনে আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি। ভারতের ইতিহাসে সেই দিনই ছিল গৌরবময় যুগ যেদিন জড় ও চেতন, দেহ ও আত্মার দাবির সুবর্ণ সামঞ্জস্য বিধান এবং দু' দিকেই প্রগতি সম্ভব হয়েছিল। দেহ ও আত্মার গভীর সম্বন্ধের ফলে দেহের উপেক্ষা শুধু জাতির দেহকেই দুর্বল করে না, কালস্রোতে জাতির আত্মাকেও অক্ষম করে দেয়। আমাদের জাতীয় জীবনের পুনঃসংস্থান করতে হলে দেহ ও আত্মা দু' দিকেই আমাদের সমানভাবে এগিয়ে যেতে হবে।"

ভারতে ঐক্য ও জাতীয় সংহতির জীবন্ত অনুভূতি ব্যতীত জাতীয় প্রগতি বিধান বা বাইরের আক্রমণ প্রতিহত করার দুর্জয় জাতীয় সংকল্প রচনা করা সম্ভব নয়। আরব দেশগুলি ভৌগোলিক অবিচ্ছিন্নতা, ধর্মীয় সমতা ও বর্ণের স্বাজাত্য সত্ত্বেও কোনদিন এক জাতীয় অনুভূতিতে শক্তিবান্ হতে সক্ষম হয়নি। ইয়োরোপের ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাগত মৌলিক একতা সত্ত্বেও ইয়োরোপীয়ান জাতীয়তা গড়ে ওঠেনি। কিন্তু ভারতবর্ষের বিচিত্র বর্ণ, ধর্ম, ভাষা

ও ভূগোল সত্ত্বেও একজাতীয় অনুভূতি গড়ে উঠেছে মূলত সমন্বয়ধর্মী সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আবেদনে। রাষ্ট্র ও ভূগোল নিঃসন্দেহে জাতীয় ঐক্য গঠনের আধুনিক পটভূমি, কিন্তু যে মৌলিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী'রূপে জাতীয়তার এক সূক্ষ্ম মর্মানুভূতির আমন্ত্রণে ভারতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছে তার স্বরূপ সন্ধান এবং সেই ভারতীয়তাবোধের স্বধর্মী ধারায় ভারতের ঐক্য ও জাতীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা আজ একান্ত প্রয়োজন। ভারত শুধু রাষ্ট্র নয়,—এক গভীর অধ্যাত্ম অনুভূতির প্রমূর্তি। এই অনুভূতি নেতাজীর শিরায় শিরায় প্রবাহিত ছিল বলেই তিনি ভারত-ভাগ প্রস্তাবের প্রতিবাদে কাতর কণ্ঠের তীব্র বেদনায় বলেছিলেন, "আমাদের পবিত্র মাতৃভূমির (divine motherland) কোনমতেই খণ্ডিত করা চলবে না।" নেতাজীর সমস্ত জীবন উদ্বুদ্ধ হয়েছে ভারতীয়তাবোধের সমন্বয়ী জীবন-ধর্মে। ভারত নিছক ভূগোল বা রাজনীতির প্রতীক নয়, নেতাজীর কাছে ভারত এক গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির চিন্ময় আবেদন। তাই তিনি নিজের আত্মজীবনীতে নিজেকে ভারতবাসীর কাছে পরিচয় দিয়েছেন 'ভারত-পথিক'রূপে এবং এই ভারত-পথিক নিজের জীবন-ধর্মের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, "ভারতের একটি বাণী আছে। তাই যুগের পর যুগ ভারত বেঁচে আছে। এই স্বপ্নই আমার কাছে জীবন্ত সত্য। এই স্বপ্ন থেকেই আমি উদ্দীপনা লাভ করি— আমার প্রাণে কাজ করার প্রেরণা পাই। এই স্বপ্নের অভাবে আমার বেঁচে থাকাই অসম্ভব হতো।"

শুধু রাজনীতির কাঠামোতে একটি রাষ্ট্র গড়ার চেষ্টায় নয়, ভূগোলের নিছক বন্ধনেও নয়,—যদি ভারত-পথিকের দৃষ্টি ও অনুভূতি দিয়ে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রনায়কেরা ভারতীয়তাবোধের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং রাজনীতির সঙ্গে সাংস্কৃতিক

ও আধ্যাত্মিক প্রমূল্যের গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় সংহতি বিধানের পরিকল্পনা রচনা করতে পারেন, তবেই ভারতের ঐক্য ও জাতীয়তা যে শুধু অক্ষুন্ন শক্তিতে সুদৃঢ় হয়ে উঠবে তাই নয়,—এক জীবন্ত আবেদনে ভারতের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সত্তা ভারতীয় জনগণের অনুভূতিকে প্রাণচঞ্চল করে তুলতে সক্ষম হবে। ভারতের এই সংকটক্ষণে নেতাজীর অনুভূতি দ্বারা ভারতীয় জাতীয়তাবোধের অনুভূতি লাভে সচেষ্ট হওয়া এক জাতীয় প্রয়োজন।

—যুগান্তর

মহাক্ষত্রিয় সুভাষচন্দ্র

যে জীবনধর্মের প্রবল আমন্ত্রণে ভারতের জাতীয় মানসকে আজ এক দুর্নিবার সংকল্পে উদ্দীপ্ত ও বীর্যময় করে তোলা প্রয়োজন মহাক্ষত্রিয় সুভাষচন্দ্রের জীবন-বাণী হলো তার প্রমূর্ত আহ্বান। আজ আমরা জাতি হিসেবে ক্ষাত্রধর্মের আমন্ত্রণকে প্রবল করে তোলবার সংকল্প গ্রহণ করেছি কিন্তু তবুও ক্ষাত্রধর্মের সাগ্নেয় প্রতীক মহাক্ষত্রিয় সুভাষচন্দ্রকে জাতীয় মানসের সামনে প্রবলাকারে তুলে ধরতে স্বীকৃত হইনি।

ভারতে জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের স্থান সম উচ্চতায়। গান্ধীজী ত্রিশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় তৈরী করেছেন স্বাধীনতার ভূমিকা, তারই পটভূমিতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। গান্ধীজী অহিংসা ও শান্তিবাদের প্রতীক, নেতাজী শক্তিবাদ ও ক্ষাত্রধর্মের অভী-মূর্তি। গান্ধীজী জাতির ভয় ভেঙেছেন। নেতাজী সেই ভীতিমুক্ত ভারতকে ভাষা দিয়েছেন বিপ্লবের পথে।

সাধারণ রাজনৈতিক সংজ্ঞায় আমরা বীর ও বিপ্লবীর যে আখ্যা দিয়ে থাকি, সামরিক নেতৃত্বের প্রচলিত অর্থে সমর-নায়কের যে পরিচয় দিই, নেতাজীর ক্ষেত্রে তা পূর্ণাঙ্গ নয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক মানকে তুলনা করা হয় গ্যারিবল্ডি, ওয়াশিংটন, সুনিয়াৎ

সেন বা লেনিনের সঙ্গে। কিন্তু এই পরিচয়ে সুভাষ-চরিত্রের পূর্ণ মূল্যায়ণ হয় না। সুভাষের ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাদৃশ্য অপ্রযোজ্য,—একমাত্র ভারতীয় ঐতিহ্যেই সুভাষ-চরিত্রের মূল্যাঙ্কন সম্ভব। সুভাষ আংশিকভাবে বীর ও বিপ্লবী কিন্তু পূর্ণভাবে তিনি মহাক্ষত্রিয়। এই মহাক্ষত্রিয়রূপেও তিনি কোন রাজ-রাজন্য বা ঐতিহাসিক সেনাপতির সমতুল্য নন। ক্ষত্রিয় সুভাষের তুলনা চলে একমাত্র ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের সঙ্গে। পৌরুষের পরিচয়ে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় কিন্তু অন্তর-ধর্মে তিনি ব্রাহ্মণ। তেমনি বীর্যধর্মে সুভাষ ক্ষত্রিয় কিন্তু জীবন-সাধনায় তিনি সন্ন্যাসী। তাই এই ক্ষত্রিয়-সন্ন্যাসীর কাছে জয়-পরাজয়, লাভালাভ ও জীবন-মৃত্যু সমমূল্যের স্থান লাভ করেছে। তিনি দিয়েছেন নিজকে নিঃশেষ করে, কিন্তু প্রাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করেননি। যে ভূমিকা তাঁর নেওয়ার প্রয়োজন ছিল তা' তিনি গ্রহণ করেছেন প্রচণ্ড শক্তিধররূপে, কিন্তু সেই ভূমিকাকে তিনি আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকেননি,—তিনি আরও মহত্তম ভূমিকার সাধনায় নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে।

সুভাষ জীবনকে দেখেছেন বিবেকানন্দের দৃষ্টি দিয়ে। বিবেকানন্দ বৈদান্তিক, কিন্তু তিনি নেতিবাদী নন। তিনি ভালবেসেছিলেন ভারতের মাটি ও মানুষকে, কিন্তু সংকীর্ণ স্বদেশপ্রেমের অর্থে নয়,—যুগযুগান্তের সাধনাপ্লুত ভারতবর্ষ ছিল বিবেকানন্দের কাছে দেবত্বের প্রমূর্তি। ক্লীবত্বের ধূলি-বালি থেকে নির্মুক্তি দিয়ে ভারতের দেবত্বকে বীর্যময় ভূমিকায় অভিসিক্ত করার জন্যই বিবেকানন্দ শক্তিবাদ ও ক্ষাত্রধর্মের আহ্বান জানিয়েছিলেন। নেতাজীও নিজেকে ভারতপথিক-রূপে অভিহিত করেছেন বিবেকানন্দের এই ভারতীয় অনুভূতির গভীর অর্থে। নেতাজী মূলতঃ অহিংসা ও শান্তিধর্মের বিরোধী নন, কিন্তু বহু শতাব্দীর ক্লীবতা ও স্থবিরতার বর্মে আবৃত ভারতবর্ষকে প্রবল প্রাণধর্মের অভিব্যক্তিতে জীবন্ত করে তোলার উদ্দেশ্যেই শক্তিবাদ ও ক্ষাত্রধর্মের পন্থাকে তিনি গ্রহণ

করেছিলেন। রক্ত ও মৃত্যুর অঞ্জলি না দিলে, আমূল মন্থনের তরঙ্গে জাতীয় সত্তাকে সচেতন আলোড়নে তেজোদ্দীপ্ত করে তোলা সম্ভব না হলে নতুন ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠা করা কোন দিনই সম্ভব হবে না,—এই বিশ্বাসেই নেতাজী শান্তি ও আপসরফার পথ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

গান্ধীজীর শান্তিবাদের মহত্তম মূল্যকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েও আজ ভারতের এক যুগধর্মী প্রয়োজন নেতাজীর শক্তিবাদ ও ক্ষাত্রধর্মের ঐতিহ্যকে ভারতের জনমানস, বিশেষ করে সামরিক শক্তির সামনে তুলে ধরা কর্তব্য। নেতাজী আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর-নায়কই নন শুধু, তিনি মৌলিক অর্থে মহাক্ষত্রিয়। তাঁর এই আদর্শবাদী ক্ষাত্রবৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মধ্যে মৃত্যুর মূল্যে নতুন জীবনের বুনিয়াদ রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নেতাজীর সামরিক নেতৃত্ব, তাঁর সমর-বাণী, আজাদ হিন্দ্ ফৌজে বৈদ্যুতিক প্রেরণা সঞ্চার; ত্যাগ, সংগ্রাম, আনুগত্য ও অনুশাসনে তাঁর সামরিক বাহিনীর মধ্যে স্বদেশপ্রেমের অপূর্ব উদ্দীপনা সৃষ্টি,—এই সমস্ত ঘটনাই সম্ভব হয়েছিল এজন্য যে প্রচলিত সামরিক প্রতিভার অর্থে তিনি শুধু একজন দক্ষ সেনাপতি ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক মহত্তম আদর্শের সাগ্নেয় পুরুষ,—এক মহাক্ষত্রিয়। আজ আমাদের জাতীয় সংকটের দিনে এই মহাক্ষত্রিয়ের প্রমূর্তিকে ভারতীয় সামরিক বাহিনী ও বৃহত্তর জনশক্তির সামনে তুলে ধরা এক অপরিহার্য জাতীয় কর্তব্য।

কেউ কেউ এই সংশয় প্রকাশ করে থাকেন যে, ভারতীয় বাহিনী বার্মা ফ্রন্টে নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিরোধিতা করেছিল, আজ যদি সেই নেতা এবং তাঁর সামরিক বাহিনীর ঐতিহ্য তাদের সামনে তুলে ধরা হয় তা' হলে আমাদের সামরিক বাহিনীর মনোবল ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে। এরূপ সংশয় অনৈতিহাসিক ও তথ্য-হীন। এ কথা আজ বিস্মৃত হওয়া সঙ্গত নয় যে, নেতাজীর

ঐতিহ্যই যুদ্ধশেষে ভারতীয় নৌবাহিনীতে বিদ্রোহের মনোভাব সৃষ্টি করেছিল এবং ভারতীয় সামরিক বাহিনীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা। লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিচারকালে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে যে জাতীয় উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং যার ফলে বৃটিশ আনুগত্যের মূল ভিত্তি ধ্বংসে যায় তার পরিণামেই বৃটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিপ্লবও এই সাক্ষ্য দেয় যে, এক একটি দেশের মৌলিক তাৎপর্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশের সামরিক বাহিনীর মানসিকতার রূপান্তর ঘটে। যে জার বাহিনী এক সময় রুশ বিপ্লবের বিরোধিতা করেছিল সেই বাহিনীই তাই পুনর্গঠিত লাল ফৌজের মধ্যে নতুন আদর্শ ও প্রেরণার সন্ধান লাভ করেছে। কামালের বিদ্রোহী ফৌজ এবং সুলতানের স্থায়ী বাহিনীর সমন্বয়ে যে নব্য তুর্কীর সামরিক সংগঠন গড়ে ওঠে তার মধ্যেও তুর্কীর নব্য জাতীয়তার প্রেরণা সঞ্চারে কোন অসঙ্গতিই সৃষ্টি হয়নি। ভারতের প্রাক্তন সমর-অধিনায়ক জেনারেল চৌধুরী যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে মানসিক রূপান্তরের এই তাৎপর্যটিকে স্পষ্ট করার জন্যই ভারতীয় সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই এ কথা ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় বাহিনী আজ আর অতীত দিনের বিগত ঐতিহ্যের মুখাপেক্ষী নয়, ভারতীয় বাহিনী এখন নতুন সুযোগ নতুন মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ এক 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি।' তাই, ভারতের এই জাতীয় বাহিনী ভারতের জাতীয় সংগ্রামের মহাক্ষত্রিয়ের ঐতিহ্যকে পরম প্রেরণার উৎসরূপে যে গ্রহণ করবে সে বিশ্বাসে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই।

আজ ভারত এমন এক জাতীয় সংকটের সম্মুখীন যে এই সংকট উত্তরণে যে সমস্ত ভারতীয় নেতার আদর্শ ও ঐতিহ্য ভারতীয় বাহিনী ও ভারতীয় জনতাকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারে তার মধ্যে মহা-

ক্ষত্রিয় সুভাষচন্দ্রের অবদান হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতের প্রাণকেন্দ্রে মহাক্ষত্রিয় সুভাষচন্দ্রের ঐতিহ্যকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা আজ তাই এক অপরিহার্য জাতীয় কর্তব্য।

—আনন্দবাজার

নেতাজীর সামরিক ঐতিহ্য

নেতাজীর অপূর্ব বৈপ্লবিক ঐতিহ্য যে তাঁর দূরদর্শী ও নির্ভীক রাজনৈতিক মনীষা এবং অমিত-বীর্য সামরিক প্রতিভার যৌগিক সৃষ্টি লেখককে একথা সর্বপ্রথম স্মরণ করিয়ে দেন, এক জন বিদেশী সামরিক বিশেষজ্ঞ, জেনারেল কাওয়াবে। টোকিয়োতে এক সাক্ষাৎ-কারের সময় বার্মা-ফ্রন্টে এককালের দূর্ধর্ষ জাপ জেনারেল নেতাজীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা অর্পণ করে বলেন, "চন্দর বোস ছিলেন একজন অসীম উচ্চমানের সামরিক সংগঠক, অধিনায়ক এবং স্ট্র্যাটেজিসিয়ান।" তিনি অকপট আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, "ইম্ফল অভিযানকালে যদি চন্দর বোসের স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করা হতো, তা' হলে আজ ভারত ও পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ-ইতিহাস হয়তো নতুন ভূমিকায় লেখা হতো। চন্দর বোস গোটা ইম্ফলকে চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ না করে কোহিমা-ইম্ফলের পথটি খোলা রাখার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। চন্দর বোসের বিশ্বাস ছিল যে, সেই একটিমাত্র খোলাপথে বৃটিশ-বাহিনী পশ্চাদপসরণ করবে এবং আসামে আর কোথাও প্রতিরোধ ব্যূহ তৈরী করা বৃটিশবাহিনীর পক্ষে সম্ভব হবে না।"

নেতাজীর ভারত-মুক্তি অভিযান পরিকল্পনার উল্লেখ করে খেদ-মিশ্রিত কণ্ঠে জেঃ কাওয়াবে বলেন, "কিন্তু ইম্ফল ফ্রন্টের অধিনায়ক লেঃ জেনারেল মুতাগুচি চন্দর বোসের স্ট্র্যাটিজী গ্রহণ করতে রাজী

না হয়ে ইম্ফলকে চারিদিক থেকে অবরোধ করার নির্দেশ দেন। ইম্ফলে আবদ্ধ বিরাট সংখ্যক বৃটিশ বাহিনীকে রক্ষার জন্য বৃটিশ শক্তি মরিয়া হয়ে বিমান সরবরাহের হুকুম দেয়। এই সময়ে বিমানের সংখ্যাল্পতা হেতু বৃটিশ বিমান সরবরাহ ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করা জাপ বিমানবাহিনীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তার ফলে এবং সেবারে অনেক আগেই বর্ষা নেমে যাওয়ায় ছয় মাস ধরে ইম্ফল অবরোধ করেও এবং আই-এন-এ ও জাপবাহিনীর 'গ্যালেন্ট ফাইট' সত্ত্বেও জাপবাহিনীকে পশ্চাতে হটে আসতে হয় এবং তারই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র বার্মা ফ্রন্টে বিপর্যয় ঘটে।"

জেনারেল কাওয়াবে এবং তাঁর সঙ্গে উপস্থিত আরও কয়েকজন প্রাক্তন জাপ-জেনারেল নেতাজীর রাজনৈতিক ও সামরিক মনীষা এবং নেতৃত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। জেনারেল কাওয়াবে একথাও জানান যে তিনি নেতাজী সম্বন্ধে তাঁর 'ইমপ্রেশন' একটি পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তাঁর বইটির কয়েকটি কপি শাহনওয়াজ কমিটিকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আজও একজন বিদেশী-লিখিত নেতাজীর কাহিনী ইংরেজী বা অন্য কোন ভারতীয় ভাষায় তর্জমা হয়নি।

প্রতিরক্ষার নীতি

নেতাজীর সামরিক প্রতিভার ঐতিহ্য শুধু যুদ্ধকালীন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সীমাবদ্ধ নয়, যুদ্ধোত্তর স্বাধীন ভারতের প্রতিরক্ষার নীতি নির্ধারণেও তাঁর সামরিক দূরদৃষ্টি স্বাক্ষরিত রয়েছে। প্রায় বিশ বছর আগে, ১৯৪৪ টোকিও ভাষণে তিনি ভাবী স্বাধীন ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তুতি এবং সামরিক উৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত করে বৃহৎ শিল্পায়নের সূচীকে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার প্রতি জোর দিয়ে জাতীয় প্রতিরক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ ভারতকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন,

"The moment India is free, the most important problem will be organising our national defence in order to safeguard our freedom in the future. For that we shall have to build up modern war industries, so that we may produce the arms that we shall need for self-defence. This will mean a very big programme of industrialisation."
চীনা আক্রমণে লাঞ্ছিত ভারতের কাছে আজ নেতাজীর এই সতর্ক-বাণী যেন এক দৈববাণীর মত মনে হয়।

নেতৃত্বে যুগ্ম ধারা

নেতাজীর বৈপ্লবিক ঐতিহ্য শুধু রাজনীতির সৃষ্টি নয়,—রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যক্রমের যুগ্ম অভিব্যক্তিরূপে গড়ে উঠেছে নেতাজীর স্বাধীনতা সংগ্রামের নীতি ও পদ্ধতি।

গণবিপ্লব এবং সামরিক প্রয়াস,—এই দুই প্রচেষ্টার যুক্ত কার্যক্রমেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হবে—নেতাজীর বৈপ্লবিক পরিকল্পনার এটাই ছিল্ মূল পদ্ধতি ও লক্ষ্য। তাই বার্মায় এসে যেদিনে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন, সেদিনে গভীর প্রত্যয়ে তিনি ঘোষণা করেন,

"Today is the proudest day of my life,—India's Army of Liberation has come into being."

যুদ্ধোত্তর বিপ্লব

নেতাজীর সামরিক প্রতিভা কী অদ্ভুত তীক্ষ্ম এবং অখণ্ড আত্মত্যাগের কী নির্ভীক প্রতিমূর্তি তিনি,—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে শুধুমাত্র আন্তর্জাতীয় সামরিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণের উপরে নির্ভর করে এবং বিদেশী সাহায্য সম্বন্ধে কোনরূপ প্রাক্-সংযোগ বা পূর্ব প্রতিশ্রুতির জন্য অপেক্ষা না করেই যেভাবে তিনি অজানার পর্বে ঝাঁপিয়ে পড়েন, সেই ঘটনার মধ্যে অভূতপূর্ব তাৎপর্য পরিস্ফুট রয়েছে। শুধু ঝাঁপিয়ে পড়া নয়, যুদ্ধ পরিস্থিতির অভাবনীয়

পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অদ্ভুত মানসিক স্থৈর্য ও দক্ষতার সঙ্গে নিজের কর্মপন্থারও পরিবর্তন করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাঁর সামরিক স্ট্র্যাটিজী-কেন্দ্রিক বৈপ্লবিক পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই যে, যদি অক্ষশক্তি জয়লাভ করে, তবে যুদ্ধশেষে অক্ষশক্তি ব্যালেন্স অব পাওয়ারের সুযোগ নিয়ে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সুনিশ্চয় করতে পারবেন। পক্ষান্তরে যদি মিত্রশক্তি জয়লাভ করে তা' হলেও তিনি যদি একটি ভারতীয় মুক্তিফৌজ গড়ে তুলতে পারেন এবং এই মুক্তিফৌজ যদি জাতীয় সংগ্রামের ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারে, তা' হলে বৃটিশ ভারতীয়বাহিনীর আনুগত্য পরিবর্তিত হয়ে ভারতের অভ্যন্তরে যুদ্ধোত্তর বিপ্লবের অনিবার্য ভূমিকা সৃষ্টি হবে,—এই ছিল নেতাজীর বিশ্বাস। ভারতের সত্যাগ্রহ সংগ্রামের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে নেতাজী উপলব্ধি করেছিলেন যে, যেখানে একুশ, ত্রিশ ও বত্রিশ সালের বিরাট ও ব্যাপক গণ-সত্যাগ্রহ ভারতীয় সামরিকবাহিনীকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়নি, সেখানে সামরিক বৈপ্লবিক প্রয়াস ছাড়া বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর মনে ১৮৫৭ সালের বৃটিশ শাসনবিরোধী মনস্তত্ত্ব গড়ে তোলা সম্ভব হবে না এবং বৃটিশ ভারতীয় ফৌজকে জাতীয়তাবাদী করে তোলা সম্ভব না হলে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করাও সক্ষম হবে না।

সামরিক মনীষা ও অধিনায়করূপে নেতাজীর স্থান অতি উচ্চ-মানের। আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ গঠন, এই ফৌজের মধ্যে প্রবল সংগ্রামী ঐতিহ্য সৃষ্টি, এই বাহিনীর পরিচালনা, সামরিক-বৈপ্লবিক সংগ্রামে নেতাজীর অদ্ভুত স্ট্র্যাটিজী জ্ঞান, 'জয়-হিন্দ', 'চলো দিল্লী' ইত্যাদি ধ্বনির ন্যায় বিদ্যুৎস্পর্শী 'ব্যাটল-ক্রাই' বা সমর-বাণীর উদ্ভাবন, সংগ্রামের নীতি ও লক্ষ্য সম্বন্ধে ফৌজের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রেরণা ও ধারণা সৃষ্টি, আক্রমণ ও পশ্চাদপসরণে আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের মনোবল ও শৃঙ্খলারক্ষা, স্বাধীনতার বৈপ্লবিক যুদ্ধ পরিচালনায় তাঁর 'অর্ডার অব দি ডে' বা 'সমর অনুজ্ঞা'র অনুলিপি,—এমনি

বিভিন্ন সামরিক মনীষা, প্রতিভা, নেতৃত্ব ও ঐতিহ্যের নিদর্শন, যা সমর-অধিনায়করূপে নেতাজী রচনা করেছেন, তার তুলনা অনায়াসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সমর-নায়কদের কৃতিত্বের সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব। নেতাজীর সামরিক প্রতিভার ঐতিহ্য পৃথিবীর যে কোন জাতির সামরিক ইতিহাসে শুধু স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়ার যোগ্য নয়,—এই ঐতিহ্যকে প্রতি জাতি সাগ্রহে তুলে ধরবে তার সামরিক সংগঠন ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য।

আজাদ-হিন্দের ঐতিহ্য

কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে? স্বাধীন ভারতের প্রতিরক্ষা শক্তির সামনে এই যুগের ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান সামরিক প্রতিভা, সামরিক অধিনায়ক, তথা আজাদ-হিন্দের সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের ঐতিহ্যকে তুলে ধরার সামান্যতম চেষ্টাও কি হয়েছে? পর্দান্তরালের একটি অস্ফুট উক্তি শোনা যায় যে, নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের বিরুদ্ধে সেদিনে ভারতীয় বাহিনী লড়াই করেছে, তাদের সামনে প্রতিপক্ষের ঐতিহ্য তুলে ধরা হলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর মনোবল ক্ষুণ্ণ হবে। এরূপ যুক্তি আসল উদ্দেশ্যের এক বিকৃত অজুহাত মাত্র এবং সম্পূর্ণরূপে অতাথ্যিক ও অনৈতিহাসিক। নেতাজী ও আজাদ-হিন্দের প্রেরণার ফলে ১৯৪৫-১৬ সালে ভারতে নৌ-বিদ্রোহ ও ভারতীয় স্থল ও বিমান বাহিনীর ধর্মঘট হয়েছিল এবং লাল-কেল্লার বিচারে আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের নায়কেরা মুক্তি লাভ করে তৎকালীন বৃটিশ ভারতীয় ফৌজের আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ ও চাপের ফলে। রুশ বিপ্লবে ট্রটস্কীর লালফৌজের বিরুদ্ধে যে জার বাহিনী লড়াই করে সেই সেনাই আবার লালফৌজের ঐতিহ্য অনুসরণ করে এবং বিদ্রোহী কামালের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও সুলতানের সেনারাই পরবর্তীকালে নব্য. তুর্কীর সেনাবাহিনী গড়ে তোলে। তাই নেতাজীর সামরিক ঐতিহ্য ভারতীয় বাহিনীর কাছে গর্বের বস্তু হবে না, একথা অকল্পনীয়। জেনারেল কারিয়াপ্পা নেতাজী ও আজাদ-

হিন্দের বিরুদ্ধে বৃটিশ কমাণ্ডাররূপে লড়াই করেছিলেন। চীনা আক্রমণের সময়ে তিনি প্রতি সুযোগে ভারতীয় প্রতিরক্ষার প্রেরণারূপে নেতাজীর সামরিক ঐতিহ্যকে শুধু সাগ্রহে ও সগৌরবে জাতির সামনে তুলে ধরেননি, নেতাজীর 'ব্যাটল-ক্রাই'গুলিকে পর্যন্ত পুনরায় কার্যকরী করার চেষ্টা করেছেন। আরেকদিক দিয়েও তিনি নেতাজীর ঐতিহ্য কার্যকরী করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করে বলেন যে—গেরিলা বাহিনীরূপে গঠিত চীনা বাহিনীর প্রতিরোধে ভারতীয় হিমালয়ান গেরিলাবাহিনী গঠন করার কাজে গেরিলা সংগ্রামে সুদক্ষ আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীর প্রাক্তন সেনানী ও ঐতিহ্যকে কার্যকরী করা উচিত।

আজ ভারতীয় বাহিনীকে প্রস্তুতি ও রণ-কৌশলের দক্ষতার সঙ্গে অনিবার্যভাবে জাতীয় প্রেরণা ও দেশ-প্রেমের ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত করে তোলার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় প্রতিরক্ষী বাহিনীর মনে এরূপ প্রেরণা সঞ্চারে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সামরিক ঐতিহ্য এক পরম আকর্ষণীয় জীবন্ত প্রতীক স্বরূপ।

চীনা চ্যালেঞ্জের প্রত্যুত্তরদানে এবং দীর্ঘদিন এই সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার জন্য আজ ভারতীয় প্রতিরক্ষার প্রস্তুতিতে নেতাজীর দেশরক্ষার নীতি এবং সামরিক ঐতিহ্যকে গ্রহণ ও প্রয়োগ করা এক অপরিহার্য জাতীয় কর্তব্য। সম-সাময়িক রাজনীতিকদের অহম্পূর্তিকার মনোভাব এতকাল নেতাজীর ঐতিহ্যকে পশ্চাতে সরিয়ে রেখেছে,—লাল চীনাদের চ্যালেঞ্জের সম্মুখে নেতাজীর দূরদর্শী ভারতীয় সমাজবাদের আদর্শ এবং শৌর্যময় সামরিক ঐতিহ্যে সমগ্র জাতি ও প্রতিরক্ষা-বাহিনীকে যদি উদ্বুদ্ধ করার কাজে প্রয়োগ করা না হয় তা' হলে আমাদের জাতীয় অপরাধের সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

—যুগান্তর

ভারতে বিপ্লববাদ ও নেতাজী

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লববাদের কোন আবেদন আছে কি ? এই প্রশ্নটির উত্তর সন্ধানে বলা যায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লববাদের যদি কোন স্থান না থাকে তবে নেতাজী ও আজাদ-হিন্দেরও কোন স্থান নেই এই ইতিহাসে।

বিপ্লববাদের ঐতিহ্য

গান্ধী-নেতৃত্বের আবির্ভাব এবং অসহযোগ আইন অমান্যের কর্মপন্থার আগে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লববাদের ভূমিকাই ছিল অগ্রণী। সাতান্নের অভ্যুত্থানের ন্যায়, বিপ্লববাদী প্রয়াসের মাধ্যমে, ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার উদ্দেশ্যেই ভারতে বিপ্লববাদী সংগঠন গড়ে ওঠে। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের পরে বিপ্লববাদী প্রয়াস যে সন্ত্রাসবাদী কার্যধারার মাধ্যমে প্রকাশ পায় তার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বুকে বিপ্লবের মানসিকতা তৈরী করা, কিন্তু অন্তিম লক্ষ্য ছিল সামরিক অভ্যুত্থান। এই লক্ষ্যসাধনের যথার্থ প্রয়াস কার্যকরী হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টায়। একুশ সালের পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মধ্যস্থতায় বাংলার বিপ্লবীরা অসহযোগ আইন অমান্যের কার্যাবলীকে গ্রহণ করে, কিন্তু বিপ্লববাদী গুপ্ত সংগঠন এবং বিপ্লববাদের অন্তিম লক্ষ্য বিপ্লববাদীদের ক্ষেত্রে অপরিত্যক্ত থাকে।

সুভাষ-মানসে বিপ্লববাদের প্রভাব

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন সুভাষচন্দ্রের মানসিকতাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। ছাত্রাবস্থায় বিলাতে থাকার সময় সুভাষচন্দ্র পৃথিবীর বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস তন্ন তন্ন করে পাঠ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ক্ষমতা দখল করার অন্তিম কার্যক্রম ছাড়া স্বাধীনতালাভের আর কোন বাস্তব পন্থা নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সুভাষচন্দ্র বিলাত থেকে ফিরে এসে গান্ধীজীর কাছ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য ও পদ্ধতি জানতে চান। ভারতীয় সংগ্রাম বইটিতে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, "বিলাতে থাকাকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী নেতাদের সংগ্রামপদ্ধতি ও কর্ম-কৌশল সম্বন্ধে আমি কিছু পড়াশুনা করেছিলাম এবং সেই পড়াশুনা-অর্জিত তথ্যের উপরে ভিত্তি করে গান্ধীজীর পরিকল্পনা কিভাবে ধাপে ধাপে বিদেশী সরকারের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হবে তার বিভিন্ন পর্যায়ের একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা আমি জানতে চেয়েছিলাম।" এই সাক্ষাতকারেই গান্ধীপন্থার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মৌলিক পার্থক্য ঘটে।

জাতীয় সংগ্রামের পৃথক্ দৃষ্টিভঙ্গী

গান্ধীজীর সংগ্রামনীতির মূল পদ্ধতি ও লক্ষ্য ছিল অসহযোগ, আইন অমান্য ও বয়কটের পথে চাপ দিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নৈতিক প্রভাবসৃষ্টি করে বৃটিশ সরকারের 'হৃদয় পরিবর্তন' করা এবং অন্তিম পর্যায়ে 'বোঝাপড়ার পথে' রাষ্ট্র-ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে 'হস্তান্তরিত' করা। রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করার পথে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব,—এই নীতির উপরে সুভাষচন্দ্র আস্থা স্থাপন করতে পারেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন 'ক্ষমতা দখল' করার লক্ষ্য ও কর্মপন্থা ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। 'ক্ষমতা হস্তান্তর' বনাম 'ক্ষমতা দখল'—স্বাধীনতা সংগ্রামের এই নীতিগত পার্থক্যই পরবর্তীকালের গান্ধী-সুভাষের রাজনৈতিক পার্থক্যর মূল কারণ।

অহিংস ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করে গান্ধীজী সারা বিশ্বে এক নূতন নৈতিক মূল্য, এক নূতন শান্তিবাদী ঐতিহ্য রচনা করতে চেয়েছেন। 'ক্ষমতা দখল করা' গান্ধীপন্থার অন্তিম লক্ষ্য ছিল না বলে গান্ধীজী অসহযোগ আইন অমান্যের কোন পর্যায়েই ভারতীয় পুলিশ বা সেনাবাহিনীকে আইনভঙ্গের কার্যক্রমে যোগদানের আহ্বান জানাননি বা আইন অমান্য আন্দোলনের সামনে 'প্রতি সরকার' গঠনের কর্মসূচী তুলে ধরতে রাজী হননি। এই কারণে বিয়াল্লিশ সালের ক্ষমতা দখল ও প্রতি সরকার গঠনের গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব অস্বীকার করে আগস্ট বিপ্লবকে গান্ধীজী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম বলে অভিহিত করেছেন।

নেতাজীর বিপ্লববাদী প্রয়াস

সুভাষচন্দ্র বিপ্লববাদে বিশ্বাসী। তাই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সুরু থেকেই তিনি বাংলার বিপ্লবী দলগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। বাংলার বিপ্লবী দলগুলি সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে সকল রকম সহায়তা পরামর্শ লাভ করেছে। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বৈপ্লবিক প্রয়াস থেকে আরম্ভ করে দীনেশ-বিনয়-বাদলের কার্যধারার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সংযোগের ইতিহাস বাংলার বিপ্লবীদের কাছে অজানা নয়। উপযোগী পরিবেশে সার্থক রূপায়ণের আশায় সুভাষচন্দ্র বিপ্লববাদের অগ্নিশিখাকে উদ্দীপিত রাখবার উদ্দেশ্যেই বাংলার বিপ্লববাদীদের সাময়িক সন্ত্রাসবাদী কর্মসূচীকেও সর্বভাবে সাহায্য দিয়েছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম পর্যায়ে ক্ষমতা দখলের কর্মপন্থা অনিবার্য হয়ে দেখা দেবে—এই বিশ্বাসে সুভাষচন্দ্র ভারতের বিপ্লববাদী ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়াসী হয়েছেন।

বিপ্লববাদের অন্তিম পর্যায়,—আজাদ হিন্দ্

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম অবস্থায় বৃটিশ সরকার যখন সেনাবলে ক্ষুণ্ণ, অধিকাংশ বৃটিশ ভারতীয় সেনা বিদেশে স্থানান্তরিত, সামরিক আয়োজনে যখন বৃটিশ সরকার অপ্রস্তুত এবং পরাজয়ের পর পরাজয় বরণের ফলে বৃটিশ সরকারের মনোবল যে সময়ে হতমান,—নেতাজী চেয়েছিলেন বিশ্বযুদ্ধের সেই সুবর্ণসুযোগে বৃটিশ সরকারকে আঘাত করতে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কর্মপদ্ধতি কংগ্রেসের গান্ধীপন্থী নেতৃবর্গ গ্রহণ করতে রাজী হননি। জাতীয় নেতৃত্বের দোদুল্যমান কিংকর্তব্য-বিমূঢ়তা সুভাষচন্দ্রকে সেদিন কিভাবে ব্যাকুল করে তুলেছিল 'ওয়েক আপ ইণ্ডিয়া' নামের প্রবন্ধটিতে তার অপূর্ব স্বাক্ষর রয়েছে। সংগ্রামী অস্থিরতায় জাতীয় জীবনের স্থবিরতার দিকে চেয়ে চেয়ে সুভাষ লিখেছেন, "মাসের পর মাস বয়ে চলেছে, কিন্তু আমাদের নেতৃবর্গ কথার পর কথা বলে চলেছেন, তর্কের পর তর্ক তুলছেন। কার্যকরী কিছুই করা হল না। একদিন সূর্যোদয়ে দেখা গেল ডেনমার্ক অধিকৃত, নরওয়ে আক্রান্ত, হল্যাণ্ডও আক্রান্ত হচ্ছে। আরও কি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটবে কে বলতে পারে! লোকেরা ওলন্দাজ পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জাপানী আক্রমণের আসন্নতার কথা বলাবলি করছে। ইটালীর সৈন্যদের সাজসাজ রব। লণ্ডনের মন্ত্রিসভা টলটলায়মান। কিন্তু ভারতবর্ষ কি করছে? এই রাজনৈতিক মরিচা থেকে কি করে ভারতবর্ষকে রক্ষা করা যায়? কি করে এই আন্তর্জাতীয় সুযোগ ভারতের জাতীয় প্রয়োজনে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়োজনে সদ্ব্যবহার করা যায়? একের পর একটি করে দিন চলে যাচ্ছে আর এক অসহায় অসহ্য যন্ত্রণায় নিজের আঙ্গুল যেন নিজেই দংশন করতে ইচ্ছে করছে। এই অন্তিম ক্ষণেও কি ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য কিছুই করা যায় না? সমগ্র ইউরোপ গলে যাবার মুখে। পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মুক্তির দাবীর সামনে কার শক্তি আছে বিরোধিতা

করার মত! স্বাধীনতা প্রায় হাতের মুঠায়।...এখনই একে কেড়ে নিতে হবে।"

বিস্মিত, বিক্ষুব্ধ, অসহায় সুভাষ অগ্নিহোত্রীর দুর্জয় ঔদ্ধত্যে অজানার অন্ধকারে ঝাঁপ দিলেন ভারতের স্বাধীনতা কেড়ে আনার অনন্য ব্রতে। আজাদ-হিন্দ্ সুভাষচন্দ্রের এই অগ্নিব্রতী বিপ্লববাদের সার্থক রূপায়ণ।

আন্তঃভারতীয় যুদ্ধোত্তর বিপ্লবের সংকেত

নেতাজী কেন বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আজাদ-হিন্দ্ গঠন করেছিলেন নিজেই তার কারণ বর্ণনা করে বলেছেন, "ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক প্রচেষ্টা ভারতীয় জনতাকে উন্মত্ত করে তুলবে, তাদের রক্তকণাকে ক্ষিপ্ত করে দেবে। আমি যদি আজাদ-হিন্দের প্রচেষ্টায় শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে মরেও যাই তবুও ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের অন্তিম সাফল্যের জন্য এরূপ প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন।" যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ওয়াভেল প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারত-ভাগের নীতি স্বীকার করে ভারতীয় নেতৃবর্গ যখন আপস-আলোচনায় অগ্রসর 'হন নেতাজী তখন ভারত-ভাগের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে অধীর বিক্ষোভে রেঙ্গুন থেকে বেতার ভাষণে জানান: "কেউ যদি মনে করে থাকেন আজাদ-হিন্দ্ ব্যর্থ হয়েছে তবে সেকথা ভুল। দুনিয়াতে আজ এমন শক্তি নাই যা ভারতবর্ষকে আজ আন্তর্জাতিক সমস্যার ভিত্তিতে দাম না দিয়ে পারে।...আমরা যদি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সদ্ব্যবহার করতে পারি, তবে যুদ্ধশেষে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করবই। যদি কোন চরম দুর্ভাগ্য ঘটে, যুদ্ধশেষে ভারত স্বাধীন না হয় তবে যুদ্ধশেষে ভারতের অভ্যন্তরে আন্তঃভারতীয় যুদ্ধোত্তর বিপ্লব অনিবার্য।"

আপাততঃ পরাজিত হয়েও আজাদ-হিন্দ্ কিভাবে বিপ্লববাদের আদর্শকে জয়ী করে তুলেছিল ১৮৪৫-৪৬ সালের নভেম্বর, ডিসেম্বর,

জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত বোম্বে ও করাচীর নৌ-সেনা বিদ্রোহ, দিল্লী, দমদম, জবলপুরে বিমানবাহিনীর ধর্মঘট, স্থলবাহিনীর বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রকাশ এবং ছাত্র ও শ্রমিকদের প্রচণ্ড আন্দোলন তার রক্তক্ষরা স্বাক্ষর। যুদ্ধোত্তর বিপ্লবের সমস্ত লক্ষণ এই সময়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আঠারো শ' সাতান্নের বিপ্লবে ভারতীয় বৃটিশ বাহিনীর মধ্যে যেভাবে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল, আজাদ-হিন্দের ঐতিহ্যে আবার ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতের সামরিক অভ্যুত্থান তেমনি প্রত্যাসন্ন হয়ে উঠেছিল। এই বিপ্লব সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেই 'ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' বিতর্কে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী এটলী বলেছেন, "আমরা সে সময়ে আগ্নেয়গিরির মুখে বসে রয়েছিলাম।" কিন্তু এই যুদ্ধোত্তর বিপ্লবের ঐতিহাসিক সম্ভাবনাকে হিংসা ও অরাজকতার নামে ব্যর্থ করে দেওয়া হয় এবং এই ব্যর্থতার গর্ভে সরকারী কারসাজীতে জন্মলাভ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তার পরিণতি ভারত ব্যবচ্ছেদ।

স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর অবদান

গান্ধীজীকে নেতাজীই জাতির জনক নামে সর্বপ্রথম সম্ভাষিত এবং তাঁর নেতৃত্ব ও সত্যাগ্রহ পন্থাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অপূর্ব অবদানরূপে বর্ণনা করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস গান্ধী-নেতৃত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কিন্তু এই ইতিহাসে বিপ্লববাদ, তথা আজাদ-হিন্দ্ ও নেতাজীর অপূর্ব অবদানও অনস্বীকার্য। সত্যাগ্রহ পন্থা ও বিপ্লববাদ এবং মহাত্মাজী ও নেতাজীর যুগ্ম অবদানকে বিচ্ছিন্ন করে কোন সত্যদর্শীর পক্ষেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। গঙ্গা-যমুনার বারিসংগমের ন্যায় গান্ধী-সুভাষের নেতৃত্ব ও আদর্শের সম্মিলিত অবদানেই সম্ভব হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা,—এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য ঐতিহাসিক তথ্যের নিরপেক্ষ ফলশ্রুতি বলেই ভবিষ্যৎ ভারত গ্রহণ করবে।

—যুগান্তর

সাতান্নের বিপ্লব ও আজাদ হিন্দ্

আজাদ হিন্দ্ বিপ্লব সাতান্নের জাতীয় বিপ্লবের উত্তর-সাধনারই পূর্ণ পরিণতি। যে বিপ্লব বহ্নিমান হয়ে উঠেছিল ১৮৫৭ সালের ১৪ই মে, তারই সুপ্ত প্রবাহ আবার অগ্নিশিখায় দীপ্তিমান্ হয়ে ওঠে ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর,—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ বিপ্লবের বীর্যময় অভিযানে। 'আজাদ হিন্দ্'ই সাতান্নের ঐতিহ্যকে নয়া-স্মরণের সংগ্রামী-বরণে বৈপ্লবিক পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে। আজাদ হিন্দ্ সরকার সাতান্নের বিপ্লবের নামে শপথ নিয়েছে, সেনা-বাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করেছে সাতান্নের ঐতিহ্যে, ঝাঁন্সীর রাণীকে আজাদ হিন্দ্ নারীবাহিনীর সংগঠনে আবার দীপ্তিময়ী করে তুলেছে, এবং রেঙ্গুনের জঙ্গলাকীর্ণ কবরভূমি থেকে জাগিয়ে তুলেছে বিস্মৃতপ্রায় বাহাদুর শাহের সংগ্রামী ইতিহাসকে। আজাদ হিন্দ্ সার্থক করে তুলেছে সাতান্নের বিপ্লবী শপথকে।

আজাদ হিন্দ্ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। সাতান্নের যে ঐতিহ্য ভারতের বিভিন্ন বিপ্লববাদী প্রয়াসের মাধ্যমে অবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলে আজাদ হিন্দ্ তারই পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে আজ উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে রচনা করার প্রয়াস চল্‌ছে। উদ্দেশ্য ইতিহাসের বাহন নয়, ইতিহাসের বাহন তথ্য ও ঘটনা। উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দর্শন লেখা চলে, কিন্তু যথার্থ

ইতিহাস রচনার জন্য চাই তথ্য ও ঘটনার স্বীকৃতি। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে গেল ইতিহাসকে স্মরণ করে নয়, বরং এক পরিকল্পিত উদ্দেশ্যকে অনুসরণ করে। তাই ভারত সরকার কর্তৃক পরিবেশিত স্বাধীনতা সংগ্রামের চলচ্চিত্রে বা ইতিহাসে অথবা ভাষণাদিতে ভারতীয় বিপ্লববাদ ও আজাদ হিন্দের অবদানের কথা একবারও উল্লেখ করা হয়নি।

সাতান্নের সুপ্ত আগুন নূতন শিখায় আবার অনলবর্ষী হয়ে ওঠে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে। এই আন্দোলনের উৎসেই জন্মলাভ করে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের দুটি সংগ্রামী ধারা। একটি ধারার আহ্বান শোনা যায় অসহযোগ, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী এবং ধর্মঘট ও হরতালের। আর দ্বিতীয় ধারাটি কখনো ফল্গু স্রোতে কখনও বহ্নি-বিকাশে আত্মপ্রকাশ করে বিপ্লববাদের পথে। এই দ্বিতীয় পথেরই অগ্নিহোত্রী প্রতীক নব ভারতের স্মরণীয় জাতীয় শহীদ ক্ষুদিরাম। প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এই বিপ্লববাদই ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী বাহক। স্বদেশী ও স্বরাজের প্রথম ধারায় যখন,—স্বাধীনতা কেন—স্বায়ত্ত-শাসন কথাটিও উচ্চারিত হয়নি,—প্রথম মহাযুদ্ধে কংগ্রেস ও গান্ধীজী পর্যন্ত যখন ইংরেজের সহযোগী,—সেই সময়ে বিপ্লববাদীরা শুধু পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে রাজদ্রোহ প্রচার করেননি,—বৃটিশ ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে সংগঠিত করে বিপ্লবের উদ্যোগ করেছেন, শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে অস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন, আফগানিস্থানে বিপ্লবী প্রতি-সরকার স্থাপন করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বিপ্লবী আয়োজন ব্যর্থ হলেও সিঙ্গাপুর সাত দিন বিপ্লবী সেনাবাহিনীর করায়ত্তে ছিল। বিপ্লব আয়োজনের এই ইতিহাসকে রক্তক্ষরিত করে রেখেছে অগণিত শহীদের ফাঁসী ও দ্বীপান্তরের উজ্জ্বল কাহিনী এবং বালেশ্বরের বুকে সেই বিপ্লব-যজ্ঞের পুরোহিত যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মাহুতি।

যুদ্ধান্তে গান্ধীজী এগিয়ে এলেন অভিনব কর্মপন্থা নিয়ে। ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে অসহযোগ-আইন অমান্যের যে কর্মসূচী উদ্‌ভাবিত হয়েছিল তাই গান্ধী-নেতৃত্বের অপূর্ব রসায়নে ব্যাপক জাতীয় আবেদনে সংগ্রামী কর্মপন্থার রূপ গ্রহণ করল। গান্ধী-নেতৃত্বের ব্যাপক বিকাশের সামনে বিপ্লববাদী ধারা অপ্রধান হয়ে গেল, কিন্তু বিপ্লববাদী উদ্দেশ্য নির্বাসিত হল না। বিপ্লববাদের দৃষ্টি-ভঙ্গীর সঙ্গে অসহযোগ-আইন-অমান্যের কর্মপন্থার দৃষ্টিভঙ্গীতে ছিল একটি মৌলিক পার্থক্য। অসহযোগ-আইন-অমান্যের কর্মপন্থার বিশ্বাস ছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং বৃটিশ সরকারের হৃদয়-পরিবর্তনের পথে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে স্বাধীনতা অর্জনে। কিন্তু বিপ্লববাদীরা গান্ধী-নেতৃত্বের বিরাট আবেদনকে স্বীকার করেও স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্তিম পর্যায়ে ক্ষমতা দখলের বিপ্লবী কর্মপন্থার অনিবার্যতার কথা অস্বীকার করতে পারেনি। তাই গান্ধী-নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ ও আইন-অমান্যের পূর্ণ সহযোগী হয়েও বিপ্লববাদের ফল্গু-ধারাকে অবিচ্ছিন্ন ও গতিশীল রাখার জন্য এক-একটি বিশিষ্ট বৈপ্লবিক মূল্যের প্রতীকরূপে অগণিত শহীদসহ যতীন দাস, ভগবৎ সিং, আসফাকউল্লা, সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দারের ন্যায় অগণিত শহীদকে বিপ্লববাদের অগ্নিব্রতে পরম নৈবেদ্যরূপে একে একে তুলে দেওয়া হয়েছে। গান্ধীযুগের পরিবেশেও স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই বৈপ্লবিক ক্ষমতা দখলের অন্তিম অপরিহার্যতা সম্বন্ধে যারা বিশ্বাসী ছিলেন তাঁদের প্রেরণার কেন্দ্র ছিলেন বিপ্লববাদী সুভাষচন্দ্র।

একুশের অসহযোগ, ত্রিশের আইন অমান্য, বত্রিশের খাজনা বন্ধ এবং চল্লিশ সালের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন,—শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর পন্থার কয়েকটি অপূর্ব অধ্যায়। কিন্তু বিয়াল্লিশের আগস্ট সংগ্রাম গান্ধী-সুভাষ তথা ক্ষমতা হস্তান্তর ও ক্ষমতা দখলের যৌথ সংগ্রামের প্রতীক। তাই আগস্ট সংগ্রাম সুরু হয়েছে গান্ধীজীর আহ্বানে কিন্তু সংগ্রাম রূপায়িত হয়েছে সুভাষ-

নির্দিষ্ট ক্ষমতা দখলের কর্মপন্থায়। কোর্ট, কাছারী, থানা ও সরকারী ভবন দখলের প্রয়াস এবং সিতারা, বালিয়া ও মেদিনীপুরের প্রতি-সরকার তার তাত্ত্বিক স্বাক্ষর।

ক্ষমতা দখলের যে বিপ্লববাদী প্রয়াস ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ছিল অপ্রধান তাই আবার প্রধান হয়ে উঠল বিয়াল্লিশের পরে। আজাদ হিন্দ্ বিপ্লবের মাধ্যমে সেই প্রচেষ্টা আবার পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ করল। ক্ষমতা হস্তান্তরের নীতিসঙ্গত নয় বলে একুশ, ত্রিশ, বত্রিশ বা চল্লিশ সালের আইন অমান্যে জাতীয় আন্দোলনে সেনাবাহিনী বা পুলিশকে যোগ দেবার আহ্বান জানান হয়নি। কিন্তু আজাদ হিন্দের প্রধান ভিত্তি হল সামরিক বাহিনী। খিলাফতের পরে ভারতে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সংগ্রাম আর পরিচালিত হয়নি। কিন্তু আজাদ হিন্দের বৈপ্লবিক ভিত্তি হল সর্ব-সম্প্রদায়ের সংগ্রামী ঐক্য। সাতান্নর বিপ্লবের পরে আজাদ হিন্দের মাধ্যমেই গড়ে উঠল বৃটিশ রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় প্রতি-সরকার। আজাদ হিন্দ্-বিপ্লব তাই একদিকে যেমন সাতান্নের সিপাহী বিপ্লবের পূর্ণাঙ্গ পুনঃপ্রকাশ, তেমনি ক্ষমতা দখলের বিপ্লববাদী কর্ম-ধারার অন্তিম পরিণতি। ১৯৪৫-৪৬ সালের ভারতীয় স্থল-জল-বায়ু বাহিনীর বিদ্রোহ আজাদ হিন্দেরই অনুরণন। কিন্তু আজাদ হিন্দের ক্ষমতা দখলের বৈপ্লবিক কর্মপন্থার আসন্ন সার্থকতার সম্ভাবনা আপসপন্থী ক্ষমতা হস্তান্তর নীতির কাছে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গেল। জন্ম হল দ্বি-খণ্ডিত ভারতে দ্বি-খণ্ডিত জাতীয় জীবন। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক ধারার এই হলো যথার্থ গতি-বিশ্লেষণ।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শত-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে ১৯৫৭ সালে,—কিন্তু এই স্মরণোৎসব পালন করা হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি মূল ধারাকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করে। অসহযোগ-আইন অমান্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকেই যদি স্বাধীনতার ইতিহাসের একমাত্র উপাদান রূপে গ্রহণ করা বর্তমান রাষ্ট্রনায়কদের

অভিপ্রায় হয় তা'হলে সাতান্নের রক্তাক্ত বিপ্লবকে স্বীকৃতি দিয়ে শ্রদ্ধা-তর্পণ করা কেন ? সাতান্নের সংগ্রাম যদি স্বীকৃতি-লাভ করে তা'হলে বঙ্গভঙ্গ, বিপ্লববাদ ও আজাদ হিন্দের ইতিহাসও ঐতিহ্য স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক মঞ্চে স্থান পাবে না কেন ?

স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবর্ষের কাহিনীরূপে যে ইতিহাস রচিত হয়েছে এবং যে চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়েছে তারমধ্যে বঙ্গ-ভঙ্গের উল্লেখ নেই,—ক্ষুদিরাম, যতীন্দ্রনাথ, যতীন দাস, ভগবৎ সিং, আসফাকউল্লা, সূর্য সেন এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দার প্রমুখের কোন পরিচিতি নেই। নেতাজী ও আজাদ হিন্দ্‌ও বর্জিত ও অস্বীকৃত। দক্ষিণ-ভারতের কথা বেশী উল্লেখ করা হয়নি বলে প্রতিবাদ উঠেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবার্ষিকী চিত্রটি সংশোধন করার উদ্দেশ্যে এই চিত্রের প্রদর্শন তাই কিছুকালের জন্য বন্ধ রাখাও হয়েছিল। কিন্তু বাংলা দেশ থেকে কোন প্রতিবাদ হয়নি। সাতান্নের সিপাহী বিপ্লবের প্রধান ঘটনাস্থল উত্তরপ্রদেশ। তাই, সশস্ত্র বিপ্লবের কাহিনী হয়েও বোধ হয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তা স্থান পেয়েছে। কিন্তু বিপ্লববাদের প্রাণকেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ এবং আজাদ হিন্দের মূল প্রেরণা বাংলারই এক অগ্নিহোত্রী সন্তান। তাই হয়তো বঙ্গভঙ্গ, বিপ্লববাদ ও আজাদ হিন্দের প্রতি এই চরম উপেক্ষা।

বঙ্গভঙ্গ, বিপ্লববাদ ও আজাদ হিন্দের ঐতিহ্য রক্ষার প্রধান দায়িত্ব বাংলা দেশের। দেশ আশা করেছিল যে বাংলার আইনসভা থেকে বঙ্গভঙ্গ, বিপ্লববাদ ও আজাদ হিন্দের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবর্ষের স্মারকলিপিতে এবং চলচ্চিত্রে যথাযোগ্য স্থান দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে সম্মিলিত দাবী পেশ করা হবে। বাংলাদেশ আশা করেছিল যে বে-সরকারী ঐতিহাসিক মণ্ডলীর কর্তৃত্বে বিপ্লববাদ ও আজাদ হিন্দের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার এবং এই সংগ্রামী ধারার ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণেও সম্মিলিতভাবে বাংলা বিধান সভা অগ্রণী হবে। গঙ্গা-

যমুনার সঙ্গমের মত বিপ্লববাদ ও অসহযোগ আইন অমান্যের দ্বয়ী সংগ্রামী ধারার সম্পূরণেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যথার্থ ইতিহাস রচনা সম্ভব। এই ইতিহাসের একটি ধারাকে অস্বীকার করে স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা কোনমতে বাস্তবধর্মী বা বাঞ্ছনীয়ও নয়।

ইতিহাস জাতির ভাবী জীবন-গঠনের অনির্বাণ দিশারী। জাতীয়-সংগ্রামের ইতিহাসের একটি ধারাকে অস্বীকার করে জাতীয় জীবনের যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী রচনা করা সম্ভব নয়। বিপ্লববাদ ও আজাদ হিন্দের ইতিহাসকে অস্বীকার করা শুধু অগণিত শহীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতার নিদর্শনই নয়,—এরূপ প্রচেষ্টা জাতীয় ইতিহাসের প্রতি এক চরম অবিশ্বস্ততার কাজ। রাজনীতির দলগত সংকীর্ণতার প্রভাবে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসকে যেভাবে একদর্শী করে রচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে তা' শুধু গ্লানিকর নয়,—সমগ্র জাতির পক্ষে লজ্জাকর। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে গান্ধীজী ও অসহযোগ-আইন অমান্যের অবদানকে স্বীকার করে সেই সঙ্গে বিপ্লববাদ ও নেতাজীর আজাদ হিন্দের ভূমিকাকে যথাযোগ্য স্থান দিয়েই তথ্য ও ঘটনা-ভিত্তিক সত্যিকার জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব। গান্ধীজী ও নেতাজী এবং আইন অমান্য ও বিপ্লববাদ,—এই দুই নেতৃত্ব ও দ্বিমুখী কর্মপন্থার যুগ্ম সার্থকতার ফলেই সম্ভব হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা ভারতবাসীর পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে,—যদিও নেতাজীর বিপ্লববাদ আপসপন্থী চক্রান্তে ব্যাহত হওয়ায় ভারতীয় জাতি ও ভারতীয় স্বাধীনতা বিখণ্ডনের অপঘাতে বিকৃত হয়েছে এবং যার ফলে দেখা দিয়েছে আজকের জাতীয় বিড়ম্বনা।

—যুগান্তর

অবিস্মরণীয় আজাদ হিন্দ্

শৌর্য ও সংগ্রামের অপূর্ব ঘটনা শুধু সমসাময়িক ইতিহাসকেই প্রবুদ্ধ করে না, জাতির ভাবী জীবনকেও জীবন্ত জ্যোতিষ্কের মত উদ্দীপিত করে রাখে। সংকটের দিনে এই ঐতিহ্য দেয় শক্তি, সমৃদ্ধির দিনে উদ্বুদ্ধনা। বিপ্লব ও বীরত্বের ঐতিহ্যকে প্রতিটি জাতি তাই স্মরণীয় করে রাখে কালের অবলেপনকে অগ্রাহ্য করে। ২১শে অক্টোবর এমনি একটি দিন যার অবদান শুধু গেল দিনেই অবলুপ্ত নয়,—আগামী দিনেও যার রয়েছে অগ্রসারী আহ্বান। এইদিনটিতেই সেদিনের সোনানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকার প্রতিষ্ঠা করে ভারতীয় স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী পাঠ করেন এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন আপসহীন সশস্ত্র মুক্তি-সংগ্রাম।

আজাদ হিন্দের সংগ্রামী বৈশিষ্ট্য

আজাদ হিন্দ্ শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই নয়, বিশ্বের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কাছেও অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। সংঘবদ্ধভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু হয় সিপাহী বিপ্লবে। তার পরে নানাভাবে নানাপথে প্রায় এক শতাব্দী ভরে চলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই সংগ্রামের বিভিন্ন ও বহু অধ্যায় মধ্যে আজাদ হিন্দ্ আপন স্বাতন্ত্র্যে দীপ্তিমান। ভারতের স্বাধীনতা

সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে যে সমস্ত গণ-উত্থান দেখা দেয় তার প্রায় সমস্ত ঘটনাই গান্ধীনীতি ও নেতৃত্বের ঐতিহ্যবাহী। কিন্তু ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবরের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে ১৮৫৭ সালের ১৪ই মে'র বিপ্লবী আহ্বান। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব শ্বেতাঙ্গ দাসত্বের প্রতিরোধে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। ১৯৪৩ সালের আজাদ হিন্দ্ সেই সিপাহী বিপ্লবের শেষ অধ্যায়। সিপাহী বিপ্লবের প্রথম প্রতিরোধ এবং আজাদ হিন্দের শেষ আঘাত,—দুই শতাব্দীর এই বিচ্ছিন্ন সংগ্রামী ঘটনা ছাড়া ভারতীয় সেনাবাহিনী স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন অংশ গ্রহণ করেনি। যে সিপাহী বিপ্লবকে পর্যুদস্ত করে ইংরেজ ভারত সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করেছিল, সেই সিপাহীদেরই দ্বিতীয় বিদ্রোহের শেষ আঘাতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি নির্মূল হয়েছে ভারতের মাটি থেকে। ভারতের সিপাহীদের শহীদী-রক্তের বিপ্লবী ঐতিহ্যে-গড়া আজাদ হিন্দ্ তাই জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে এমন একটি বিশিষ্ট ইতিহাস,—যার উৎসারণ ১৮৫৭ সালের অনুবর্তনে। তাই স্বাধীন ভারতের জাতীয় জীবনে আজাদ হিন্দের ঐতিহ্যকে তুলে ধরার জন্য ২১শে অক্টোবরের প্রকৃতি ও প্রভাবের এই মৌলিক তাৎপর্য অনুধাবন করা প্রয়োজন।

বিপ্লবী প্রতি-সরকার

বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলনে ঘটনার দিক দিয়ে আজাদ হিন্দ্ কোন অভিনব কাহিনী নয়। আরো অনেক বিপ্লবী নিজেদের দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে স্বদেশের মুক্তি-সাধনায় ব্রতী হয়ে প্রতি-সরকার গঠন করার চেষ্টা করেছেন,—তার বহু ঘটনা রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। শত্রুর শত্রুকে দিয়ে শত্রুর অপসারণ,—পৃথিবীর বহু স্বাধীনতা সংগ্রামে এই নীতি কার্যকরী হয়েছে। নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ ছাড়াও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মিত্র ও অক্ষ রাজ্যে আরো অনেক প্রতি-সরকার গঠিত হয়েছিল। কিন্তু নেতাজীর বৈপ্লবিক ঔদ্ধত্য ও দুঃসাহসিকতা এবং

আজাদ হিন্দের সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক সংগঠন ও অভিযান যে ঐতিহ্য রচনা করেছে তার তুলনা নেই। বিশ্বের ভাবী সংগ্রামীদের কাছে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ্ তাই এক অমর অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। অক্ষশক্তির সহায়তা নিয়েও স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতি-সরকার গঠন, সম্পূর্ণ স্বাধীন সামরিক বাহিনী এবং সে বাহিনীর সংগঠন ও পরিচালনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা, স্বতন্ত্র বৈদেশিক নীতি অনুসরণ, প্রতি-সরকারের আর্থিক সঙ্গতিতে নিজস্ব সরকারী ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আর্থিক স্বাবলম্বন, পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয় জনতার মনে স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদা ও অভূতপূর্ব স্বদেশ-প্রেমের জাগৃতি, ত্যাগ ও সংগ্রামের অপূর্ব কাহিনী রচনা,—প্রতি-সরকার গঠন ও সামরিক অভিযানে এক সামগ্রিক নেতৃত্বের যে ইতিহাস আজাদ হিন্দ্ ও নেতাজী রচনা করেছেন তা' বিশ্বের মুক্তি-সংগ্রামের আন্দোলনে এক নূতন অবদান ও অভিজ্ঞতা। শত্রুর শত্রু-রাজ্যের সাহায্য নিয়েও, কিভাবে স্বাধীনতার সংগ্রাম ও সংগঠনকে পররাজ্যের প্রভাবমুক্ত রাখা যায়, আত্মস্বাতন্ত্র্যে বিপ্লবী প্রয়াসকে স্বাবলম্বী রাখা যায় এবং পরিপূর্ণ বৈপ্লবিক সংগঠনের কিরূপ অপূর্ব সংহতি গড়ে তোলা যায়,—নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ তার বাস্তব ইতিহাস রচনা করেছে।

পূর্ব এশিয়ার জনজাগরণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে জাপানের সরাসরি সামরিক আঘাত পূর্ব-এশিয়ার পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের গোড়ায় প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে একথা সত্যি, কিন্তু মহাযুদ্ধের অবসানে পূর্ব-এশিয়ার পরাধীন দেশগুলিতে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম দেখা দিয়েছে তার মূলে রয়েছে আজাদ হিন্দের সংগ্রামী ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণা। পাশ্চাত্য শক্তির যে উপনিবেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী জাপানের করায়ত্ত হয়েছিল, জাপানের পরাজয়ের পরে তা' নির্বিবাদে আবার বৃটিশ, ফ্রান্স বা ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যেতো। কিন্তু যুদ্ধান্তে কোন

উপনিবেশেরই নির্বিবাদ হস্তান্তর সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সমগ্র পূর্ব-এশিয়ায় সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ-বিরোধী প্রচণ্ড জন-আন্দোলন গড়ে উঠেছে। যার ফলে পূর্ব এশিয়ার বুক থেকে সাম্রাজ্য-বাদ নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং বিভিন্ন জাতি তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হয়েছে। পূর্ব-এশিয়ার সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয় সংগ্রামের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদ হিন্দ আন্দোলন। পূর্ব-এশিয়ার সর্বত্র ভারতীয় 'স্বাধীনতা লীগের' সম্প্রসারণ ও এশিয়াবাসীদের স্বাধীনতা অর্জনের অধিকার সম্বন্ধে নির্ভীক আদর্শবাদ প্রচার, আজাদ-হিন্দ্ সরকারের প্রতিষ্ঠা এবং ব্যাপক আজাদ হিন্দ্ আন্দোলন,—এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির সামনে জাতীয় সংগ্রামের এক নূতন আশা ও আদর্শের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যুগসন্ধী পর্যায়।

নেতাজীর প্রভাবে টোকিওতে ১৯৪৩ সালের ১৫ই নভেম্বর পূর্ব-এশিয়ার জাতিসমূহের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে যে সমস্ত আদর্শ ও উদ্দেশ্য গ্রহণ করা হয় তার লক্ষ্য ছিল জাপানের কাছ থেকে এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ-কবলিত রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা প্রাপ্তির স্বীকৃতি অর্জন করা। এই সম্মেলনে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যশক্তির হাত থেকে এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির মুক্তি বিধান করে প্রতিটি সদ্যমুক্ত রাষ্ট্রের 'self existence and self-defence'-এর সংকল্প ঘোষণা করে পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার সনদরূপে ঘোষণা হয়,—"The principles of justice, national sovereignty, reciprocity, international relations and mutual aid and assistance."

জাপানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পূর্ব-এশীয় সম্মেলনের মূল আদর্শের ভিত্তিরূপ এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ-কবলিত দেশগুলির স্বাধিকারের দাবী ঘোষণা করে নেতাজী বলেন, "This is not a case of a few politicians in Japan enunciating an

attractive policy in high-sounding terms without reference to the wishes or the ideas of the mass of the people. It is the case of an Asiatic Nation —developing an Asiatic Consciousness—and acting as the spearhead of an Asiatic Revolution." জাপান-অধিকৃত রাজ্যে এবং জাপানের উদ্যোগে আহুত পূর্ব-এশিয়া সম্মেলনে এশিয়ার নতুন জাতীয় জাগরণের ভিত্তিতে এশিয়ার বিপ্লবের আহ্বান জানিয়ে নেতাজী জাপান-কবলিত পূর্ব-এশিয়ার দেশসমূহে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সংগ্রামের এক দুর্জয় আদর্শ ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রেরণা সঞ্চার করেন। পূর্ব-এশিয়ার সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ-বিরোধী জন-জাগরণে নেতাজী ও আজাদ হিন্দের এই অবদানের কথা আউঙ সাঙ ও সোয়েকারনো এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ অকপটে স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে আজাদ-হিন্দ্ ইন্দোনেশিয়া ও বার্মার স্বাধীনতা এবং ইন্দোচীন ও মালয়ের জাতীয় সংগ্রামের পশ্চাতে এক প্রধান অনুপ্রেরণার উৎসরূপে কাজ করেছে। আজাদ হিন্দ্ আন্দোলন তাই শুধু ভারতের নয়, সমগ্র পূর্ব-এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামের অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক প্রতীক।

জাতীয় সংহতির অগ্রদূত

ভারতীয় জনজীবনে সামাজিক বিপ্লব সাধনের ক্ষেত্রেও আজাদ হিন্দের এক অপূর্ব অবদান রয়েছে। বর্ণ ও ধর্মের দ্বন্দ্বে ভারতের জাতীয়তার কল্পনা আধুনিক যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী যথার্থ সাম্য ও সংহতির বাস্তবতা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। প্রায় এক হাজার বছর পাশাপাশি বাস করে এবং বহু সাধকের চেষ্টা সত্ত্বেও ধর্ম ও আহার-বিহারে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্য ও উদারতার নীতি প্রচলিত করা সম্ভব হয়নি। হিন্দুসমাজের মধ্যেও বর্ণ-বিভেদ তেমনিই অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় সংহতি এবং সামাজিক সংস্কার, —দু'দিক দিয়েই আজাদ হিন্দ্ এক বৈপ্লবিক ঐতিহ্য রচনা করেছে।

হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ইসাইদের পক্ষে স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দভাবে একঘরে রান্না, একাসনে আহার এবং একই গৃহে বসবাস করা,—আজিও দু' চারজন শিক্ষিতের পক্ষে সম্ভব হতে পারে,—কিন্তু নীতি হিসাবে কি শিক্ষায়, কি সামরিক বিভাগে, কি সরকারী কর্মচারীদের যৌথ আবাসে এই নীতি প্রয়োগ করা ধর্ম ও বর্ণ-বিচারী ভারতে এক অকল্পনীয় প্রচেষ্টা। নেতাজী ও আজাদ হিন্দ্ এই প্রচেষ্টায় শুধু সফল হয়নি,—এই সম্পর্ককে সহজ করে তুলে ধরেছিল আজাদ হিন্দ্ সরকার ও সামরিক বিভাগে। সমন্বিত জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়েরা,—তাই আজাদ হিন্দ সংগঠনে আহার ও বাসস্থানে কোন ভেদাভেদ ছিল না। ধর্মের দিক দিয়েও আজাদ হিন্দের সংগঠনে এক অভূতপূর্ব উদারতা গড়ে উঠেছিল। হিন্দু মন্দিরে মুসলমান ও খৃষ্টানদের প্রবেশাধিকার উদারপন্থী সাধু-সন্তেরাও এনে দিতে পারেননি। কিন্তু নেতাজীর যাদুমন্ত্রে পূর্ব-এশিয়ার বহু মন্দির মুসলমান ও খৃষ্টানদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মন্দির প্রবেশে অনধিকারের কোন প্রশ্নই ছিল না আজাদ হিন্দের আমলে। ধর্ম ও বর্ণে উদারতা ও সামঞ্জস্যের যে ঐতিহ্য আজাদ হিন্দ রচনা করেছিল ভারতের সমাজ-জীবনে তার অবদান বৈপ্লবিক।

হিন্দু-মুসলমানের এক জাতীয়তার আদর্শ ভারতে বহু প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের শাসনকালে এই আদর্শের সংগ্রামী রূপায়ণের উদাহরণ খুবই কম পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমানের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও সহযোগিতায় সর্বপ্রথম জাতীয় সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় আন্দোলনে মাত্র একবার হিন্দু-মুসলিমের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে উঠেছিল। সে অধ্যায় হলো ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন। কিন্তু এই সংযোগ ও সহযোগিতা ও জাতীয়তার আহ্বানে গড়ে উঠেনি। একশ সালের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের সঙ্গে ধর্মীয় খিলাফত আন্দোলন যুক্ত হয়েছিল। অসহযোগের

মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের সংগ্রামী ঐক্য মূলগত অসামঞ্জস্যের জন্য স্থায়িভাবে কার্যকরী হয়নি। জাতীয় সংগ্রামের ব্যাপক ক্ষেত্রে কংগ্রেস কখনও হিন্দু-মুসলমানের স্বাভাবিক ও বিস্তৃত ঐক্যের ঐতিহ্য রচনা করতে পারেনি। ভারতীয় মুসলীম নেতৃবর্গ গান্ধীজীর আত্মদানের পরে একথা উপলব্ধি করেছেন যে, গান্ধীজী মুসলীমদের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলীমদের সমন্বিত জাতীয় জীবন রচনাই ছিল গান্ধীজীর কাম্য। কিন্তু গান্ধীজীর জীবিতকালে কায়েদে আজম জিন্নাই তাঁদের অধিকাংশের আনুগত্য অর্জন হিন্দু-মুসলীমের দ্বি-জাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে বিখণ্ডিত করে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

সিপাহী বিপ্লবের পরে একমাত্র আজাদ হিন্দ্‌ই সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্কে হিন্দু-মুসলিম-শিখ-ইসাই সম্প্রদায়কে সংগ্রামী ঐক্য এবং সমন্বিত জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। দ্বি-জাতিতত্ত্বের একমাত্র বাস্তব উত্তর দিয়েছিল আজাদ হিন্দের সমন্বয়ী জাতীয়তাবাদের জীবন্ত অভিযান। কোহিমা, ইম্ফল ও চট্টগ্রামের শ্যামল মাটিতে সমন্বিত জাতীয় শক্তির রক্তসিঞ্চনে যে জাতীয় জীবনের কল্পনা অঙ্কুরিত হয়েছিল এবং লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকালে ভারতের সমন্বিত জাতীয় জীবনের যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল,—সেদিনের ভারতীয় নেতৃত্বের দ্বিধাগ্রস্ত নির্দেশের ফলে ভারত বিভাগের অপকীর্তিতে তার সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

ধর্ম ও বর্ণের বিভেদ মুছে দিয়ে আজাদ হিন্দ্‌-সমন্বিত জাতীয়তা-বাদের এবং সামাজিক প্রগতির যে নিদর্শন ভারতের জনগণের সামনে তুলে ধরেছিল তা আজিও জাতীয়তা ও সমাজ-প্রগতির আদর্শে এক অপূর্ব দিগ্‌দর্শন হয়ে থাকবে।

সামরিক ঐতিহ্য

আজাদ হিন্দ ফৌজকে স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনীতে গ্রহণ, আজাদ হিন্দের রণাঙ্গনে স্মৃতিসৌধ গঠন, আজাদ হিন্দের একটি

পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা,—ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের একটি বিপ্লবাত্মক অধ্যায়ের স্মৃতি রক্ষার এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার মত উদারতাবোধ হয়তো নেতাজীর সম-সাময়িক কংগ্রেসী নেতৃবর্গের কাছ থেকে আশা নাও করা যেতে পারে। হয়তো ভারতের ভাবী নেতৃবর্গ ও ঐতিহাসিকেরা এই জাতীয় কর্তব্য সম্পন্ন করবেন।

নেতাজী ও আজাদ হিন্দের প্রতি আজিকার নেতৃবর্গের অনুদার উপেক্ষার বিচ্যুতি হয়তো ভাবী ভারতে দূর হবে। কিন্তু ত্যাগ ও বীর্যের সংগ্রামী নিদর্শনে আজাদ হিন্দ যে জাতীয় এবং সামরিক ঐতিহ্য রচনা করেছে বর্তমান ভারত কি তা অবহেলা করতে পারে?

স্বাধীন ভারতের সামরিক বাহিনী জাতীয় উদ্বুদ্ধনা এবং শৌর্য-বীর্যের ঐতিহ্য অনুসরণে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠুক,—স্বাধীনতা রক্ষার্থী প্রতিটি ভারতীয়ের এই কাম্য। সামরিক বাহিনীকে জাতীয়তা ও বীরত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য প্রতিটি রাষ্ট্র তার বিগত দিনের সংগ্রাম ও শৌর্যের ইতিহাসকে সেনাবাহিনীর সামনে তুলে ধরে। কিন্তু ভারতীয় বাহিনীর কাছে তুলে ধরবার মত ইতিহাস খুব বেশী নেই। হলদিঘাট কি পানিপথ, শেরশা কি শিবাজী,—হিন্দু-মুসলিমের মনে সমান জাতীয়তার প্রেরণা যোগায় না। সমন্বিত জাতীয়তার আদর্শ অনুযায়ী ভারতের বিগত দিনের ইতিহাস থেকে ঐতিহ্য সঞ্চয়ন করা তাই খুব সহজ নয়। বৃটিশ সাম্রাজ্য শাসনের যুগে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কোনো জাতীয় ও সংগ্রামী ঐতিহ্য নেই। দুই মহাযুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম করেছে তার কাহিনীকে বীরত্বের আখ্যা দিয়ে স্বাধীন ভারতের সামরিক বাহিনীর সামনে সংগ্রামের বীর্যময় ও জাতীয়তার গৌরব-বাহী ঐতিহ্য বলে স্থাপন করা যায় না। গান্ধী-নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় আন্দোলন গণসংগ্রাম ও জাতীয় চেতনার অপূর্ব ইতিহাস।

কিন্তু নিরস্ত্র ও অহিংস সংগ্রাম,—যার সাথে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কোন সংযোগ ছিল না,—তার ঐতিহাসিক উপাদান দিয়ে ভারতীয় বাহিনীর মনে সংগ্রামী শৌর্যবোধের প্রেরণার সঞ্চার সম্ভব কি না তা প্রশ্নের বিষয়। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের দুটিমাত্র অধ্যায়ের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী সার্থক ও সমভাবে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সামনে তুলে ধরা যায়। প্রথম অধ্যায় হলো সিপাহী বিপ্লবের কাহিনী এবং দ্বিতীয় ঘটনা ফৌজের আজাদ হিন্দ ইতিহাস। এই দুটি ঐতিহাসিক উপাদানে রয়েছে দুটি অমূল্য ঐতিহ্য। এই দুটি সংগ্রামেই ধর্ম ও বর্ণনির্বিশেষে ভারতীয় সামরিক বাহিনী সমন্বিত জাতীয়তার আদর্শে সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম করেছে এবং জাতীয় সংগ্রামের এই দুটি মাত্র নিদর্শন যার মধ্যে ভারতীয় সামরিক বাহিনী প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছে। সমন্বিত জাতীয়তাবাদের আদর্শকে জীবন্ত করে তোলার জন্য এবং স্বাধীন ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ভারতীয় সামরিক বাহিনীর মনে ত্যাগ ও বীরত্বের ঐতিহ্যকে তুলে ধরবার প্রয়াসে সিপাহী বিপ্লব ও আজাদ হিন্দের সংগ্রামী ঐতিহ্যের স্বীকৃতি এবং ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সামনে তাকে গৌরবময় করে তোলা ভারতীয় সামরিক বাহিনীর আত্মিক শক্তি বর্ধনের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

ভারতীয় ইতিহাসের এক অপূর্ব সংগ্রামী অধ্যায়ের স্মরণ ও শ্রদ্ধা তর্পণের জন্যই নয়,—আজকের জাতীয়তা ও সামাজিক প্রগতির আদর্শকে সার্থক করে তোলা এবং ভারতের সামরিক শক্তিকে জাতীয়তা ও বীরত্বের প্রেরণায় দুর্ধর্ষ করে তোলার সমসাময়িক প্রয়োজনেও নেতাজী ও আজাদ হিন্দের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি একান্ত আবশ্যক।

—যুগান্তর

আজাদ হিন্দের ইতিহাস

১৯৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের শত-বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সিপাহী বিদ্রোহ,—যাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সংগ্রামরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে,—তার ইতিহাস রচনার জন্য সরকার ব্যবস্থা করেছেন। সিপাহী বিদ্রোহের দুষ্প্রাপ্য দলিলপত্র ও তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য বহু অর্থব্যয় করার দায়িত্ব নিয়েছেন ভারত সরকার। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের অঙ্কুরোদ্গম জাতীয় সংগ্রামের যে বিরাট ঐতিহ্যের মাধ্যমে অপূর্ব পরিণতি লাভ করেছে তাকে স্মরণীয় করে রাখবার কোন প্রয়াস তো সরকারের নেই-ই, এমনকি আজাদ হিন্দের অগণিত দলিলপত্র, সহস্র শহীদের আত্মদানের বিভামণ্ডিত কত ঐতিহাসিক স্মারকসম্ভার যে চরম অবহেলা, উপেক্ষা ও বিস্মরণের ফলে নির্মমভাবে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে,—সেদিকে একটু দৃক্‌পাত করবার আগ্রহ পর্যন্ত ভারত সরকারের নেই। আজাদ হিন্দের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করবার মত কত সম্ভার যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, জার্মানীতে, এমনকি ভারতবর্ষেও বহু ব্যক্তির কাছে ছড়িয়ে পড়ে আছে,—আজ সেই অমূল্য দলিলপত্রাদি সংগ্রহ করার কোন রাষ্ট্রীয় তাগিদ নেই। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ভাবী বংশধরদের কাছে আজাদ হিন্দের প্রতি এই চরম উপেক্ষার জন্য ধিক্কার লাভ করতে হবে। আজ যেমন সিপাহী বিদ্রোহের তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য কতরকম গবেষণা ও প্রচেষ্টা চলছে, একদিন সুনিশ্চিতভাবে

জাতীয় ভারত আজাদ হিন্দের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে তেমনি ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হবে। কিন্তু আজ স্বাধীন ভারত আজাদ হিন্দের ঋণ স্বীকারে তার সাধারণ কর্তব্যবোধেও বিমুখ।

আজাদ হিন্দের প্রতি কেন এই রাষ্ট্রীয় উপেক্ষা? ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল্যায়ণে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদান কি গণনাযোগ্য নয়? অথবা, আজাদ হিন্দ ফৌজ যে আদর্শ ও ঐতিহ্য নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক গৌরবোজ্জ্বল রক্তাক্ষরা ইতিহাস রচনা করেছে তা' কি ভারতবর্ষের বর্তমান রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষের কাছে পরিত্যাজ্য বলে বিস্মরণ-যোগ্য?

আজাদ হিন্দের অবদান

সিপাহী বিদ্রোহকে যদি বলা যায় ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম,—তা' হলে সুনিশ্চিতভাবে একথা বলা যায় যে আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম পরিণাম। সিপাহী বিদ্রোহের পরে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত আবেদন-নিবেদনের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনই প্রাধান্য লাভ করেছিল। ১৯০৫ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন প্রবহমান ছিল বটে, কিন্তু এই যুগে জাতীয় সংগ্রামের অন্তর্ধারায় প্রাণ-প্রবাহের সঞ্চার করেছিল বাংলার মাটিতে উদ্ভূত বৈপ্লবিক আন্দোলন। এর পরে চল্লিশ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সংগ্রাম তার শক্তি ও সামর্থ্যলাভ করেছে এবং ভারতের জাতীয় চেতনা সর্বময় হয়ে উঠেছে গান্ধীজীর অসহযোগ আইন অমান্যের প্রেরণায়। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চরম সংগ্রামী রূপ লাভ করেছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের অপূর্ব বৈপ্লবিক ঐতিহ্যে। ১৯৪১-৪৬ সালের স্থল-জল-বিমানবাহিনীর বিদ্রোহাত্মক ধর্মঘট আজাদ হিন্দ সংগ্রামী প্রেরণার প্রলম্বিত পরিণতি মাত্র। ভারতের জাতীয় সংগ্রামে আজাদ হিন্দ

ফৌজের ভূমিকাকে অস্বীকার অরার অর্থ তাই ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসকে কোনো অপ-অভিপ্রায়ে বিকৃত ও বিভ্রান্ত করা। গান্ধীজীর অসহযোগ আইন অমান্য যদি ভারতের বুকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অচলায়তনকে ভগ্নপ্রায় করে দিতে থাকে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ অভিযান তা' হলে তাকে শেষ আঘাত দিয়ে ধুলায় লুটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

আজাদ হিন্দের আদর্শ ও ঐতিহ্য

আজাদ হিন্দ ছিল বিপ্লববাদ ও হিংসাত্মক শস্ত্রবলের অনুসারী। সেইজন্যই কি গান্ধীজীর ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার অভিপ্রায়ে আজাদ হিন্দের সংগ্রাম-কাহিনীকে যথার্থ জাতীয় মূল্য দিয়ে ইতিহাসাকারে গ্রথিত করতে ভারত সরকার পরাঙ্মুখ? গান্ধীজীর অহিংসাব্রতী আদর্শ অনুযায়ী ভারত সরকার সামরিক বাহিনী পরিত্যাগ করেননি। স্বাধীন ভারতের সামরিক বাহিনীর শক্তিশালী সংগঠন এবং নৈতিক মনোবল বর্ধনের জন্য ভারতের অতীত দিনের জাতীয় জীবনে যে সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে, তার কাহিনী ভারতীয় ফৌজের শিক্ষা ও প্রেরণার জন্য স্বাধীন সামরিক প্রচেষ্টার ইতিহাসরূপে সংগৃহীত করা হয়েছে,—অথচ জাতীয় আদর্শ, অপূর্ব ত্যাগ ও দৃঢ়তা এবং সংগ্রামী ঐতিহ্যে গৌরবান্বিত আজাদ হিন্দের ন্যায় এমন কোন দ্বিতীয় জাতীয় সংগ্রামের কাহিনী, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকালীন সামরিক বাহিনীর ইতিহাসে গত এক শতাব্দীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবুও নিতান্ত রাজনীতির সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য আজাদ হিন্দের পরম মূল্যবান সংগ্রামী ঐতিহ্যের কাহিনী থেকে ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে জাতীয় মন্ত্রের দীক্ষায় বঞ্চিত করতে ভারত সরকার দ্বিধাবোধ করছেন না।

আজাদ হিন্দের ন্যায় এমন বৈপ্লবিক নিষ্ঠায় ভারতের জাতীয় আদর্শকে আর কোন সংগ্রামই জীবন্ত করে তুলতে পারেনি।

সিপাহী বিদ্রোহের জাতীয় আদর্শ ও অভিপ্রায় ছিল অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজীকে ধর্মীয় খিলাফতের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়েছিল। ত্রিশ ও চল্লিশ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে ভারতের মুস্লিম সম্প্রদায় পরিপূর্ণভাবে যোগ দেয়নি। কিন্তু মুস্লিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন যখন প্রচার ও প্রভাবের চরম শীর্ষে, সেই সময় অখণ্ড ভারতে সম্মিলিত জাতীয় জীবন রচনায় এক পূর্ণাবয়ব আদর্শের অমর ঐতিহ্য রচনা করেছে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ। আজাদ হিন্দ ফৌজের হিন্দু-মুস্লিম -শিখ-ইসাই সৈনিকেরা সম্মিলিত রক্তের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে ভারতের মাটিকে শুধু পবিত্রই করে তোলেনি, অখণ্ড ভারতের সম্মিলিত জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যকে অমর করে তুলেছে। একই পাকশালায় খাওয়া, একই শিবিরে থাকা এবং মন্দির-মসজিদ-গুরুদুয়ার-গীর্জায় সকল সম্প্রদায়ের জন্য অবারিতভাবে উন্মুক্ত করার যে বাস্তব ঐতিহ্য আজাদ হিন্দ্ রচনা করেছে এবং তার মধ্যে ভারতবর্ষের ষাট বছরের জাতীয় জীবনের আশা ও স্বপ্ন যেভাবে বাস্তব আকার লাভ করেছে, সেরূপ আর কোন দ্বিতীয় নিদর্শন ভারতের কোন জাতীয় সংগ্রামের কোন অধ্যায়েই নেই। লৌকিক রাষ্ট্রের এত আদর্শ প্রচার করে আজাদ হিন্দের ইতিহাস ও ঐতিহ্য কিভাবে যে আজিকার স্বাধীন ভারতবর্ষে বিস্মৃত ও উপেক্ষিত হতে পারে, সে-প্রশ্নের জবাব দুর্জ্ঞেয় না হলেও বিস্ময়কর।

প্রতি সরকারের ঐতিহ্য

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগে পৃথিবীর পরাধীন দেশগুলি শত্রুর সাহায্যে প্রতি সরকার গঠন করে স্বাধীনতা অর্জনের যে চেষ্টা করেছে, তার ঐতিহ্যে আজাদ হিন্দ একক নয়। প্রথম মহাযুদ্ধে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের নেতৃত্বে স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফরাসীর দ্য-গল, চেকোশ্লোভা-

কিয়ার মেসারিক, জেরুজালেমের মুফ্‌তী এবং আরও অনেকের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে প্রতি সরকার গঠিত হয়েছিল। কিন্তু নেতাজীর আজাদ হিন্দ সরকারের সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। নিজস্ব সামরিকবাহিনী এবং সামরিক-সম্ভার ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থাসহ সম্পূর্ণভাবে নিজেদের অর্থবলের সামর্থ্যের উপরে এবং বহু স্বাধীন দেশ কর্তৃক স্বীকৃত একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যেভাবে আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেছিলেন এবং সেই সরকার নিজেদের অর্থের বিনিময়ে জাপানের কাছ থেকে অস্ত্র খরিদ করে এবং জাপানের প্ররোচনা সত্ত্বেও, রাশিয়া বা চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করে, যে সামরিক ও কূটনৈতিক স্বকীয়তা এবং স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখার দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, তা' চিরকাল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিশ্ব-সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় বলে গণ্য হবে।

এশিয়ার জন-জাগরণের প্রেরণা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আজ স্বাধীন রাষ্ট্রপুঞ্জের সমষ্টি। উপনিবেশ-বাদের বিরুদ্ধে এই রাষ্ট্রগুলি তাদের জাতীয় সত্তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে, জাতীয় অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের ঐতিহ্য ও ইতিহাস যে প্রেরণা সঞ্চার করেছে তার অবদান অনস্বীকার্য।

উপেক্ষিত জাতীয় ইতিহাস

ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যের সংকেতরূপে বা ভারতের সামরিক-বাহিনীকে প্রেরণা সঞ্চারে অমূল্য উপাদান-রূপেই নয় শুধু স্বাধীন ভারতের জাতীয় ঋণ হিসেবেও আজাদ হিন্দের মৃত্যুঞ্জয়ী ইতিহাসকে স্মরণীয় করে রাখা ভারতবাসীর একান্ত কর্তব্য। আজাদ হিন্দের দলিলপত্র ও তথ্যাদি এখন অতি অল্প চেষ্টায় সংগ্রহ করে

আজাদ হিন্দের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করা সম্ভব,—ভবিষ্যতে তাই হয়তো একটি অতি কষ্ট-সাধ্য কাজরূপে পরিগণিত হবে। স্বাধীন ভারতের ইতিহাস রচনায় আজাদ হিন্দের বৈপ্লবিক অধ্যায়ের স্থান কোথায়, সেই বিষয় নিয়ে মতান্তর হওয়ায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা কমিটির অধ্যক্ষপদ পরিত্যাগ করতে হয়েছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনায় সরকারী কর্তৃপক্ষ বিমুখ হলেও, স্বাধীন ভারতের অধিবাসীদের পক্ষে কি সরকার-নিরপেক্ষ এমন কোন উদ্যম প্রদর্শন করা সম্ভব নয়,—যার আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় ভারত ইতিহাসের এই অমর-মরণ-রক্তচরণ অধ্যায়টির অপূর্ব কাহিনী ভাবী ভারতের হাতে একটি অমূল্য জাতীয় দলিলরূপে তুলে দেওয়া যায়?

—যুগান্তর

নেতাজীর বৈপ্লবিক অবদানের মূল্যায়ণ

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যে এ যুগের শ্রেষ্ঠতম ভারতীয় বিপ্লবী, নেতাজীর বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ও আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি-সংগ্রামের ফলেই যে বৃটিশ ভারতীয় ফৌজের রাজ-আনুগত্যে রূপান্তর ঘটে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় যে বৃটিশ সাম্রাজ্যশক্তি ভারত-ত্যাগের শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়,—একথা আজ তথ্য-নির্ভর ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু নেতাজীর বৈপ্লবিক ভূমিকার গুরুত্ব যে আরও কত ব্যাপক,—এখনও তার পূর্ণ মূল্যায়ণ হয়নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে এশিয়ার জনজীবনে নেতাজীই এশিয়ার বুকে সর্বাগ্রগণ্য সাম্রাজ্য-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধান্তে নেতাজীর অবদান ও ঐতিহ্য শুধু ভারতের বুকেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিস্ফোরণ ঘটায়নি,—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছে নেতাজীর বৈপ্লবিক নেতৃত্ব দ্বারা। বার্মা, মালয়, তৎকালীন ইন্দোচীন এবং ইন্দোনেশিয়ার বৈপ্লবিক নেতৃত্ব ও সংগঠন নেতাজীর বৈপ্লবিক ভূমিকার প্রতি গভীরভাবে ঋণী। পূর্ব এশিয়ায় আসার আগে এই সমস্ত দেশের জাতীয় নেতৃত্ব জাপ তাঁবেদারীর উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। ১৯৪৩ সালের ঐতিহাসিক দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় সম্মেলনে নেতাজীরই

সর্বপ্রথম এশীয় নেতৃত্বের সামনে 'এশীয়ান রিভল্যুশনে'র আহ্বান তুলে ধরেন। নেতাজীর বৈপ্লবিক আঘাতেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধান্তে ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়। ভারতের বুকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য-বাদের অবসানে যে রাজনৈতিক চেইন-রি-অ্যাকশনের সূচনা হয় তারই পরিণামে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয়তা-সচেতন বৈপ্লবিক পরিবেশে ইংরেজ, ডাচ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া ত্যাগের সংকল্প গ্রহণে বাধ্য হয়। এশিয়ার বুকে সাম্রাজ্যবাদের দুর্গ পতনে যে প্রচণ্ড রাজনৈতিক মন্থন সুরু হয় তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তী অধ্যায়ে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ একে একে আফ্রিকার সাম্রাজ্য-শাসন গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। নেতাজী তাই প্রত্যক্ষভাবে ভারত ও এশিয়ার বুকে সাম্রাজ্যবাদ অবসানের অগ্রনায়ক এবং আফ্রিকার মুক্তি-সংগ্রামেরও পরোক্ষ দিশারী। এশিয়ান বিপ্লবে নেতাজীর এই ভূমিকার কথা যুদ্ধকালীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন জাতীয় নেতৃত্ব নানাভাবে স্বীকার করেছেন। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব এই তথ্যকে ঐতিহাসিক গ্রন্থনে এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেনি।

ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব, সংগঠন ও সংগ্রামের ঐতিহ্যে নেতাজীর বৈপ্লবিক ভূমিকা বিশ্বের ইতিহাসে তুলনাহীন। জেল থেকে পলায়ন, দেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণ এবং বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে বিদেশের সাহায্যে স্বদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রসার অথবা পররাষ্ট্র ভূমিতে বিদ্রোহী সরকার গঠন,—এরূপ নজীর স্থাপনে নেতাজীর বৈপ্লবিক ভূমিকা অনন্য নয়। কিন্তু গুরুত্ব, ব্যাপকতা, তাৎপর্য ও পরিণামে নেতাজীর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব বিশ্বের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাসে যে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য স্থাপন করেছে, তার মান ও পরিমাপ এক অপূর্ব কৃতিত্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নিজের জীবন-চিন্তাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে একটি বিপ্লবী জীবন যে কত দুঃসাহসিক হতে পারে নেতাজীর জীবনগাথার আগে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর নজীর বিশ্বের ইতিহাসে আর কোনকালে কোথাও সৃষ্টি হয়নি। ক্লাউজেবিৎসের সামরিক নীতি

লেনিন অনেক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক কৌশলরূপে প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু নেতাজীর বৈপ্লবিক নেতৃত্বের রাজনৈতিক ও সামরিক ট্যাক্‌টিস্‌ ও স্ট্র্যাটেজী যে অভূতপূর্ব সমন্বয়ে ঐতিহাসিক সার্থকতা লাভ করেছে তার দ্বিতীয় নজীর বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কোন অধ্যায়েই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। নেতাজী বিদেশে যে প্রতি বিপ্লবী সরকার গঠন করেন, এই সরকারের নেতৃত্বে যেভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় জনতার 'টোটেল মোবিলাইজেশন' ঘটে, যে-ভাবে ভারতীয় জনতা ও বিপ্লবী সামরিক শক্তির আস্থা, আনুগত্য ও আশ্বাসে একটি ব্যাপকাকার জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যেভাবে এই বিপ্লবী সরকার নিজের কর্তৃত্বে বিরাট সামরিক অভিযান পরিচালনা করে এবং যে মুক্তি-সংগ্রামে ছাব্বিশ হাজার আজাদ হিন্দ ফৌজ শহীদী মৃত্যুর মহান্‌ কীর্তি স্থাপন করে,—বিশ্ব ইতিহাসে এমন আরেকটি বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের এমন অপূর্ব নিদর্শন নেই।

শুধু ভারতের নয়, এযুগের বিশ্বের ইতিহাসে নেতাজীর জীবন যে বৈপ্লবিক ঐতিহ্যে অতুলনীয়, নেতাজী যে বৈপ্লবিক নেতৃত্বের এক মহত্তম অভিব্যক্তি,—তাঁর জীবনগাথার তাথ্যিক মূল্যায়ণে কোন যোগ্য ঐতিহাসিক একদিন নিশ্চয়ই এই গৌরবময় উপসংহারকে ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরবেন।

নেতাজীর বীর্যবত্তা ও তাঁর দুঃসাহসিক অভিযাত্রার কাহিনী যেভাবে ভারতের জনমানসে রেখাপাত করেছে ঠিক সেইভাবে ভারতীয় জাতীয় জীবনের আদর্শনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার মূল্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ভারতত্যাগের আগে পর্যন্ত অন্যান্য ভারতীয় নেতৃত্বের কাছে নেতাজীর আদর্শনৈতিক চিন্তাবলী বহু বিদ্রূপ ও বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু বাস্তব জীবনের সংঘাতে এবং ভারতীয় রাজনৈতিক বিন্যাসের বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নেতাজীর চিন্তাধারার দূরদৃষ্টি ও নির্ভুলতা কি বিস্ময়করভাবেই না আজ যথার্থ বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

সমাজবাদ আজ ভারতীয় জনতার প্রায় এক সার্বজনীন মতবাদে পরিণত হয়েছে। এই সমাজবাদ যে মার্ক্সীয় কম্যুনিজম নয়,—এই মন্তব্য সম্বন্ধে এখন আর বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ত্রিশ দশকে ভারতীয় রাজনৈতিক পরিবেশে মার্ক্সীয় কম্যুনিজম ছাড়া সমাজবাদের ভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়ার মত স্বাধীন চিন্তার সাহস খুব কম লোকেরই ছিল। ভারতের জাতীয় জীবনে সমাজবাদী চিন্তাধারার কার্যকরী প্রচার করেন নেহরু, মানবেন্দ্রনাথ এবং সুভাষচন্দ্র। কিন্তু নেহরু ও মানবেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে মার্ক্সীয় কম্যুনিজমের দর্শনকেই সমাজবাদের একমাত্র বুনিয়াদরূপে গ্রহণ করেন। নেহরু পরবর্তী জীবনে মার্ক্সবাদকে 'সেকেলে' ও 'অচল' বলে আখ্যা দিয়ে পরিত্যাগ করার কথা পঞ্চাশ ও ষাট দশকে বারবার ঘোষণা করেছেন। মানবেন্দ্রনাথ জীবনের শেষ অধ্যায়ে কম্যুনিস্ট দর্শনকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করার জন্য নিজের প্রাক্-রচনার সম্পূর্ণ বিরোধী মানবতাবাদী দর্শন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ত্রিশ দশকে নেহরু ও মানবেন্দ্রনাথ উভয়েই ছিলেন মার্ক্সবাদী কম্যুনিজমের প্রবল সমর্থক।

নেতাজী গোড়া থেকেই মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের ডায়েলেকটিক্যাল মেটিরিয়েলিজম বা জড়বাদী দর্শন গ্রহণ করতে পারেননি। ত্রিশ দশকে ফ্যাসিজম বনাম কম্যুনিজমের প্রবল বিতর্কের সময় নেহরু বলেন, "আমি কম্যুনিস্ট আদর্শকে বেছে নিয়েছি, কারণ আমি মনে করি যে কম্যুনিজমের মৌলিক আদর্শবাদ ও ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত।" কম্যুনিজমের মনিস্টিক বা একান্তবাদী দর্শনকে চ্যালেঞ্জ করে নেতাজী জেনিভা থেকে তার উত্তরে বলেন, "হেগেলীয়, বার্গশোঁ বা যে কোন বিবর্তনবাদী তত্ত্বে কেউ বিশ্বাস করুক না কেন কোন ক্রমেই একথা বলা চলে না যে, সৃষ্টি শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। কম্যুনিজম বলে, কম্যুনিস্ট সমাজই হল মানবসমাজের অন্তিম পরিণতি। কম্যুনিজমের এই চূড়ান্তবাদী দর্শনকে চ্যালেঞ্জ

করে নেতাজী তাঁর 'ভারতীয় সংগ্রাম' বইটিতে, অন্যান্য লেখায় এবং ১৯৪৪ সালের টোকিও ভাষণে বারংবার ঘোষণা করেন যে, "কোন একটি বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থা হবে মানবপ্রগতির শেষ কথা,--একথা বলা নির্বুদ্ধিতার সামিল হবে। মানবপ্রগতি কোন দিন থামবে না,—অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আমাদের গড়ে তুলতে হবে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা।"

বিবর্তনবাদী, দর্শন আত্মিক প্রমূল্য এবং ভারতীয় ইতিহাসের সমন্বয়ীধারা,—এই ত্রয়ী সূত্রের অবলম্বনে সমন্বয়বাদী সমাজ-দর্শন রচনার আহ্বান জানিয়ে নেতাজী সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলেন, "যে কোন মতবাদকে চরম ও একান্ত সত্য বলে গ্রহণ করা অনুচিত। এজন্য রাশিয়ার উপরে চিন্তার আলোকপাতের জন্য নির্ভর করা নির্বুদ্ধিতার সামিল হবে।...আমার মনে একটুও সন্দেহ নেই যে ভারত ও বিশ্বের মুক্তি নির্ভর করছে সমাজবাদের উপরে। কিন্তু ভারতকে তার নিজস্ব সমাজবাদের স্বরূপ ও পদ্ধতি নিজেকেই উদ্ভাবন করতে হবে,—যার বৈশিষ্ট্যে শুধু ভারত নয়, বিশ্বও উপকৃত হবে।...আগামী দিনের বিশ্বের কৃষ্টি ও সভ্যতায় ভারতকে তুলে ধরতে হবে বিশিষ্ট অবদান। ভারতকে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের পরবর্তী অধ্যায়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।" ভারতীয় সমাজবাদের নিজস্ব দর্শন রচনায় নেতাজীকে সেদিন অনেক বিরূপতা, অনেক বিতর্ক ও উপহাস সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু আজ একথা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে, যে নেতাজীই ভারতীয় সমাজবাদের নির্ভুল দার্শনিক। ভারতে আজ নেতাজীর ভারতীয় সমাজবাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য স্বীকৃত হয়েছে।

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র-কাঠামোর ভিত্তি কি হবে তার নীতি নির্দেশ করতে গিয়েও তিনি কম সমালোচনার সম্মুখীন হননি। নেতাজী তাঁর 'ভারতীয় সংগ্রাম' বইটিতে 'মিড ভিক্টরীয় ডিমোক্র্যাসী'র বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি

আবার একথা বলেন যে, "যদি আমরা সমাজবাদী কাঠামে ভারতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন চাই......বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে চাই, তা' হলে ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট আমাদের অন্তিম লক্ষ্য হলেও, অন্তত কিছু কালের জন্য সামরিক অনুশাসনের সঙ্গে ডিকটেটরিয়াল ক্ষমতা সহ একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে হবে......যে সরকার মুষ্টিমেয় ধনিকের কুচক্ররূপে, নয় জনগণের মুখপাত্ররূপে কাজ করবে।" এই অভিমত প্রকাশের জন্য কংগ্রেসের এক শ্রেণীর নেতৃত্ব ও কম্যুনিস্ট মহল থেকে তিনি 'নিও ফ্যাসিস্ট' আখ্যা লাভ করেন। আজ বিশ বছর পরে কংগ্রেসের মনোপলি শাসনের অবসানের ফলে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র-বিখণ্ডক ও রাষ্ট্রদ্রোহী শক্তির অভ্যুত্থানে ব্যাপকভাবে এই অভিমত শোনা যাচ্ছে যে, বৃটেনের অনুকরণে গঠিত পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা ভারতের জাতীয় ঐক্য ও দ্রুত প্রগতির পক্ষে সহায়ক নয়। আজ সংবিধান পুনর্গঠনের প্রস্তাবও উত্থিত হচ্ছে। কিন্তু ভারতীয় সংবিধান রচনার সময়ে 'মিড ভিকটরীয়' গণতন্ত্রের অনুপযোগিতা সম্বন্ধে নেতাজীর সতর্ক বাণী সম্বন্ধে ভারতীয় নেতৃত্ব দৃষ্টি দেয়নি।

সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রই ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জনক। দেশরক্ষা ভিত্তিক শিল্পায়ন, দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার নিরসন, শিক্ষার প্রসার এবং কৃষি উন্নয়নের নির্দেশ দিয়ে নেতাজী জাতীয় পরিকল্পনার মৌলিক লক্ষ্যের যে ক্রম নির্ণয় করেন সেদিকে দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাষ্ট্র নায়কেরা। আজ একথা ভাবতেও বিস্মিত হতে হয় যে, কি দূরদৃষ্টিতে নেতাজী ১৯৪৪ সালে তাঁর টোকিও ভাষণে বলেছিলেন যে "যে-মুহূর্তে ভারত স্বাধীন হবে সেই সময় থেকেই ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতাকে সংরক্ষিত করার এবং আমাদের জাতীয় সুরক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য আমাদের আধুনিক

সমর শিল্প গড়ে তুলতে হবে যাতে আমাদের আত্মরক্ষার জন্য আমরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে পারি। এর অর্থ হলো আমাদের বৃহৎ শিল্পায়নের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।" ১৯৬২ সালে চীনের হাতে ধাক্কা খেয়ে ভারতের দেশরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে চৈতন্য আসে কিন্তু নেতাজী ভাবী স্বাধীন ভারতকে এ সম্বন্ধে সতর্ক করে দেন তারও বিশ বছর আগে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগেও নেতাজী নেহরুর পররাষ্ট্রনীতির বিরোধী ছিলেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত কি অদ্ভুত স্বচ্ছতার সঙ্গে অনুধাবন করেছিলেন নেতাজী! মুসলীম লীগ কর্তৃক পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণেরও তিন বছর আগে নেতাজী তাঁর হরিপুরা ভাষণে দেশবাসী ও কংগ্রেস নেতৃত্বকে সতর্ক করে দিয়ে এক বিস্তৃত বিশ্লেষণের সারাংশরূপে বলেন, "আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে বৃটিশের উদ্ভাবনী শক্তি ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করার কোন-না-কোন নিয়মতান্ত্রিক ফন্দী বের করবেই এবং এমনি করে ভারতবাসীদের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হবে তা নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।" যুদ্ধ-শেষে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহ, বৃটিশ ভারতীয় ফৌজের ধর্মঘট এবং জনতার সরকার-বিরোধী বিস্ফোরণ দেখে ভারতীয় নেতৃত্ব হকচকিয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু অজানার অন্ধকারে দ্বিতীয়বার ঝাঁপ দেবার আগে নেতাজী সুস্পষ্টকণ্ঠে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই "ভারতের অভ্যন্তরে যুদ্ধোত্তর বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবে।"

ভারতের জাতীয় স্বার্থই হবে ভারতের রাষ্ট্রনীতির মূল নিয়ামক এবং অন্য কোন দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক মতবাদ দ্বারা ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত না হতে দেওয়া,—এই দ্বয়ী মৌলের উপরে নেতাজী ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি প্রবর্তনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ভারত ত্যাগ করে প্রথমে রাশিয়ার সাহায্য নিতে চান। কিন্তু সেখানে ব্যর্থ হয়ে জার্মানীর সাহায্য নেন। কিন্তু

তিনি রুশ-জার্মান যুদ্ধে কোন পক্ষ গ্রহণ করতে রাজী হননি। তেমনি জার্মানী থেকে জাপানে এসে তিনি কখনও জাপানের চাপ সত্ত্বেও চীনের চিয়াংকাইশেক সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি। রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ কম্যুনিজম, জার্মানীর ফ্যাসীবাদ বা জাপানের সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা কখনও তিনি ভারতের জাতীয় স্বার্থ ও পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত হতে দেননি। তিনি হরিপুরা ভাষণে এই জাতীয়তাবাদী পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য নির্ণয় করে বলেন, "বৈদেশিক নীতি নির্ণয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ নীতি ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বরূপ যাই হোক না কেন আমরা যেন তা দ্বারা প্রভাবিত না হই। এ বিষয়ে রুশ কূটনীতি থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। রাশিয়া কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও সমাজবাদ-বিরোধী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সন্ধি করতে বা কোন দেশ থেকে সহানুভূতি ও সমর্থন পেতে দ্বিধাবোধ করে না।"

আজকের ভারতের রাষ্ট্রীয় ও দেশরক্ষার অনেক সঙ্কটের জন্যই দায়ী ভারতের অবাস্তব আন্তর্জাতীয়তাবাদী পররাষ্ট্রনীতি। নেতাজীর পররাষ্ট্রনীতি ভারতের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি,—তার সারবত্তা নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেনি।

স্বাধীন ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বিষয়ে নেতাজী অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্যই তিনি চেয়েছিলেন সামরিক অনুশাসনের বন্ধনে গঠিত একটি কেন্দ্রানুগ রাষ্ট্র। কিন্তু নীচের তলায় চেয়েছিলেন পঞ্চায়েতী গণতন্ত্র। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতির নীতি নির্ধারণের জন্য আজাদ হিন্দ্ সরকারের আমলে একটি "ন্যাশনাল ইউনিটি কমিটি" গঠন করেছিলেন। ভারতের জাতীয় পোশাক, ভাষা, সাম্প্রদায়িক সমন্বয় এবং অন্যান্য বিষয়ে এই কমিটি অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এই কমিটির দলিলগুলি দিল্লী সরকারের সংরক্ষণ বিভাগে রেখে দেওয়া হয়েছে আজও প্রকাশ করা হয়নি। নেতাজী ইংরেজী

ভাষা তুলে দেওয়ার কথা কখনও বলেননি; কিন্তু রোমান হরফে হিন্দুস্তানী ভাষা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপরে হরিপুরা ভাষণে এবং পরবর্তীকালে টোকিও ভাষণে জোর দিয়ে বলেছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজে তিনি রোমান হরফে হিন্দুস্তানী ভাষা প্রবর্তনও করেছিলেন। নেতাজী-নির্দিষ্ট রোমান হরফ গৃহীত হলে ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষার সমস্যা অনেকাংশে সমাধান লাভ করতো।

শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামেই নয়,—স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো তথা অর্থনীতি, দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি এবং জাতীয় সংহতির বিষয়ে নেতাজীর মৌলিক অবদান রয়েছে। নেতাজীর বীর্যবত্তার প্রতি শুধু শ্রদ্ধাতর্পণই নয়,—নতুন ভারত রচনায় নেতাজীর বৈপ্লবিক ভূমিকা এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শবাদের নতুন মূল্যায়ণ আজ ভারতের এক অপরিহার্য জাতীয় কর্তব্য। আমাদের দুর্ভাগ্য যে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় নেতাদের উপেক্ষা, অবহেলা ও ঔদাসীন্যের ফলে নেতাজীর মৌলিক চিন্তাধারা ও বৈপ্লবিক নেতৃত্বের অবদান আজও ভারতের প্রয়োজনে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়নি।

—বসুমতী

ভারত-বিচ্ছেদ বিরোধে নেতাজী সুভাষচন্দ্র

ভারত ভাগ ও এই বিভক্ত দেশ থেকে দুইটি ভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের উদ্ভবকে স্থায়ী স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্যই ১৫ই আগস্ট গান্ধীজী খণ্ডিত ভারতীয় স্বাধীনতার প্রথম দিনে কোন শুভেচ্ছাবাণী পাঠাননি বা 'জাতির পিতার' আসন লাভ করেও রাষ্ট্রীয় উৎসবে উপস্থিত থাকেননি,—বরং এই দুই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গতির কথা সন্ত্রস্তচিত্তে লক্ষ্য করে 'হরিজন' কাগজে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট লিখেছিলেন যে, "আজ ভারত দুইটি সশস্ত্র শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেলো।" তিনি এই ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন যে বিভাগের ঘটনা খানিকটা স্থিতি লাভ করলে তার অন্তিম আশ্রম গঠন করবেন পূর্ব বাংলার নোয়াখালিতে গিয়ে। কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি, ভারত ভাগের সময়ে এই বিভক্ত নীতির প্রচণ্ড বাধা না দেওয়ার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেন তিনি নিজের জীবন দিয়ে।

দেশ ভাগের সর্বনাশা চক্রান্তের লক্ষণ নেতাজী মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গ্রহণের প্রায় দু'বছর আগেই দেখতে পেয়েছিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ আঘাতের কুটিল গতি সম্বন্ধে তিনি তাই হরিপুরা কংগ্রেসের ভাষণেই দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে আপসরফাবাদ ও বোঝাপড়া নীতি তথা কমপ্রোমাইজ ও নিগোসিয়েশনের পলিসি ভারতের স্বাধীনতার

লক্ষ্যকেই বিপন্ন করে দেবে। তিনি এই ভাষণে ভবিষ্যৎদ্রষ্টার ন্যায় বলেন, "আমার কোন সন্দেহ নেই যে বৃটিশ ব্যবচ্ছেদ নীতির উদ্ভাবনী শক্তি ভারতবর্ষকে ভাগ করার কোন-না-কোন গঠনতান্ত্রিক ফন্দী বের করবেই এবং এমনি করে ভারতীয় জনতার হাতে যে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে তা আবার নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।" পাকিস্তান প্রস্তাব নিয়ে ওয়াভেলের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃবর্গ যখন আলোচনা করেন তখন নেতাজী অস্থির হয়ে এরূপ সর্বনাশের পথে পা না বাড়াবার জন্য নিষেধ করে ভারতীয় নেতাদের লক্ষ্য করে বলেন, "আপসরফার নামে দেশ ভাগ করে আপনারা সর্বনাশ করবেন না। যদি আর কোন সংগ্রাম করা আপনাদের পক্ষে সম্ভব না হয় তবুও আপনারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। যুদ্ধের পরে ভারত স্বাধীন হবেই এবং তা হবে অনতিবিলম্বে।"

নেতাজীর সতর্কবাণী বা গান্ধীজীর বিরোধিতাকে গ্রাহ্য না করে পরাজিত, পরিশ্রান্ত এবং আশু ক্ষমতাকাঙ্ক্ষার মনোবৃত্তিতে কংগ্রেস নেতৃত্ব ভারত ভাগের জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। তিনটি মিশ্র চিন্তার প্রক্রিয়ায় সে দিনে গড়ে ওঠে ভারত ভাগের মানসিকতা। একটি চিন্তা মনে করেছিল যে ভারত ভাগ হবে বিষে বিষক্ষয়ের কূটনৈতিক ট্যাকটিক্স মাত্র এবং এরূপ বিভক্তি হবে সাময়িক। দ্বিতীয় চিন্তা কার্যকরী হয় ভারতের বহুজাতিক জাতীয়তার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। তৃতীয় যুক্তি আসে শান্তি ও অহিংসার ঐতিহ্য রক্ষার আবেদন থেকে। ভারতের ন্যায় বিরাট দেশের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের চিন্তাধারা যে কত বিভ্রান্ত হতে পারে ভারত ভাগের মর্মান্তিকতা ও তার পরিণতি আমাদের ইতিহাসের কাছে তার এক শোচনীয় নিদর্শন।

১৯৪৭ সালের পনেরই আগস্ট নেহরু-প্যাটেল নেতৃত্ব ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রথম মুহূর্তে যে রাষ্ট্রীয় বাণী উচ্চারণ করেন তাতে ভারতের বিচ্ছিন্ন অংশ যা নতুন পাক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় সেই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের 'ভাই' আখ্যা দিয়ে এরূপ একটি অনুক্ত সঙ্কেত

তুলে ধরেন যে এই বিচ্ছেদ সাময়িক মাত্র। দেশ বিভাগের ফলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার যে সমাধান হয়নি এবং এরূপ সমস্যার সমাধান বিভাগের পথে যে সম্ভব নয়—সেকথা অকপটে কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বীকার করে বহুবার বলেন যে 'দেশ বিভাগ করা ভুল হয়েছে।' যে নেতৃত্ব ভারত ভাগ করেন পরবর্তীকালে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় দেখা যায় যে প্রত্যেকেই তাঁরা বিশ্বাস করেন যে ভারতবর্ষ আবার পুনর্মিলিত হবেই। কিন্তু ইতিহাসের ঘটনায় আজ একথা সুস্পষ্ট যে, যে ভারত ভাগকে সাময়িক ট্যাকটিক্স বলে গ্রহণ করা হয়েছিল তাই পরবর্তী নেতৃত্বের কাছে একটি স্থায়ী তাৎপর্য লাভ করেছে। যে নেতৃত্ব ভারত ভাগ করেছিল আজ তাঁদের প্রায় সবাই লোকান্তরিত এবং যাঁরা এখনও জীবিত রয়েছেন তাঁদের ভূমিকা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্তিত্বহীন। ভারতের নতুন রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের মনে যে স্থিত স্বার্থ-বোধ সৃষ্টি হয়েছে তাকে রক্ষা করবার আগ্রহে ভারতের পরবর্তী নেতৃত্বের কাছে ভারত ভাগ একটি স্থায়ী ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ভারতের নতুন নেতৃত্ব শুধু বিভক্ত ভারতের পুনর্মিলনই যে চায় না তাই নয়,—পুনর্মিলনের অবকাশ সৃষ্টি হলেও গ্রহণ করতেও তারা আর রাজী নয়। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের স্থিতস্বার্থকে রক্ষা করাই এখন তাদের প্রধান লক্ষ্য। বর্তমান ভারতীয় নেতৃত্বের এই দৃষ্টিভঙ্গী সাম্প্রতিক পাক-ভারত সংঘর্ষের ঘটনায় এমন নগ্নভাবে পরিস্ফুট হয়েছে যে এই সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এক বৃহত্তর সম্ভাবনার প্রাথমিক সূচনারূপে স্বাধীন পাখতুনীস্তান বা স্বাধীন পূর্ব বাংলার দাবীকে সামনে রেখে স্বাধীন কাশ্মীর গঠনের দাবীকে নিষ্ক্রিয় করার প্রয়োজনীয়তাবোধ পর্যন্ত এই নেতৃত্ব করেননি। তাই তাসখন্দে কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিন্তু একই গুরুত্ব ও সম-পর্যায়ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীন পাখ্‌তুনীস্তান ও স্বাধীন পূর্ব বাংলার দাবী সম্বন্ধে আলোচনা করার কোন উৎসাহবোধ করেননি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ।

ভারতকে যাঁরা বহু জাতিত্বের জাতিরূপে দেখেছেন সেই নেতৃত্বের মনে ভারতের বহুজাতিক একটি জাতির বিচ্ছেদে তেমন কোন মর্ম-যাতনা সৃষ্টি হয়নি। শ্রীনেহরু ভারতকে বহুজাতিক জাতি তথা 'মাল্টি ন্যাশনাল নেশন' বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু গান্ধীজী বা নেতাজী ভারতকে একটি অখণ্ড সত্তায় সমন্বিত জাতি,—যে জাতির সৃষ্টি হয়েছে ভারতের বহু শতাব্দীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অবদানে,—সেরূপ একটি মহাজাতিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাই গান্ধীজী ভারত ব্যবচ্ছেদের তুলনা দিয়েছিলেন 'নিজের জীবন্ত দেহের ব্যবচ্ছে-দের' সঙ্গে। নেতাজী ভারতকে বহুজাতিক জাতিরূপে কোন দিনই গ্রহণ করেননি। ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করে নেতাজী বহুবার বলেছেন, "মিশর বা ব্যাবিলন, ফোয়েনিশিয়া বা গ্রীসের ন্যায় ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতা মরে যায়নি। দুই বা তিন হাজার বছর আগে পূর্বপুরুষের মত আজও আমাদের জীবনে মূলতঃ একই চিন্তা, একই জীবনাদর্শ এবং একই অনুভূতির প্রভাব রয়েছে। অতীতকাল থেকে আজকের দিনেও ভারতবাসীর জীবনে একই ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত। এই ধারাবাহিকতা মানব ইতিহাসের একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য।" পাশ্চাত্য দেশে যে রাজ-নৈতিক জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে ভারতের জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য তার চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতভূমির অখণ্ডতাকে নেতাজী ভারতীয় জাতীয় সত্তা থেকে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করেছেন। সেজন্যই ভারতভাগের প্রস্তাব উত্থিত হলে নেতাজী ব্যাকুল চিত্তে বারবার রেঙ্গুণ ও সিঙ্গাপুর থেকে বেতার ভাষণে বলেছেন, "ভারতকে যদি বিখণ্ডিত করা হয় তা' হলে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা স্বাধীন ও অখণ্ড ভারতবর্ষের জন্য প্রাণপণ লড়াই করছি, ভারত ভাগ করে দেশকে খণ্ড খণ্ড করার সমস্ত প্রচেষ্টায় আমরা বাধা দেব। আয়ারল্যাণ্ড ও প্যালেস্টাইন আমাদের শিক্ষা

দিয়েছে, আমেরিকান পাকিস্তানীদের নিজেদের পথে চলতে দিলে আমেরিকা বর্তমান শ্রেষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হত না। ভারতের চেয়েও সোভিয়েট ইউনিয়ন অধিকতর সম্প্রদায় রয়েছে, তবুও তারা আজ ঐক্যবদ্ধ কেন? কারণ, তাঁদের বিদেশী প্রভুর কাছে মাথা নত করতে হয়নি।... আমাদের মাতৃভূমিকে খণ্ডিত করার পাকিস্তানী পরিকল্পনার আমি তীব্র বিরোধী। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমিকে খণ্ড করা কোন মতেই চলতে পারে না,—"আওয়ার ডিভাইন মাদারল্যাণ্ড শ্যাল নট বি কাট আপ।"

গান্ধীজীর নিষেধ এবং নেতাজীর আকুল আবেদন আশু ক্ষমতা-লাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় বেসামাল কংগ্রেস নেতৃত্ব গ্রাহ্য করার প্রয়োজন বোধ করেনি। সাম্প্রদায়িক নীতির ভিত্তিতে ভারতভাগ এবং সেকুলারিজমের আদর্শ এবং কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে ঘোষণা করা ও ভারতকে বহুজাতিক জাতিরূপে স্বীকার করা যে এক অসঙ্গত নীতি সেকথা ভারত বিখণ্ডনকারী নেতৃত্ব বা তাদের বর্তমান উত্তরাধিকারীরা গ্রাহ্য করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। এই অসঙ্গতির কী ভয়ানক মূল্য দিতে হয়েছে ও দিতে হচ্ছে এবং আরও দিতে হবে,—বর্তমান স্থিতস্বার্থপরায়ণ নেতৃত্বের কাছে তার মর্মান্তিকতার কোন মূল্য নেই।

আপসরফা ও বোঝাপড়ার পথে ভারতভাগের মাধ্যমে শান্তি ও অহিংসার এক মহান্ ঐতিহ্য স্থাপনের দৃষ্টান্ত নাকি ভারত সারা বিশ্বের কাছে সৃষ্টি করেছে,—এই বক্তব্য এখনও প্রতিবছরই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উচ্চমহল থেকে বিঘোষিত হচ্ছে। শান্তি ও অহিংসার আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তিস্থাপন করলেও শেষ পর্যন্ত নেতাজীর বৈপ্লবিক আঘাতই যে বৃটিশ ভারতীয় ফৌজের আনুগত্যের বুনিয়াদ বিচূর্ণ করে বৃটিশ শক্তিকে ভারত ত্যাগে বাধ্য করেছে,—ইতিহাসের এরূপ একটি অবিসংবাদী ঘটনা আজও ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অস্বীকৃত। যে বৃটিশেরা নেতাজীর নামোচ্চারণ

করতেও কুণ্ঠাবোধ করেছে এতকাল তারা আজ ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে অকপটে স্বীকার করছেন যে নেতাজীর বৈপ্লবিক আঘাতেই বৃটিশশক্তি ভারতত্যাগে বাধ্য হয়েছে।

নেতাজীর ইংরেজ জীবনী লেখক হিউ টয় লিখেছেন ঃ

"There can be little doubt that Indian National Army hastened the end of British Rule in India." বৃটিশ গ্রন্থকার এডোয়ার্ড 'The Last Years of British India' বইটিতে বলেছেন, "The British had not feared Gandhi, the reducer of violence, they no longer feared Nehru, who was rapidly assuming the linaments of civilised statesmanship,—even elder statesmanship. The British, however, feared Subhas Bose or rather, the violence he represented···It stoutly dawned upon the government of India that the backbone of British rule, the Indian Army, might now no longer be trustworthy. The ghost of Subhas Bose, like Hamlets' father, walked the battlements of the Red Fort and his suddenly amplified figure over-awed the conferences that were to lead independence."

রাষ্ট্রীয় বক্তব্যের চরম পক্ষপাতিত্ব এবং শান্তি ঐতিহ্যকে কৃত্রিমভাবে সর্বশ্রেষ্ঠতাদানের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আজ একথা ঐতিহাসিক সত্য যে গান্ধীজীর অবদান ভারতীয় স্বাধীনতার ভূমিকা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বৃটিশশক্তি ভারতত্যাগে বাধ্য হয়েছে নেতাজীর বৈপ্লবিক শেষ আঘাতে।

ভারতীয় স্বাধীনতা শান্তিপূর্ণ উপায়ের এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত-বলে যে দাবী করা হয় তাও যথার্থ ঐতিহাসিক নয়। পাক-ভারতের

দুইটি ভিন্ন রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলনের এক মাসের মধ্যেই, বৃটেনের সরকারী দলিল অনুযায়ী সমগ্র ভারতীয় উপ-মহাদেশের একমাত্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেই ছয় লক্ষ নিরীহ ও অসহায় মানুষ নিহত হয়েছে এবং এক লক্ষ নারী অপহৃত হয়েছে। অহিংস বিপ্লবের পথে পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ স্বাধীনতালাভ করেছে অথবা পৃথিবীতে যে সমস্ত বিপ্লব ঘটেছে তার একটিতেও এই সংখ্যার একটি ভগ্নাংশ জীবন হননের বীভৎস কাহিনীও লিপিবদ্ধ হয়নি। ভারতভাগের ফলে প্রায় দুই কোটি লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এরূপ বিপুল সংখ্যার বাস্তুত্যাগ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে সমগ্র বিশ্বেও ঘটেনি। গত আঠারো বছরে এই উপ-মহাদেশের বিভক্ত অংশে সংখ্যালঘুদের যে প্রাণহানি ঘটেছে এবং আরও রক্তাক্ত জীবন হননের যে ভয়াবহ সম্ভাবনা রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তিপূর্ণ ঐতিহ্যের দাবী ইতিহাসের কাছে এক উপহাসে পরিণত হয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতা, বাইরে ও ভিতর থেকে, আজ চরমভাবে সংকটাপন্ন। এই সংকটে যে ঐতিহ্য ও জাতীয় মানসিকতা ভারতে সংকট উত্তরণের শক্তি দিতে পারে তা' হলো নেতাজীর শক্তিবাদী ক্ষত্রিয় ঐতিহ্য। কিন্তু শান্তি ও অহিংসার ঐতিহ্য রক্ষার আতিশয্যে আজও নেতাজীর বীর্যময় মৌলিক ঐতিহ্য ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উপেক্ষিত। আরও প্রচণ্ড রক্ত, মৃত্যু ও ধ্বংসের সম্ভাবনাকে যদি রোধ করতে হয়, তা' হলে কিছু রক্তের মূল্য দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় সত্তা ও অখণ্ড স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠায় নেতাজীর আদর্শকে কার্যকরী করা ছাড়া ভারতের আর কোন দ্বিতীয় পথ নেই। কিন্তু এই পথ অনুসরণে ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রীয় স্থিতস্বার্থ ভীত ও সন্ত্রস্ত।

—বসুমতী

আজাদ হিন্দ্ তীর্থে

সিংগারপুর, মানে ভারতীয়দের দেওয়া নাম সিংহপুর—যুদ্ধকালের সোনান। তিব্বতের সমস্যা নিয়ে সিংগাপুরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না আমার। কারণ, এগার লক্ষ লোকের এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি তখনও পররাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পায়নি। কিন্তু সিংগাপুরের ছিল আকর্ষণ অন্যদিক থেকে। সিংগাপুর ছিল নেতাজীর হেডকোয়ার্টার, —আজাদ হিন্দ্ সংগ্রামেব মর্মকেন্দ্র। এই মর্মকেন্দ্র থেকে শুধু ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়নি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি পরাধীন দেশ বৈপ্লবিক প্রেরণা লাভ করেছে সিংগাপুরের এই আজাদ হিন্দ্ তীর্থ থেকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সদ্যস্বাধীন প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা সেকথা অকপটে বলেছেন আমাকে। সিংগাপুরে গিয়েছিলাম আমি আজাদ হিন্দ্ তীর্থের সেই পবিত্রমাটিটুকু স্পর্শ করার জন্য, নেতাজীর কীর্তিস্থানগুলি দেখবার জন্য।

চলছি আমরা সিটি কাউন্সিলের দিকে। আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রাক্তন উচ্চপদস্থ অফিসার শ্রীরামানুজম রয়েছেন সঙ্গে। আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলছেন তিনি বিগত দিনের কথা : ভারতীয়েরা সেদিনে কিংকর্তব্যবিমূঢ়! রাসবিহারী বোসের উপরে ভারতীয়েরা পূর্ণভাবে নির্ভর করতে পারছে না। জাপানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে ভারতীয়দের মন তাঁকে পেয়েও প্রাণভরে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত।

প্রথম আজাদ হিন্দের অধিনায়ক মোহন সিং তখন কারারুদ্ধ। পরবর্তীকালে যাঁরা নেতাজীর মন্ত্রিসভা ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই তখনও 'প্রো-বৃটিশ'। এমনি দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝে ভারত মহাসাগরের বুক চিরে এসে উদয় হলেন নেতাজী। সিংগাপুরের আকাশে আকস্মিক যেন এক জ্বলন্ত সূর্যের আবির্ভাব হলো। একদিনের মধ্যেই সমস্ত সিংগাপুরে নতুন প্রাণস্পন্দন শুরু হলো। যেন নতুন উদ্দীপনার ঢেউ উঠলো।

মোটর চল্‌ছে। সেদিনের জমানো স্মৃতি যেন জোয়ারের বেগে বেরিয়ে আসছে রামানুজমের কণ্ঠ থেকে : প্রথম জনসভা। নেতাজী বলবেন ভারতীয়দের কাছে। কিন্তু সুরুতেই এক বিঘ্ন ঘটল। জনসভা বা বেতারে আজাদ হিন্দের বা বর্মা সরকারের লোকেরা যে ভাষণ দিতেন জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষের সেন্সারের জন্য আগে তার নকল পাঠাতে হতো। এই ছিল জাপ সামরিক শাসনের অনুশাসন। সেই নীতি অনুযায়ী এক উচ্চপদস্থ জাপ অফিসার এলেন নেতাজীর কাছে। নেতাজীর ভাষণের অগ্রিম লিপির জন্য। অফিসারটি জানালেন : চন্দর বোসের ভাষণের লিপি সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।

ভাষণের অনুমোদন এবং অগ্রিম লিপির কথা শুনে নেতাজীর শুভ্র চোখে-মুখে যেন আগুনের হল্‌কা বয়ে গেল। তাঁর তপ্ত কণ্ঠ থেকে নিক্ষিপ্ত হলো যেন একটি অগ্নিগোলা—'হোয়াট !'

মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সংযত করে জাপ অফিসারটিকে শান্ত কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন—'ভাষণ সেন্সারের প্রয়োজন জাপানী অফিসার বা নেতাদের জন্য,—আজাদ হিন্দ্ সরকারের জন্য নয়। আজাদ হিন্দ্ সংক্রান্ত কোন্ ভাষণ সেন্সার করা হবে না হবে—সে নীতি আজাদ হিন্দ্ সরকারই স্থির করবেন।' রামানুজম জানালেন : সেই থেকে আজাদ হিন্দের ক্ষেত্রে সেন্সারের প্রশ্ন উঠে গেল। চলতে চলতে তিনি আরও বললেন যে এই ঘটনাটি জানাজানি

হয়ে গেল ভারতীয় মহলে। যেন বিত্যুতের স্পর্শ লাগল ভারতীয়দের মনে। নেতাজীর নেতৃত্ব এবং আজাদ হিন্দের স্বাধীন সত্তা সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেল। মহাবিপ্লবীর চুম্বকাকর্ষণে উন্মুখ হয়ে উঠল সিংগাপুর ও মালয়ে ভারতীয় মন।

রামানুজমের কথা শুনতে শুনতে মন্ত্রমুগ্ধের মত এসে গেলাম সিটি কাউন্সিলের পাদদেশে। বিরাট অট্টালিকা। যুদ্ধকালে এই অট্টালিকা ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাপ সরকারের হেডকোয়ার্টার। এখন সিংগাপুর সরকার ও বৃটিশ সরকারের সেক্রেটারিয়েট। সিটি কাউন্সিলের দক্ষিণে উন্মুক্ত ময়দান। তার দক্ষিণে সমুদ্র। রামানুজম সিটি কাউন্সিলের পাদদেশে উঠে দেখালেন: এখানে রচিত হয়েছিল নেতাজীর মঞ্চ। মঞ্চের সামনে সেদিনে অগণিত জনতা। শুধু লহরীর পর মানুষের লহরী। নেতাজী বলে চলেছেন। সেই তাঁর প্রথম ভাষণ। নেতাজী বলছেন না তো যেন শুনছি আমরা সিংহের গর্জন। স্থির হয়ে গেছে জনতার লহরী। মাঝে মাঝে উঠছে শুধু 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'। নেতাজী বলছেন: 'আমায় রক্ত দাও, আমি স্বাধীনতা দেব।' মৃত্যুর নির্মম আহ্বানও যে নবজীবনের এমন পরম আমন্ত্রণ জানাতে পারে,—এমন কথা এর আগে শোনেনি কেউ। একটু একটু করে বৃষ্টি হচ্ছিল। কত সময় যে পার হয়ে গেল, কোন চাঞ্চল্য নেই জনসমুদ্রে। কে একজন গিয়ে ছাতা ধরেছিল নেতাজীর মাথায়। নেতাজীর সরোষ নেত্রের ইংগিতে ছাতা আপনি বন্ধ হয়ে গেল।

সিটি কাউন্সিলের ময়দানটি দেখিয়ে রামানুজম বল্লেন: সেদিন তো এখানে জনসভা হল না যেন ভারতীয় জনতার পুনর্জন্ম হলো।

সিটি কাউন্সিল থেকে চললাম শহরের দিকে। মোটর থামল এসে 'ক্যাথে হোটেলে'র সামনে। রামানুজম দেখালেন: এর তেতলায় ছিল আজাদ হিন্দের ব্রডকাস্টিং স্টেশন। নিচে এখন দেখছেন ওই যে সিনেমা 'হল' ওখানেই ১৯৪৩ সালের ২১শে অকটোবর নেতাজী আজাদ হিন্দের ঘোষণা-পত্র পাঠ করেন।

ক্যাথে হোটেল সিংগাপুরের অন্যতম বৃহৎ হোটেল। ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার পথে একরাত্রি ছিলাম এই হোটেলে! যে ঘর ছিল ব্রডকাস্টিং স্টেশন সে ঘরেই হয়তো ছিলাম, জানা ছিল না সেকথা। আজ ক্যাথে হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল ওই ঘরটিতে একরাত্রি কাটিয়ে আমি যেন এক কত পুণ্য অর্জন করেছি!

সিনেমা হলের ভিতরে গেলাম। রামানুজম জানালেন: সেদিন হলে উপস্থিত ছিলেন শুধু নিমন্ত্রিতেরা। অক্ষশক্তির বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক দূতেরা, আজাদ হিন্দের মন্ত্রী ও সেনাপতি, জাপ সরকারের বিশিষ্ট প্রতিনিধিবর্গ। মঞ্চের সামনে দণ্ডায়মান আজাদ হিন্দের অফিসারেরা। পিছনে ভারতবর্ষের একটি সুসজ্জিত মানচিত্র এবং গান্ধীজীর প্রতিকৃতি। সামরিক অধিনায়কের সজ্জায় নেতাজী হাতে নিলেন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। স্থির, অচঞ্চল, তীক্ষ্ণ কৃপাণের মত তাঁর ঋজুমূর্তি। সূচীপতনের শব্দও বুঝি শোনা যায়,—এমন গুরু-গম্ভীর পরিবেশ। জাতীয় সঙ্গীতের পরেই জাতীয় স্বাধীনতার ঘোষণা। নেতাজী পড়লেন,—পড়ছেন না তো যেন মহানায়কের কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হচ্ছে স্বাধীনতার সূর্য-শপথ। হঠাৎ যেন কি হলো, স্তব্ধ হয়ে গেল নেতাজীর কণ্ঠ। সবাই পরম বিস্ময়ে চেয়ে দেখছেন নেতাজীর সমস্ত দেহ বার বার কেঁপে উঠছে,—দুচোখ দিয়ে বয়ে চলছে অশ্রুধারা। শহীদের স্মরণে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের শপথ নিচ্ছেন নেতাজী।……

যেন এখনই ঘটল সেই ঘটনাটি এমনি করে বলে চলছেন রামানুজম। চঞ্চল, অফুরন্ত-বাক্ রামানুজম,—সেও বলতে বলতে নির্বাক হয়ে গেল। দেখি, ওর দুচোখ গড়িয়ে পড়ছে মুক্তার মত জলবিন্দু। তদ্গত কণ্ঠে রামানুজম বললেন: সে দিন আমাদের মনে হলো—রাজনীতি যেন রাজনীতি নয়, বিপ্লব যেন সংঘাত ও রক্তপাত নয়—এ যেন এক পরম আধ্যাত্মিক সাধনা!

এবার যাব আজাদ হিন্দ্ সরকারের হেডকোয়ার্টার দেখতে

ক্যাথে হোটেল থেকে বেরিয়েই সামনেই একটি মাঠ। মাঠের এক-দিকে কতকগুলি ঘর। রামানুজম ঘরগুলিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন: এখানে ছিল আজাদ হিন্দের সিংগাপুর বাহিনীর হেড কোয়ার্টার। আর ওই যে মাঠটা দেখছেন এখন, ওখানে ছিল ঝাঁন্সী বাহিনীর হেড কোয়ার্টার ও ব্যারাক। সে সব ভেঙ্গে এখন খেলার মাঠ তৈরী করা হয়েছে।

আজাদ হিন্দের প্রধান দপ্তরগুলি ছিল ম্যাল্‌কম্ হিল এলাকায়। শহরের পশ্চিম দিকে। উঁচু নিচু পাহাড়ী এলাকা, বড় বড় গাছ-পালায় অনেকাংশ ঢাকা। বিপ্লবী বাহিনীর হেড কোয়ার্টারের পক্ষে উপযুক্ত স্থান। মোটর এসে ঢুকলো ম্যাল্‌কম্ হিল এলাকায়। সোচ্ছ্বাসে রামানুজম আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন: ওই যে হিলের মাথায় বাড়িটি দেখছেন,—ওটা ছিল আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মালয় হেড কোয়ার্টার, আর ওটা ছিল আজাদ হিন্দ্ দলের দপ্তর ও ব্যারাক। ওখান থেকেই স্পেশাল ক্যাডেট তৈরী করা হতো। ওগুলি অফিসারদের ব্যারাক এবং ওরই পাশের বাড়িটি ছিল সেনানীদের বাসগৃহ। এগুলি সব ইন্টেলিজেন্স, ট্রান্সপোর্ট, কমিউনিকেসন, প্রোপাগাণ্ডা দপ্তর। হ্যা, এই যে এই একতলা বাড়িটা দেখছেন এটা আমার সাপ্লাই অফিস। রামানুজম এমন করে বল্লেন যেন আজও আজাদ হিন্দের সেই দপ্তরগুলি তেমনি বহাল রয়েছে।

আজাদ হিন্দ্ সরকার ও ফৌজের বিভিন্ন অফিসগুলি দেখতে দেখতে গাড়ী এসে থামলো একটি বাড়ির সামনে। সাত নম্বর চ্যান্সারী রোডের একটি বাড়ী। বাংলো প্যাটার্নে গড়া। টালির ছাদ, চৌচালা। সামনে অনেকখানি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। এটাই ছিল আজাদ হিন্দ্ সরকারের হেড কোয়ার্টার,—নেতাজীর সেক্রেটারিয়েট। নামলাম গাড়ী থেকে। গেটের গায়ে একটি নোটিশ টাঙ্গানো আছে—'ফর সেল'। বাড়ির দারোয়ানও জানালে বাড়ির বর্তমান চীনা মালিক বাড়িটি বিক্রি করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বাড়িটি

খালি পড়ে আছে, দারোয়ান ভেবেছিল আমরা বুঝি বাড়ি ক্রয়েচ্ছুদের কেউ। বাড়ির ফটো নিতে দেখে বিস্মিত হলো, আরও আশ্চর্য হলো যখন শুনলো এটা ছিল আজাদ্ হিন্দ্ সরকারের হেড কোয়ার্টার।

ঘুরে ঘুরে দেখলাম ঘরগুলি। রামানুজম দেখাতে লাগলেন কোন্ ঘরটায় ছিল কোন্ মন্ত্রীর দপ্তর। একটা বড় ঘর দেখিয়ে বললো: ওটা ছিল আজাদ হিন্দ্ মন্ত্রিসভার বৈঠকের ঘর। পাশের ঘরটি ছিল নেতাজীর। ঢুকলাম গিয়ে সে ঘরটিতে। এখানেই বসতেন নেতাজী !স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সেই পুণ্য বেদী! আজ শুধু স্মৃতিটুকু পড়ে আছে। আর পড়ে আছে ছুটি শ্বেত পাথরের একটি গোল টেবিল। রামানুজম বললেন: এই টেবিল ছুটো সেদিনেও ছিল নেতাজীর ঘরে। হাত দিয়ে বুলিয়ে বুলিয়ে যেন নেতাজীর স্পর্শ অনুভব করার চেষ্টা করলো রামানুজম, সহযাত্রীও।

নিস্পন্দ হয়ে যেন কোন্ হিমেল বেদনায় অসাড় হয়ে গেল মনটা। আমাদেরই ভারতবর্ষ, ভারতবাসী, ভারত সরকার! স্বাধীনতা সংগ্রামের এই অমূল্য তীর্থের স্মৃতিটুকু রক্ষা করার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ নেই কারো!

রামানুজমের বাসায় চা' খাওয়ার কথা ছিল। সেখান থেকে যাব নেতাজীর বাস-ভবন দেখতে। চায়ের টেবিলে বসিয়ে সিল্কের রুমাল দিয়ে জড়ান এক জোড়া কাপ-প্লেট বের করতে লাগল রামানুজম। কাপ-প্লেট রাখার এমন পরিপাট্য দেখে বিস্মিত হলাম। কিন্তু বিস্ময় এক মুহূর্তেই বিগলিত হয়ে গেল পরম শ্রদ্ধায় যখন রামানুজম জানালেন: 'এই কাপ-প্লেটে নেতাজী চা খেতেন'। একটি কলিং বেলও দেখলাম। এটা ছিল নেতাজীর অফিসের। কিছু নয়,—ছুটি সামান্য জিনিস মাত্র! মহানায়কের অমূল্য স্পর্শে তাই অমূল্য হয়ে স্থান পেয়েছে রামানুজমের ঘরে।

মালয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রী এ. এন. মিত্র, আজাদ হিন্দ্‌ সরকারের আজাদ হিন্দ্‌ দৈনিকের সম্পাদক শ্রীমথু কৃষ্ণান, রামানুজম এবং—শোয়ার সময় নেতাজীকে প্রতিদিন যে ব্যক্তি ম্যাসেজ করে দিত সেই কানাই—এঁরা সবাই আছেন সঙ্গে। মোটর থেকে নামলাম দশ নম্বর মেয়ার রোডে। সামনে একটি বাংলো একেবারে সমুদ্রের কোল ঘেঁষে। বাংলোর সামনে দুটি গেট, কয়েকটি ঝাউ গাছ, এক পাশে বাগান, বেশ বড় প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, পূর্বে পশ্চিমে দু' সারি ঘর। এঘরে থাকতেন নেতাজীর পার্সোনাল স্টাপ। বাংলোটি দোতলা। খুব পুরু কংক্রিটে তৈরী। ছাদটি চৌচালা। দক্ষিণে সমুদ্রের দিকেও রয়েছে অনেকখানি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। তার পরেই নীল সমুদ্র। দূরে ভেসে রয়েছে অগণিত জাহাজ ও নৌকো। তার পরে থরে থরে সাজান অনেক গিরিদ্বীপমালা। মনোরম স্থানে একটি সাধারণ অথচ আকর্ষণীয় গৃহ।

কানাই আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন: পশ্চিম পাশের ওই ঘরটিতে থাকতেন নেতাজী। সমুদ্রের তীরে আছে কয়েকটি শ্বেত পাথরের কেদারা। কানাই বললেন: নেতাজী এখানে এসে বসতেন। মন্ত্রীরা এবং আজাদ হিন্দের নেতৃবর্গ ও সেনাপতিরাও আসতেন। নেতাজীর বাসভবনের উত্তর পাশে ছিল নেতাজীর সিকিউরিটি বিভাগের কোয়ার্টার।

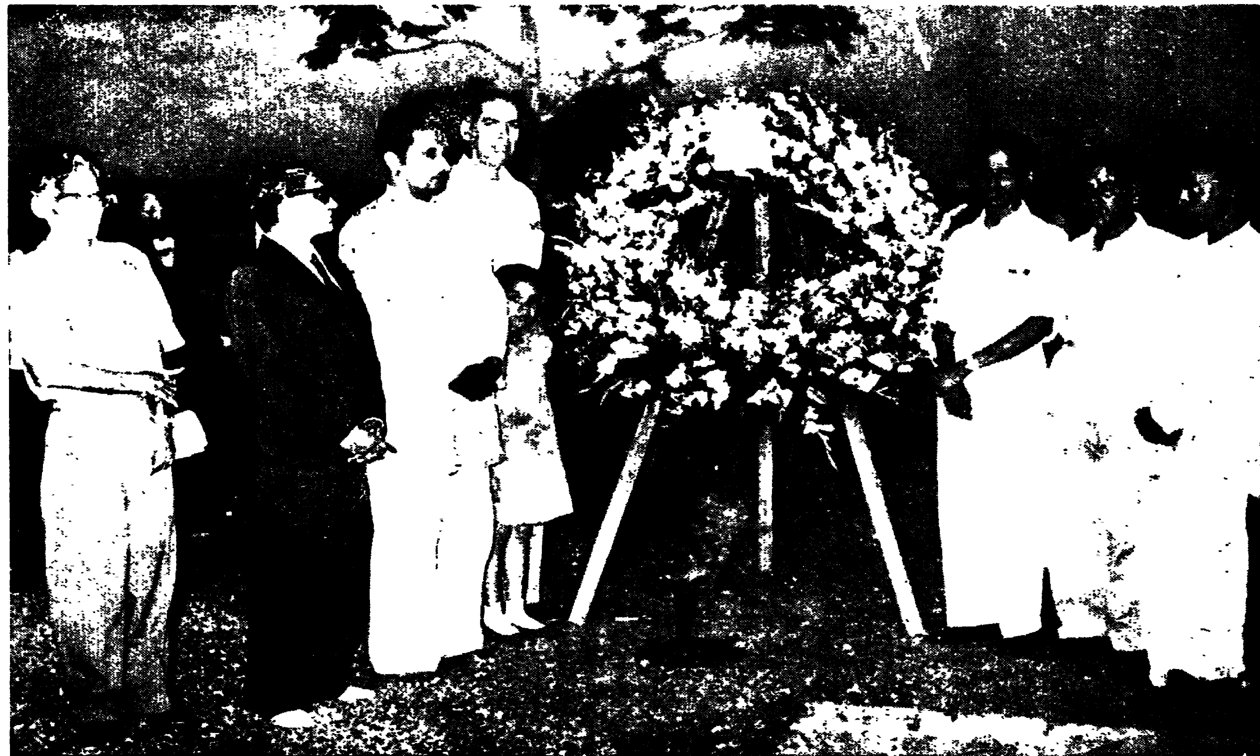
.. কানাই আরও বললেন: নেতাজী রাত একটা কি দুটায় শুতেন, আবার ভোর পাঁচটায়ই উঠে পড়তেন। ঘুমাবার আগে প্রতিদিন আমি গা-মাথা টিপে দিতাম। সেদিন নেতাজী বললেন: কানাই আজ থাক। যেন বড় গম্ভীর চিন্তাক্লিষ্ট দেখলাম নেতাজীকে। খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে প্রতিদিনই কিছুক্ষণ তিনি গীতা ও চণ্ডী পাঠ করতেন। সেদিনেও তাই করলেন। চা খেয়ে ঘর থেকে বেরোবার আগে ঘরে ঝুলান তরোয়ালটি নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। এই তরোয়ালটি সম্রাট্ হিরোহিতো দিয়েছিলেন নেতাজীকে। সিঁড়ি

দিয়ে নামবার সময় বারকয়েক পিছনের দিকে চাইলেন নেতাজী। যথারীতি গার্ড অব অনার দেওয়া হলো। অফিসার ও কর্মচারীদের সবাইকার সঙ্গে অত্যন্ত সস্নেহে কথা বললেন। মোটরে উঠবার আগে আবার ফিরে তাকালেন বাড়িটির দিকে। সেদিন আমরা কিছুই বুঝিনি। কারণ, নেতাজীর গতিবিধি ছিল গোপনীয়। সেদিন ভাবতেও পারিনি তিনি আর ফিরে আসবেন না। যদি জানতাম! কানাইয়ের গলার স্বর ভেঙ্গে পড়লো। শুধু কানাই নয়। সবাই বাক্ হারা। চোখের দৃষ্টি বাষ্পে আচ্ছন্ন।

বাড়িটি কিনেছেন এক ধনী চীনা। সেদিন ছিল দীপাবলী। বোধহয় বৌদ্ধদেরও কোন পার্বণ হবে। বাড়ির সামনে জ্বালানো ছিল একটি হোমানল। গৃহস্বামীর কন্যা তাতে আহূতি দিচ্ছিলেন পুষ্প-গন্ধ। তারই সুগন্ধ শিখার উত্তাপ এসে লাগল আমাদের চোখে-মুখে। যেন ওই আলোর লহরী বলে গেল : অমর আত্মার প্রাণশিখা নিঃশেষ হয় না কোন দিন, কোন কালেও!

বিকেলে গেলাম ভারতীয়দের এক সভায়। আজাদ হিন্দ্ ভবন এবং নেতাজীর বাসভবনটি কেনার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হলো। সেই সঙ্গে দাবী করা হলো আজাদ হিন্দ্ শহীদ স্তম্ভটি পুনর্নির্মাণের। এই দাবীগুলি পূরণের জন্য শ্রীএ.এন. মিত্রকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি হলো। সভা শেষহওয়ার আগে জানালাম : যে জায়গাটিতে শহীদ স্তম্ভ ছিল কাল বিকেলে সে স্থানটিতে মালা দেব। কথাটি শুনে চকিত হলেন সবাই। কিছুক্ষণ পরেই বুঝলাম এই চাঞ্চল্য সরকারী প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায়।

শহীদ স্তম্ভে মাল্য অর্পণের অনুষ্ঠানের নোটিশ ছাপাবার জন্য গেলান 'স্টেট টাইমস' কাগজের অফিসে। বিলিতি কাগজ, নোটিশ ছাপাতে অস্বীকার করলো। পরের দিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করলাম। তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। শুধু তাই নয়



সিঙ্গাপুরে নেতাজী কর্তৃক নির্মিত যে আজাদ-হিন্দ স্মৃতিস্তম্ভটি লর্ড মাউন্টব্যাটেন বিধ্বস্ত করে সেই স্থানে সর্বপ্রথম লেখক কর্তৃক মাল্যদান

প্রধানমন্ত্রীর পলিটিক্যাল সেক্রেটারী জানালেন : বাইরে থেকে কেউ এসে এখানকার পলিটিকস্ নিয়ে 'প্লে' করে—এটা সিঙ্গাপুর সরকারের ইচ্ছে নয়। উত্তরে জানালাম : শহীদ স্তম্ভটি শুধু ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক নয়,—সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল স্মারণিক। যদি এই শহীদ স্তম্ভের স্থানটিতে শ্রদ্ধাতর্পণ না করি তা'হলে কর্তব্যের চরম অবহেলা করব আমি।

মাল্য অর্পণের প্রয়াসে বারণ করলেন কেউ কেউ। বললেন অঘটন কিছু ঘটতে পারে। কথাটি কেড়ে নিয়ে হেসে উত্তর দিলাম : মানে গ্রেপ্তার করতে পারে। এই তো! এরপর আর কিছু বললেন না কেউ।

সংবাদপত্রে না বেরুলেও কথাটি জানানানি হয়ে গেছে। সমুদ্র সৈকতে বেশ ভীড় হয়েছে। শহীদ স্তম্ভটি ছিল সিটি কাউন্সিলের ঠিক উল্টো দিকে, সমুদ্রের ধারে। প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত বৃটিশ সেনাদের একটি স্মৃতি স্তম্ভ আছে, তারই পশ্চিমে ছিল আজাদ হিন্দ্ শহীদ স্তম্ভটি! বৃটিশ সেনারা যে দিনে অবতরণ করে সিঙ্গাপুরে তার তিন দিন পর মাউন্টব্যাটানের হুকুমে কামান দাগিয়ে ধ্বংস করে ফেলা হয় শহীদ স্তম্ভটি। সে ভগ্ন স্তূপের উপরেই প্রতি মাসের একুশে তারিখে—যে তারিখে নেতাজী জাতীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন—ভারতীয়দের কেউ কেউ ফুল দিয়ে যেতেন। কিন্তু শহীদ স্তম্ভটি পুনর্নির্মাণের কোন প্রয়াসই আর হয়নি।

ঠিক কোন্ জায়গায় শহীদ স্তম্ভটি ছিল সেই স্থানটি স্থির করা মুস্কিল হলো। অনেকে অনেক কথা বললেন। পনের বছর পরে আজ নির্দিষ্ট স্থানটি খুঁজে পাওয়াও কি সহজ! ভীড় থেকে বেরিয়ে এলেন একজন দক্ষিণ ভারতীয়। দেখিয়ে দিলেন স্তম্ভের স্থানটি। আজও প্রতি মাসের একুশে কিছু ফুল রেখে যান তিনি এই স্থানটিতে।

সমুদ্র সৈকতের সেই বিস্মৃত স্থানটির বুকে রাখা হলো মালাটি—যত ভাল ফুল ছিল সিংগাপুরে তাই দিয়ে বেশ বড় করে গাঁথা। দীপ জ্বালিয়ে, ধূপ জ্বালান হলো। নীরবে নত শিরে দাঁড়ালেন সবাই। শহীদের স্মরণে শ্রদ্ধাতর্পণ! সমবেত সবাই স্বল্প ভাষণে শপথ নিলেন: শহীদদের প্রতি জাতীয় ঋণ পরিশোধে প্রয়াসী হবেন ভুলবেন না এই শপথ!

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। সমুদ্রের বুকে কত জাহাজের অজস্র দীপমালা। তারই আলোয় চকচক করে উঠছে চঞ্চল সমুদ্র তরঙ্গ। যেন শত শহীদের আত্মা হাতছানি দিয়ে আশ্বাস দিচ্ছে আমাদের।

ভোরে উঠলাম বিমানে। তাকিয়ে দেখলাম নিচের দিকে। ছোট্ট একটি গিরিদ্বীপ। মনে হলো এ যেন দ্বীপ নয়, যেন সমগ্র এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি রক্ততিলক। বিমান চলছে। নিচে সমুদ্র, উপরে আকাশ। বারবার মনে হচ্ছে এমনি এক প্রভাতে নেতাজী যাত্রা করেছিলেন এক অজানার উদ্দেশে। সেই যে গেলেন আজো ফিরে এলেন না! কিন্তু কোথায় গেল সেই বিমান! আজো সে রহস্যের পূর্ণ সন্ধান হলো না। কত বছর পরে অনুসন্ধান হলো, তা'ও না হওয়ারই মত। নেতাজী ও আজাদ হিন্দের কত ঐতিহ্য ছড়িয়ে পড়ে আছে সিংগাপুরে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আরও কত জায়গায়। একবারও মনে হলো না ভারত সরকারের—এই পরম স্মারণিকগুলি রক্ষা করার কথা! ভারতপথিক কোথায় গেলেন তন্নতন্ন করে তার সন্ধান নেওয়ার কোন আগ্রহ হলো না ভারত সরকারের। যুগোত্তর যে মহাবিপ্লবীর অভ্যুদয়ে ভারতবর্ষ ধন্য হয়েছে, ভারতের জাতীয় জীবন উজ্জ্বল হয়েছে,—তাঁর প্রতি এমন চরম অবহেলা, তাঁর স্মরণীয় ঐতিহ্যের প্রতি এমন উপেক্ষা! ইতিহাস কি ক্ষমা করবে আমাদের সরকারকে, এযুগের আমাদিগকে?

—জয়শ্রী

জীবন-দর্শন

নেতাজী কি কোন রাজনৈতিক দর্শনের অনুসারী? কারো কারো মতে নেতাজীর কোন রাজনৈতিক মতবাদ নেই,—তিনি একজন চরমপন্থী বামমার্গী জাতীয়তাবাদী এবং 'প্র্যাগম্যাটিস্ট' বিপ্লবী। কেউ কেউ বলেন, নেতাজী ফ্যাসীবাদে বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে কোন কোন মহলের অভিমতে নেতাজী একজন মার্কস্‌বাসী।

নেতাজীর কোন দার্শনিক মতবাদ নেই একথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। নেতাজী ফ্যাসীবাদ বা মার্কস্‌বাদ —এরূপ কোন একপেশে একতন্ত্রী মতবাদের সমর্থক নন। কোন একটি মতবাদকে নেতাজী অখণ্ড, অভ্রান্ত বা পূর্ণাঙ্গ বলে মনে করেননি বলেই নেতাজীর মতবাদ সম্বন্ধে এরূপ বিভ্রান্তি।

নেতাজী সমন্বয়বাদী দর্শনে বিশ্বাসী। ভারতের সমন্বয়বাদী ইতিহাস, ভারতীয় জীবনবোধের আধ্যাত্মিক প্রমূল্য এবং বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ,—এই ত্রয়ী প্রমূল্যের ভিত্তিতে তিনি যে জীবন-দর্শনের কল্পনা করেছেন এবং যে দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি নিজের রাজনৈতিক মতবাদের বিভিন্ন কাঠামো রচনা করেছেন 'নেতাজীর জীবন-দর্শন' ও 'নেতাজীর জীবন-মানস' এবং অন্যান্য প্রবন্ধ দুইটি তারই দার্শনিক সমীক্ষণ। বহু রাজনৈতিক বিতর্ক ও বিবাদের পরে আজ ভারতের জাতীয় জীবনে নেতাজীর ভারতীয় সমাজবাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গী ও বক্তব্য স্বীকৃতি লাভ করেছে।

নেতাজীর জীবন-দর্শন

নেতাজী বীর ও বিপ্লবী। দুর্নিবার সংগ্রামের দুরূহ যাত্রাপথে তাঁর আত্ম-বিকাশ। শিবাজীর পরে ভারতীয় ইতিহাসে এমনি আর একটি সাগ্নিক জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়নি। জর্জ ওয়াশিংটন, গ্যারিবল্ডি, সান ইয়াৎ সেন ও লেনিনের মত নেতাজীর জীবনগাথাও ভাবী সংগ্রামীদের মনে যুগে যুগে জাগাবে শত বাধাবন্ধনকে আগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলার দুর্বার প্রেরণা। কিন্তু নেতাজীর জীবন কি শুধু বীরত্বেরই কাহিনী? রাজনৈতিক স্বাধীনতাই কি ছিল নেতাজীর একমাত্র কাম্য? নেতাজীর কার্যোদ্যমের পিছনে কি কোন জীবন-দর্শনের উৎস ছিল না?

নেতাজীর রাজনৈতিক দর্শন

১৯৪৪ সালের টোকিও বক্তৃতায় নেতাজী বলেছেন: "আমাদের রাজনৈতিক দর্শন কি? এ প্রশ্ন সম্বন্ধে 'ভারতীয় সংগ্রাম' নামক বইটিতে আমার মত প্রকাশ করেছি। ভারতে আমাদের এমন একটি বিধান গড়ে তুলতে হবে, যা হবে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের প্রচলিত বিধানের সমন্বয় (synthesis)।" ১৯৩৪ সালে ফ্যাসীবাদ ও নাৎসী-বাদের সম্পর্শে এসে তিনি এই সমন্বয়ের দৃষ্টি লাভ করেননি। ১৯২৭ সালে মান্দালয় জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি যত ভাষণ দিয়েছেন

তার প্রত্যেকটির মধ্যে একটি সমন্বয়ী জীবন-দর্শনের সুস্পষ্ট সুর ছিল। ১৯২৯ সালে 'অমরাবতী ভাষণ,' ১৯৩৫ সালের "ভারতীয় সংগ্রাম" পুস্তক এবং ১৯৪৪ সালের টোকিও বক্তৃতা—অর্থাৎ নেতাজীর রাজনৈতিক জীবনের তিনটি বিশিষ্ট অধ্যায়ের প্রতিটি অভিব্যক্তিতেই তাঁর সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী অব্যহত ছিল।

নেতাজীর এই সমন্বয়ের অর্থ কি? একি শুধু একজন দুর্জয় বিপ্লবীর একটি প্রক্ষিপ্ত মতবাদ? না, নানা মুনির নানামতের মধ্যে জোড়াতালি দিয়ে বিপরীতমুখী মতবাদ সামঞ্জস্য বিধানের একটি প্রচেষ্টা মাত্র?

ভারতীয় ইতিহাসের শিক্ষা

নেতাজীর সমন্বয়ী মতবাদ কোন সাময়িক প্রয়োজনে বা প্রক্ষীপ্ত অভিমতের উৎসে জন্মলাভ করেনি। ভারতীয় ইতিহাসের পটভূমিতে গভীর দার্শনিক চিন্তাধারার পর্যালোচনা করেই তিনি এই সমন্বয়ী জীবন-দর্শনের সন্ধান লাভ করেছেন। নেতাজী অনেক স্থানে বলেছেন—"ভারতের একটা মিশন আছে'।" এ শুধু একজন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীর ভাবাবেগের কথা নয়। মানবইতিহাসের পর্যালোচনা করে নেতাজী দেখেছেন: "মিশর বা ব্যাবিলন, ফোয়েনিশিয়া বা গ্রীসের মত ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতা মরে যায়নি। অতীত কাল থেকে আজকের দিনেও ভারতবাসীর জীবনে ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। এরূপ ধারাবাহিকতা মানব-ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবনের বিষয়।" (টোকিও বক্তৃতা)

কেন ভারতীয় ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রইলো? এর কারণ অনুসন্ধান করে নেতাজী অনুভব করেছেন: যুগে যুগে গ্রহণ-বর্জন করে ভারতীয় ইতিহাস নতুন সমন্বয়ের সন্ধানলাভ করতে সক্ষম হয়েছে। নেতাজীর কাছে এই সমন্বয়ের শিক্ষাই 'ভারতের বাণী'—মিশন অব ইণ্ডিয়া।

সমন্বয়ের দার্শনিক উৎস

ইতিহাসের শিক্ষাই নয় শুধু, সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের পিছনে একটি সুগভীর দার্শনিক পর্যালোচনাও রয়েছে নেতাজীর। নেতাজী মানবইতিহাসের নিরন্তর প্রগতিতে বিশ্বাস করেন। ইতিহাস যুগ হতে যুগান্তরে এগিয়ে চলেছে এবং চলবেও। অন্য কথায়, মানব-জীবনের গতিকে বুঝতে হলে বিবর্তনবাদকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ইতিহাসের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি বা বিশ্ব-সত্তার পরিপূর্ণ পরিচয় লাভ কি সম্ভব? নেতাজী বলেন, "সত্যের কোন সাধারণ বা সর্বযুগীয় পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। সত্য আপেক্ষিক,—এই আপেক্ষিকতা কাল এবং সত্যানুসন্ধানীর মানসিক সংগঠনের উপর নির্ভরশীল।" কিন্তু বিবর্তন যদি হয় জীবন-প্রবাহের ধর্ম এবং ঐতিহাসিক পরিচয়ে সত্যের প্রকাশ যদি হয় আপেক্ষিত তা'হলে জীবন-প্রবাহের বিবর্তনকে কি কোন "আদি" ও "অন্তের" বন্ধনে আবদ্ধ করা সম্ভব? জীবনধারার অনন্ত প্রবাহের এরূপ বন্ধন সম্ভব নয় বলেই নেতাজী অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী। মৌল তাৎপর্যে ভারতীয় ইতিহাসের দৃষ্টি এবং বিবর্তনবাদ, সত্যের আপেক্ষিক অভিব্যক্তি ও জীবনধারার চিরন্তনতা তথা অধ্যাত্মবাদ—নেতাজীকে দিয়েছে সমন্বয়ী জীবন-দর্শনের সন্ধান। নেতাজী এই সমন্বয়ী জীবন-দর্শনের মৌলিক ভিত্তিতেই ভারতীয় সমাজ-দর্শন রচনার প্রয়াসী হয়েছেন।

অনন্তপ্রসারী বিবর্তনবাদ

নেতাজী বলেছেন, মানব ইতিহাসে শেষ কথা বলে কিছু নেই। চিরন্তনের যাত্রাপথে ইতিহাস নিরন্তর এগিয়ে চলেছে। "এ প্রগতি একহারা না হতে পারে, পর্যায়ক্রমে এ প্রগতি ব্যাহত হতে পারে কিন্তু দীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতে 'প্রগতি'র যাত্রা থাকে অব্যাহত" ('আমার বিশ্বাস')। শুধু বিবর্তনবাদেই প্রগতির স্বীকৃতি নয়,—"জৈবিক ও নৈতিক প্রয়োজনেও" নেতাজী প্রগতিবাদে বিশ্বাসী।

নেতাজী বিবর্তনবাদের চিরন্তন প্রগতিশীলতায় বিশ্বাসী বলে কোন মতবাদ বা আইডিওলজিকে অখণ্ড, পূর্ণাঙ্গ এবং চিরন্তন সত্য বলে গ্রহণ করেননি। ১৯৩৪ সালে শ্রীনেহরু বলেছিলেন, "মানব-সমাজকে কম্যুনিজম বা ফ্যাসীজমের যে কোন একটিকে বেছে নিতে হবে।" নেতাজী এইরূপ অভিমতের প্রতিবাদে জানান: "আমরা যদি বিবর্তন প্রান্তসীমায় না এসে থাকি অথবা যদি বিবর্তনকেই অস্বীকার না করি, তবে আমাদের মতবাদ গ্রহণের ক্ষেত্র ফ্যাসীজম বা কম্যুনিজমের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। হেগেল, বার্গশোঁ বা যে কোন বিবর্তনবাদেই বিশ্বাস করা হোক না কেন, সৃষ্টি শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে একথা মনে করার কোন কারণ নেই" (ভিয়েনা বিবৃতি)। কোন মতবাদই ইতিহাসের চিরজীবনের ঠিকুজী লিখতে পারে না। কম্যুনিজমের অনেক ভাল অংশের সারবত্তা স্বীকার করেও নেতাজী মনে করেন না যে, শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন, পরিবারহীন, জাতি-হীন ও ধর্মহীন কম্যুনিস্ট নৈরাজ্য সমাজের কল্পনাতেই মানবইতিহাস চরম ও অন্তিম অভিব্যক্তি লাভ করবে। মার্কস্‌বাদের অনেকাংশে বিবর্তন-বিরোধী চূড়ান্ত লক্ষ্য সাধনের দাবীকে অগ্রাহ্য করে নেতাজী বলেছেন: "কোন মতবাদ বা সমাজ-দর্শনের থিওরী মানব-মনীষার শেষকথা হতে পারে না। কোন ব্যবস্থা মানব-প্রগতির শেষ পরিণতি, একথা ভাবা নির্বুদ্ধিতা···মানব-প্রগতি কোনদিনও শেষ হতে পারে না।" (টোকিও বক্তৃতা)। ইতিহাসের গতি বিশ্লেষণে মার্কস্‌বাদ মানব-সভ্যতাকে প্রগতির পথে নিয়ে ঠেকিয়েছে কম্যুনিস্ট সমাজের নৈরাজ্য বিকাশ চরম কল্পনায়। এরূপ কল্পনা বিবর্তনবাদকেই শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করে বলে নেতাজী ইতিহাসের মার্কস্‌বাদী ব্যাখ্যাকে অখণ্ড সত্য বলে গ্রহণ করেননি।

সত্যের আপেক্ষিক প্রকাশ

নেতাজীর দার্শনিক বিচার অনুযায়ী, "যে সত্যকে আমরা জানি তা চূড়ান্ত নয়, আপেক্ষিক,—আমাদের মানসিক সংগঠন ও স্বকীয়

বৈশিষ্ট্যের উপর তা নির্ভরশীল।" ('আমার বিশ্বাস')। নেতাজী গান্ধীদর্শনের প্রেমধর্মকে গ্রহণ করেন কিন্তু প্রেমের একমাত্র রূপায়ণ অহিংসায়, একথা তিনি মানতে পারেননি। অহিংসা প্রেমের আপেক্ষিক প্রকাশ হতে পারে কিন্তু একান্ত অভিব্যক্তি নয়। এই অভিমত নেতাজীকে গান্ধী দর্শনের দ্বিধাহীন অনুগামী হতে দেয়নি। যদিও গান্ধী-সুভাষের জীবন-দর্শনের মূল উৎসে রয়েছে গভীর ঐক্যানুভূতি। গান্ধী-সুভাষের উভয় জীবনই ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং অধ্যাত্মমূল্যের স্বীকৃতির মৌলিক বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত। ভারতের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের বাণী উভয়ের কর্ম ও সাধনার প্রধান উৎস।

ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা বা বস্তুবাদ মার্কস্‌বাদের মূল দার্শনিক-ভিত্তি। এই বস্তুবাদের একবাদী অভিমত হতেই মার্কস্‌বাদের বিভিন্ন প্রমূল্য পরিকল্পনা এবং রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতির থিওরীগুলির উদ্ভব হয়েছে। নেতাজী ইতিহাসের বস্তুবাদী বা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার একান্ত অভ্রান্ততা স্বীকার করেন না। মানবইতিহাস সংগঠনে অর্থ বা বস্তুপ্রভাবের মূল্য স্বীকার্য, কিন্তু একান্তরূপে নয়। নেতাজীর মতে, "মার্কস্‌বাদে অর্থনীতিকে মানবজীবনে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবনযোগ্য কিন্তু একে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই।" (টোকিও বক্তৃতা)। সত্যের অভিব্যক্তি আপেক্ষিক একথা স্বীকার করে নেতাজী একান্তবাদ বা একদেশদর্শী দৃষ্টিভংগী বর্জন করে জীবনকে বিভিন্ন আপেক্ষিক সত্যের সমন্বয়ের আলোতে দেখতে চেয়েছেন।

আধ্যাত্মিক প্রমূল্য

বস্তুতেই বস্তুর সৃষ্টি ও পরিণতি,—একথা স্বীকার করলে চির-ন্তনের মূল্যবোধে মানব-মনীষাকে চির-উদ্দীপ্ত করা সম্ভব নয়। অনাদি ও অনন্তের কল্পনাই সৃজনশীল বৃত্তির সঞ্জাতা। মানুষ যদি শুধু অণু-

পরমাণুর একটা সমষ্টি না হয়, বস্তু-প্রভাবাধীন শুধু একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র না হয়—তা'হলে "জীবনের মূল্য, অনুরাগ ও উদ্দেশ্য আরোপণ করা সম্ভব।" (আমার বিশ্বাস)। নেতাজীর সমগ্র কর্ম ও জীবন গভীরভাবে অধ্যাত্মবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। গান্ধীজীর ন্যায় নেতাজীরও বিশ্বাস "প্রেমেই এই বিশ্বসত্তার অন্তিম উৎস এবং মানব-জীবনের মৌলিক আদর্শও এই প্রেমেই নিহিত।" আজিকার রাষ্ট্র ও সমাজ পরিকল্পনায় মানবতাবোধকে জাগ্রত করতে হলে এবং মানবাত্মাকে বর্তমান যুগের বৈষয়িক প্রভাবসঞ্জাত যান্ত্রিক মানসিকতার হাত থেকে রক্ষা করে উদার ও সৃজনশীল করে গড়ে তুলতে হলে মানবজীবনে ও তার সমাজ-দর্শন রচনায় আধ্যাত্মিক মূল্যকে গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। নেতাজী বস্তুবাদকে অস্বীকার করেননি কিন্তু দেহের আবরণে চিরন্তন আকৃতির স্পন্দনধ্বনি তুলে জীবনের সীমার মধ্যে অসীমের আহ্বান সৃষ্টির প্রয়োজনকে স্বীকার করেছেন। নেতাজী তাই "জড় ও চেতন, দেহ ও আত্মার দাবীর সুবর্ণ সামঞ্জস্য-বিধানের" প্রয়োজনের কথা স্বীকার করে বলেছেন, "দেহ ও আত্মার গভীর সম্বন্ধের ফলে দেহের উপেক্ষা শুধু জাতির দেহকেই দুর্বল করে না, কালস্রোতে জাতির আত্মাকেও অক্ষম করে দেয়। আজকের ভারতবর্ষ শুধু দেহের লাঞ্ছনায় ভুগছে না,—আত্মার ক্ষীণতায়ও ভুগছে।······আমাদের জাতীয় জীবনের পুনঃসংস্থান করতে হলে দু'দিকেই এগিয়ে যেতে হবে।" (পিরামিড সম্বন্ধে লেখা)। নেতাজী তাই মার্কস্‌বাদের একান্ত বস্তুবাদকে গ্রহণ করেননি, অন্যদিকে গান্ধীজীর সর্বাত্মক অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বৈষয়িক উন্নতির প্রয়োজনীয়তাকে যোগ দিতে চেয়েছেন।

সমন্বয়ের দৃষ্টি

বিবর্তনবাদ, সত্যের আপেক্ষিকতা ও জীবনের আধ্যাত্মিক মূল্য —এই ত্রয়ী মৌল সত্যের ভিতের উপর নেতাজী তাঁর সমন্বয়ী জীবন-দর্শন গড়ে তুলেছেন। নেতাজী জীবন ও ইতিহাসের যান্ত্রিক বিকাশের

যৌক্তিকতা স্বীকার করেন না। মানুষের জীবন ও ইতিহাস যদি নিউটনের গতি-ধর্ম অনুযায়ী অণু-পরমাণুর যান্ত্রিক পরিণতি না হয় তা'হলে ইতিহাসের যাত্রাপথরূপে আগে থেকেই বাঁধাধরা কোন রাজপথ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। নিউটনের গতি-বিজ্ঞানে আজ এসে ঠেকেছে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানে—যার আধুনিক পরিণতি হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদে। ইতিহাসের যাত্রাপথের কোন চিরন্তনী ছক নেই। মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করে, ইতিহাসও মানুষকে সৃষ্টি করে। মানুষ ইচ্ছা করুক বা না করুক ইতিহাস একদিন স্বধর্মের তাগিদে মানব-সমাজকে কম্যুনিস্ট সমাজে নিয়ে পৌঁছে দেবে,—ইতিহাসের এরূপ অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বা নির্ণয়বাদ, অন্যকথায় এরূপ অর্থনৈতিক অদৃষ্টবাদ গ্রহণ করলে মানুষ নিজের সৃজনশীল বৃত্তি সম্বন্ধে অচেতন হয়ে পড়বে এবং প্রগতিবাদের মূলেই পড়বে কুঠারাঘাত। যন্ত্রের মত ইতিহাসের ছক-কষা রাজপথে অদৃষ্টের টানে গড়িয়ে যাবার দিকেই মানুষের মন হবে নিশ্চেষ্ট। নেতাজী তাই মানবইতিহাসের আদি-অন্তের ছক-আঁকা কোন মতবাদ বা আইডিওলজিকে গ্রহণ করতে রাজী নন। ইতিহাসের প্রকৃতি ও মানুষের মনীষা,—এই দুয়ের সৃজনশীল সমন্বয়েই গড়ে তুলতে হবে মানুষের সমাজ-দর্শন। নেতাজী তাই বলেছেন, "একটি আধুনিক জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক থিওরী এবং সংগঠন—ইতিহাস, পরিবেশ ও প্রয়োজনের অভিব্যক্তি যা' মানুষের জীবনের মতই পরিবর্তনশীল।" (ভিয়েনা বিবৃতি)। নেতাজীর মতে অতীতের অভিজ্ঞতা ও বর্তমান পরিবেশের প্রভাবকে বিশ্লেষণ করে সমাজের চলমান ও ভাবী প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন মূল্যের সমন্বয় করেই যুগে যুগে মানব-মনীষাকে তার সমাজ-দর্শন গড়ে তুলতে হবে। চিরদিনের জন্য উপযোগী কোন মতবাদ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এক দেশের মতবাদও আরেক দেশের উপর সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য নয়। দেশ ও কালের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করা একান্ত প্রয়োজন। নেতাজীর সমন্বয়ী জীবন-দর্শন কোন আত্মসর্বস্ব

মতবাদ বা আইডিওলজি নয়,—দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তনশীল সমাজ-দর্শন রচনার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী মাত্র। দেশ ও কালোত্তর কোন অখণ্ড-মতবাদ বা মানব-সমাজের চিরন্তনী আইডিওলজি রচনা করা সম্ভব বলে নেতাজী মনে করেন না।

সমন্বয়বাদের বৈশিষ্ট্য

মানবতা, সৃজনশীলতা এবং উদারতার প্রমূল্য—নেতাজীর সমন্বয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ পরিচয়। অধ্যাত্ম-মূল্য স্বীকার করে মানুষের সমাজ-দর্শনে তিনি মানবতাবাদকে বিশেষ স্থান দিয়েছেন। মানব-ইতিহাসের অদৃষ্ট বা নির্ণয়বাদকে অগ্রাহ্য করে ইতিহাসের প্রগতিতে মানব-মনীষার স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃতি দিয়ে তিনি সৃজনশীলতার পথ উন্মুখ রাখবার প্রয়াসী হয়েছেন। উপরন্তু, সত্য গ্রহণের আপেক্ষিক দৃষ্টি-ভঙ্গী নেতাজীর সমন্বয়বাদে এনেছে উদারতা বা সহিষ্ণুতার আবেদন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রচলিত মতবাদগুলির কোনটিকেই তিনি একান্ত এবং অখণ্ড সত্য বলে গ্রহণ করতে রাজী নন। আবার কোন গোড়ামী বশে এদের ভাল দিকগুলিকে বর্জন করার প্রয়াসীও নন নেতাজী। মানব-জীবন ও ইতিহাসের বিভিন্ন কল্যাণকর দিকগুলির সমন্বয় সাধন করে তিনি যুগে যুগে নতুনতর সমাজ-দর্শন রচনার প্রয়োজনীতায় বিশ্বাসী। গান্ধীবাদ, মার্কস্‌বাদ, ফ্যাসীবাদ বা অন্যান্য মতবাদের তিনি সর্বতোভাবে বিরোধী নন, আবার একান্ত পূর্ণাঙ্গিক সমর্থকও নন। সমন্বয়ী দৃষ্টির মৌলিক কষ্টিপাথরে বিচার-বিশ্লেষণ করে এই মত-বাদের কল্যাণকর দিকগুলির সমন্বয় সাধন করে নেতাজী দেশ ও যুগোপযোগী নতুনতর সমাজ-দর্শন রচনার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী। দেহ ও আত্মা, অতীত ও বর্তমান, প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য, কম্যুনিজম ও ফ্যাসীজম, সমাজবাদ ও জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা, —কোনটিকেই একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন না করে প্রত্যেকটির কল্যাণকর দিকগুলির সমন্বয় সাধন করার দিকে নেতাজী জোর দিয়েছেন।

নব-ভারতের দৃষ্টি

নেতাজী বলেছেন, "ভারতে আমাদের লক্ষ্য হবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রচলিত মতবাদের কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয় অংশগুলির সমন্বয় সাধন করে একটি নতুন বিধান রচনা করা।" (ভিয়েনা বিবৃতি—১৯৪৩; টোকিও বক্তৃতা—১৯৪৪)। নব-ভারতে সমাজ-দর্শনের স্বপ্ন দেখে নেতাজী তাই বিভিন্ন লেখা ও ভাষণে 'দেহ ও আত্মার দাবীতে সুবর্ণ মধ্যপন্থা গ্রহণ', 'অতীতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিত্তিতে আমাদের নতুন ও আধুনিক জাতি গঠন', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় সাধন', 'সমাজবাদ ও জাতীয়তাবাদের ভাল দিকগুলি গ্রহণ', 'জাতীয় ভাববৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতিতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা', 'জাতীয়তাকে মূল্যরূপে স্বীকার করে আন্তর্জাতিক বিকাশ,—অর্থাৎ বিভিন্ন মূল্যের সমন্বয় সাধন করে ভারতের একটি 'প্রগতিশীল সমাজ-বিধান' গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

সমন্বয়বাদ নেতাজীর জীবনবাদের মূল দর্শন। নেতাজীর এই জীবন-দর্শনের রাজনৈতিক সংজ্ঞা দেওয়া যায় সমন্বয়ী সমাজবাদ নামে। কম্যুনিজম বা মার্কসবাদের ঢেউয়ে যখন ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের আদর্শবাদ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল সেই ত্রিশ দশকেও নেতাজী দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, "কোন মতবাদকেই চরম ও একান্ত সত্য বলে গ্রহণ করা অনুচিত। এজন্য রাশিয়ার উপর চিন্তার আলোকপাতের জন্য নির্ভর করা নির্বুদ্ধিতার সামিল হবে।" নেতাজী যে সমাজবাদের কথা বলেছেন তা' যে মার্কস্‌বাদ নয় ভারতবাসীকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি আরও বলেন, "এই সমাজবাদ কার্লমার্ক্সের পুঁথির পাতায় জন্ম নেয়নি,—ভারতের কৃষ্টি ও মনীষায় এর উৎপত্তি হয়েছে।" নেতাজী ১৯৩১ সাল থেকে বলে আসছেন যে, ভারতকে নূতন সমাজবাদ আদর্শ ও পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। রাশিয়ার সমাজবাদের যে ত্রুটি ও বিচ্যুতি ধরা পড়েছে তার সমাধান করে নূতন মূল্য ও পরিকল্পনায় পূর্ণাঙ্গ করে

তুলতে হবে ভারতীয় সমাজবাদ। নেতাজী তাই বলেছেন, "আমার মনে একটুও সন্দেহ নেই যে ভারত ও বিশ্বের মুক্তি নির্ভর করছে সমাজবাদের উপর। কিন্তু ভারতকে তার নিজস্ব সমাজবাদের স্বরূপ ও পদ্ধতি নিজেকেই উদ্ভাবন করতে হবে। তার বৈশিষ্ট্যে শুধু ভারত নয়,—সারা বিশ্বও উপকৃত হবে।" নেতাজীর মতে ভারতের এই বিশিষ্ট সমাজবাদের বুনিয়াদ হবে সমন্বয়ী সমাজ-দর্শনে এবং এই সমন্বয়ী সমাজবাদই হবে সারা বিশ্বে ভারতের ঐতিহাসিক অবদান। নেতাজী তাঁর কর্মজীবনের প্রথম যুগ থেকে একান্তভাবে বিশ্বাস করেছেন যে, 'ভারতের একটি বাণী আছে', এবং বিংশ শতাব্দীর ভারত বিশ্বকে সমন্বয়ের দর্শনে নূতন জীবনবাদের দীক্ষা দেবে। এই ভারত-বাণীর কথা 'অমরাবতী ভাষণ' থেকে 'টোকিও ভাষণ' পর্যন্ত আগাগোড়া তিনি বারবার বলে এসেছেন। ১৯৩৩ সালে লণ্ডন ভাষণে নেতাজী ভারতকে স্মরণ করিয়ে দেন : "ভারত স্বাধীন হলে মৌলিক চিন্তা ও নূতন পরীক্ষার প্রয়োজন পড়বে। কারণ, অদূর ভবিষ্যতে ভারতকে বিশ্বের ইতিহাসে নূতন ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড তার গণতন্ত্র ও বিধানসম্মত সরকারের কল্পনা দ্বারা বিশ্ব-সভ্যতায় নূতন কিছু দিয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স তার সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বে মহান্ আদর্শ প্রচার করে। উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানী দিয়েছে মার্কসীয় দর্শনের অবদান। বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া সর্বহারার সরকার গঠনের কল্পনায় বিশ্বকে নূতন কিছু দিয়েছে। আগামী দিনে বিশ্বের কৃষ্টি ও সভ্যতায় ভারতকে তুলে ধরতে হবে বিশিষ্ট অবদান।" কি হবে এই অবদান? সমন্বয়ী দর্শনের বুনিয়াদে রচিত সমাজবাদই হবে বিশ্বসভ্যতায় ভারতের এই নয়া অবদান। নেতাজী 'টোকিও ভাষণে' এই অবদানের কথা ভারতকে আবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, "ভারত রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের পরবর্তী অধ্যায়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।" নেতাজী বিশ্বাস করেছেন আমেরিকার

স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব ও চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞতা নিয়ে নূতন সমস্যার নয়া সমাধানের পথ-নির্দেশ দেবে ভারতের আগামী সমাজ-বিপ্লব। সমন্বয়ী সমাজ-দর্শনে ভারতে যে সমাজবাদের আদর্শ গড়ে উঠবে তা পুঁজিবাদের বিকৃতি এবং কম্যুনিজমের বিভীষিকা থেকে বিশ্বের জনতাকে শান্তি, মৈত্রী ও সমৃদ্ধির অগ্রগামী পথের নয়া সন্ধান দেবে। ভারত ইতিহাসের এই নয়া ভূমিকার প্রত্যাশা নিয়েই ভারতের সমাজবাদী আন্দোলন সুরু করেছে তার অগ্রগামী গণ-অভিযান।

—যুগান্তর

নেতাজীর জীবন-মানস

নেতাজীর সমস্ত কর্ম-জীবনকে উদ্দীপ্ত করেছে নতুন ভারত গড়ার এক জীবন্ত স্বপ্ন। দুর্জয় বিপ্লবীর সমস্ত কাজে, সমস্ত আদর্শে, সমস্ত দুর্দম অভিযানে নিরবচ্ছিন্ন প্রেরণা জুগিয়েছে তাঁর ভারতময় অনুভূতি। সংসারত্যাগী বিবেকানন্দের শিরায় শিরায় যেমন ঢেউ তুলেছিলো নতুন ভারত গড়ার স্বপ্নময় কল্পনা, তেমনি নেতাজীর সমগ্র জীবনকে কর্মচঞ্চল করে তুলেছে উদয়োন্মুখ ভারতের এক তেজোময় ভাস্বর মূর্তি। নেতাজী ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছেন, ভারতবর্ষের ধ্যান করেছেন,—তাঁর সমস্ত আদর্শবাদের উৎসারণ হয়েছে এই ভারত-মনীষায়।

নেতাজীর জীবন-স্বপ্ন

সুভাষচন্দ্র যখন নেতাজী হননি, এমনকি দেশগৌরবও হননি,—সে দিনেও তাঁর কর্ম ও আদর্শের উৎস ছিলো ভারতবর্ষ। প্রতি ভাষণে তিনি বলতেন ভারতবাসীর কথা। তাঁর ১৯২৯ সালের অমরাবতী ভাষণে মূর্ত হয়েছিলো সেই ভারতবর্ষ,—১৯৪৫ সালের 'টোকিও বক্তৃতায়'ও উঠেছিলো সেই একই অনুরণন। "ভারতের একটি মিশন আছে,—বিশেষ বাণী আছে, তা' শুনাবার জন্যেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষ বেঁচে রয়েছে। এই স্বপ্ন আমার কাছে

জীবন্ত সত্য। এই স্বপ্ন থেকেই আমি উদ্দীপনা লাভ করি—প্রাণে আমার কাজ করার প্রেরণা আনে। এই স্বপ্নের অভাবে আমার বেঁচে থাকাই অসম্ভব হতো।" ভারত-বাণীর এই স্বপ্ন-সাধনার জন্য নেতাজী নিজেই নিজের নাম দিয়েছেন—An Indian Pilgrim—ভারত-পথিক।

ভারত-ইতিহাসের আবেদন

ভারত-পথিকের এই যে ভারত-প্রেম,—একি শুধু মনগড়া ভাবাবেগের উদ্বেল প্রকাশ মাত্র! একি শুধু ভারতের মাটি-জল-বন-পর্বতের কাব্যময় অভিব্যক্তি? ভারতের একটা বিশেষ বাণী আছে,—এই অনুভূতি কি সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তামুখী মনের স্বপ্ন-বিলাসী ভাবালুতা? "অনেক মৃত্যু ও জাগরণের ভিতর দিয়ে ভারতীয় জাতি এগিয়ে এসেছে, কারণ, ভারতের একটা মিশন আছে—ভারতীয় সভ্যতার একটা উদ্দেশ্য আছে, যা আজো সফল হয়নি।"—এই ভারত-বাণী নেতাজীর কল্পনাবিলাসের আবিষ্কার নয়,—জাতীয়তাবাদের অন্ধ স্বদেশপ্রীতিও নয়। নেতাজী গভীরভাবে ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন। ভারত-ইতিহাসের অন্তর্নিহিত ধারার গতি ও প্রগতির তাৎপর্য বিশ্লেষণ নেতাজীকে সন্ধান দিয়েছে এই ভারত-বাণীর। পৃথিবীর কত সভ্যতা মরে গেছে, কত সভ্যতা নিশ্চল কঙ্কালে ইতিহাসের স্মরণ চিহ্নটুকু শুধু জাগিয়ে রেখেছে—কিন্তু যুগযুগান্তরের মহাকাল উত্তীর্ণ হয়ে তাদের যাত্রাপথ নিত্যনতুন সজীবতায় অব্যাহত রাখতে পারেনি। কিন্তু ভারতবর্ষ? আজকের যে ভারতবর্ষ তার মাটিতেও কি পড়ে রয়েছে শুধু অতীতের কঙ্কালরাশি? আজিকার ভারতীয় ধমনীতে কি নেই অতীতের প্রাণস্পন্দন? ভারত-ইতিহাস বিশ্লেষণ করে নেতাজী বলেছেন, "মিশর বা ব্যাবিলন, ফোয়েনিশিয়া বা গ্রীসের মত ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতা মরে যায়নি। দুই হাজার বা তিন হাজার বৎসর

আগেকার পূর্বপুরুষের মত আজও আমাদের জীবনে মূলতঃ একই চিন্তা, একই জীবনের আদর্শ এবং একই অনুভূতির প্রভাব রয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, অতীতকাল থেকে আজকের দিনেও ভারত-বাসীর জীবনে ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারা অবিচ্ছিন্ন রয়েছে। এরূপ অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা ইতিহাসের এক বিশিষ্ট পরিচয়। গত তিন হাজার বৎসরের নূতন আদর্শ, অনেক সময় নূতন সংস্কৃতি নিয়ে বাইরে থেকে বহু গোষ্ঠী এসেছে এই সমস্ত নূতন প্রভাব, নূতন আদর্শ ও সংস্কৃতিকে ভারতের জাতীয় জীবন ধীরে ধীরে আপন করে নিয়েছে। যদিও প্রাচীনকালে আমাদের যে সংস্কৃতি ও সভ্যতা ছিলো, আজও মূলতঃ তাই রয়েছে, তবু আমাদের পরিবর্তনও হয়েছে, কালের গতির মাঝে আমরা এগিয়েও গিয়েছি।"

(টোকিও ভাষণ)

সমন্বয়ী সংস্কৃতি

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার এই যে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা মুসলিম যুগে কি তার বিচ্ছেদ ঘটেছে? নেতাজী সে প্রশ্নেরও উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন, "ভূগোলের দিক দিয়ে ভারতবর্ষ ঐক্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নৃতত্ত্বের বৈচিত্র্য ভারতবর্ষে কোনদিনই সমস্যা সৃষ্টি করেনি। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ভারতবর্ষ বহু জাতিকে আপন করে নিয়েছে এবং সর্বসাধারণকে দিয়েছে এক সার্বিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য।...মুসলমানদের আগমনে ক্রমশঃ এক নূতন সমস্যা গড়ে উঠেছে। মুসলমানেরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেনি বটে কিন্তু ভারতবর্ষকে তারা বাসভূমিরূপে গ্রহণ করেছে। এই দেশ-বাসীর সুখ-দুঃখ এবং সমাজ-জীবন সমানভাবে আপন করে নিয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের সহযোগিতায় এক নূতন সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছে। প্রাচীনের সঙ্গে এই সংস্কৃতির পার্থক্য থাকলেও এর প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়। স্থাপত্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে যে নূতন

ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে তার ভিতর দুটি সংস্কৃতির সুন্দর সমন্বয় মূর্তিমন্ত হয়ে উঠেছে।” (ভারতীয় সংগ্রাম)

ভারতীয় ইতিহাসের এই অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা মানব-ইতিহাসে একটি জাতির জীবন্ত প্রবাহের এক বিশিষ্ট নিদর্শন। এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে নেতাজী তাই বলেছেন, “প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই যে ইতিহাস ও সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা,—মানব-ইতিহাসে এটি এক বিশেষ পরিলক্ষণীয় ঘটনা।”

ভারতীয় সভ্যতার অমরতা

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি ও অবিচ্ছিন্নতা এমন অক্ষুণ্ণ রইলো কেন ? যা পৃথিবীর আর কোন দেশেই সম্ভব হয়নি, ভারতের ক্ষেত্রে তা’ সম্ভব হলো কি করে? এই রহস্যের সন্ধান করে নেতাজী বলেছেন, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির গ্রহীষ্ণু উদারতা, সমন্বয় সাধনের মনীষা, বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী এবং আত্মা ও দেহের স্বর্ণসেতু রচনার আদর্শ,—এই বৈশিষ্ট্যই ভারতের জীবন-ধারাকে শত ঘাত-প্রতিঘাত থেকে রক্ষা করেছে, প্রতি সংকট সংঘর্ষ ও বিনাশের পরিবর্তে নতুন জীবনায়নে এগিয়ে চলার সামর্থ্য জুগিয়েছে।

ভারতীয় ইতিহাসের শিক্ষা নেতাজীকে তাঁর জীবন-দর্শন রচনায় বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। তিনি যে ভাবী ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন, তার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে ভারত ইতিহাসের এই দার্শনিক পর্যালোচনায়। নেতাজী বিশ্বাস করেছেন ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বাঁচাতে হবে,—বাঁচাতে হবে শুধু জাতীয়তার অন্ধ গোঁড়ামির দাবীতে নয়। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন, “কোন জাতি যদি তার জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলে, যদি তার অন্তর্নিহিত প্রাণ-ব্যঞ্জনা,—তার সৃজন-প্রতিভা নিঃশেষ হয়ে যায়, তা’হলে সে জাতির অস্তিত্ব রক্ষার কোন অধিকার নেই।” কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতায় এই মৃতকল্প জীবনের দীনতা আসেনি। জনগণের

শত শোচনীয় পরিস্থিতিতেও ভারত তার সমন্বয়ী ঔদার্য ও সৃজন-প্রতিভা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ভারতের একটি বাণী আছে—এই সমন্বয়ী ঔদার্যের বাণীই সে পৃথিবীকে শুনাবে। তাই নেতাজী অনুভব করেছেন, "ভারতকে বেঁচে উঠতে হবেই, কারণ, ভারত নিজেকে বাঁচিয়ে পৃথিবীকে বাঁচাবে। স্বাধীন ভারত পৃথিবীর সংস্কৃতি ও সভ্যতায় অনেক কিছু দেবে—দর্শনে, সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে অনেক নব নব উদ্ভাবনের জন্য পৃথিবী সাগ্রহে আশা করে আছে ভারতের অবদানের কাছে।"

ইতিহাসের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি চিরঞ্জীব থাকা সত্ত্বেও উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ভারত প্রবল কর্মচাঞ্চল্যে নব প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে না কেন? ভারতের জনজীবনে সার্বিক উত্থানের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে না কেন? নেতাজী লক্ষ্য করেছেন, "শত শত মহাপুরুষ এদেশে জন্ম-গ্রহণ করেছেন। অথচ তাঁহদের অভ্যুদয় সত্ত্বেও জাতি আজ এক শোচনীয় দশায় এসে পৌঁছেছে।" ভারতীয় জাতির এই সাময়িক দুর্দশার কারণ অনুসন্ধান করে নেতাজী বলেছেন, শক্তিমানের সৃজনাকাঙ্ক্ষার পৌরুষ হারিয়ে ভারত আজ ভাগ্যবাদ ও অতি-প্রকৃতিতে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছে এবং অধ্যাত্মবাদের আতিশয্যে তার জীবনে এসেছে নিষ্কৃতির সন্তোষ এবং সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আত্মসর্বস্ব ব্যক্তিবাদ। এত উন্নত সংস্কৃতি ও সভ্যতার অধিকারী হয়েও ভারত কেন আজ পেছনে পড়ে রয়েছে, নেতাজী তার কারণ অনুসন্ধানে প্রশ্ন করেছেন, "রাজনৈতিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে কি কারণে ভারতের পতন ঘটেছে? এর কারণ হলো এই যে ভাগ্যবাদ ও অতি-প্রকৃতিতে তার অন্ধ-বিশ্বাস, আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে তার উদাসীনতা, বর্তমান সমরবিদ্যায় তার পশ্চাদ্‌পরতা, এবং এই মনোবৃত্তির পেছনের দর্শন আর অহিংসার মাত্রাধিক রূপায়ণের প্রতি অনুরাগবশতঃ জনগণের নির্ঝঞ্ঝাট সন্তোষের আকাঙ্ক্ষা।" (ভারতীয় সংগ্রাম)।

সমন্বয়ের স্বর্ণ-সেতু

নেতাজী তাই বলেছেন, "যে জাতি মন্ত্র-তন্ত্র ও অতি-প্রকৃতিতে বিশ্বাসী তার রাজনৈতিক মুক্তির আশা হলো সুস্থ যুক্তিবাদ ও বৈষয়িক জীবনের আধুনিক রূপান্তর সাধন।" আত্মমন ব্যক্তিবাদের সমালোচনা করেও নেতাজী এই অভিমত প্রকাশ করেছেনঃ "ভারত সম্মিলিত সাধনা ভুলে ব্যক্তিগত বিকাশের দিকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে। জাতিকে বাঁচাতে হলে সাধনার ধারায় আজ মোড় ফেরাতে হবে। জাতিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত বিকাশের কোন সার্থকতা নেই,—একথা আজ সকলকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।" অন্যদিকে অধ্যাত্মবাদের আতিশয্য বর্জনের আহ্বান জানিয়ে নেতাজী আরও বলেছেন, "ভারত সভ্যতার দিকে দৃষ্টি দেয়নি, দিয়েছে সংস্কৃতির দিকে, পার্থিব জীবনের দিকে দেয়নি, দিয়েছে মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের দিকে। মননা ও অধ্যাত্ম-জীবনের দিকে একান্ত দৃষ্টি দেওয়ায় বিজ্ঞানের প্রগতি উপেক্ষিত হয়েছে এবং দৈহিক ও পার্থিব জীবনের দিকে আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি। ভারতের ইতিহাসে সেইদিনই ছিল গৌরবময় যুগ যখন জড় ও চেতন, দেহ ও আত্মার দাবীর সুবর্ণ সামঞ্জস্য বিধান এবং দুদিকেই প্রগতি সম্ভব হয়েছিল। দেহ ও আত্মার গভীর সম্বন্ধের ফলে দেহের উপেক্ষা শুধু জাতির দেহকেই দুর্বল করে না, কালস্রোতে জাতির আত্মাকেও অক্ষয় করে দেয়। আজকের ভারতবর্ষ দেহের লাঞ্ছনায়ই ভুগছে না,—আত্মার ক্ষীণতায়ও ভুগছে। জীবনের একদিককে অবহেলা করার ইহাই অনিবার্য পরিণতি। যদি আমাদের জাতীয় জীবনের পুনঃ সংস্থান করতে হয় তা'হলে দুদিকেই আমাদের সমান ভাবে এগিয়ে যেতে হবে।"

নব-ভারতের জীবন-দর্শন

যে নব ভারতের কল্পনা নেতাজীর সমস্ত জীবনকে কর্মময় করে তুলেছে তার জীবনদর্শন কি হবে? তিনি সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন, "ভারতবর্ষের ইতিহাস, ঐতিহ্য, পরিবেশ ও সংস্কৃতির বুনিয়াদে গড়ে তুলতে হবে আজিকার ভারতের জীবনবেদ। আমাদের জীবন গড়ে তুলতে হবে আধুনিককালে এবং আধুনিক পরিবেশে। কিন্তু আমি তাদের দলভুক্ত নই যারা আধুনিকতার উৎসাহে অতীতের গৌরবকে ভুলে যায়। অতীতের বুনিয়াদে আমাদের দাঁড়াতে হবে। ভারতের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, যাকে ভারতের নিজস্ব ধারায় বিকাশোন্মুখ করে তুলতে হবে। এক কথায় আমাদের একটি সমন্বয়ে আসতে হবে। একদিকে আমাদের বেদের যুগে ফিরে যাওয়ার আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, অন্যদিকে আধুনিক ইউরোপের অর্থহীন বিলাস ও পরিবর্তনের লালসার প্রতিরোধ করতে হবে।...... আমাদের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে আমরা একটি নূতন ও আধুনিক জাতি গড়ে তুলতে চাই।"

মস্কো, লণ্ডন বা নিউইয়র্কের সংস্করণ না হলে কোন জীবনাদর্শেই যাদের মন ভরে না নেতাজী তাদের সাবধান করে বলেছেন, "ইউরোপ ও আমেরিকার যে সমস্ত পরীক্ষা ও আন্দোলন চলছে বিচারশীল সহানুভূতি নিয়ে আমাদের তার পর্যালোচনা করতে হবে। আমরা যদি কোন মনগড়া কল্পনা বা গোড়ামীর জন্য বিভিন্ন আন্দোলন ও পরীক্ষাগুলিকে উপেক্ষা করি তা'হলে নির্বুদ্ধিতা করবো।" বাইরের প্রতি দৃষ্টি দিতে যেয়ে তিনি আবার মস্কো-পন্থীদের সতর্কও করে দিয়েছেন, "ভারতবর্ষ সোভিয়েট্ রাশিয়ার দ্বিতীয় সংস্করণ হবে না।" (ভারতীয় সংগ্রাম) "ভারতবর্ষ কম্যুনিজমের প্রতি তেমন আগ্রহশীল হয়নি, যেমন হয়েছে সোভিয়েট রাশিয়ার গঠনমূলক শিল্পোন্নয়ন ও সংখ্যা-লঘু সমস্যা সমাধানের প্রতি।" (টোকিও ভাষণ)

একদর্শী মতবাদের বিভ্রান্তি

কম্যুনিজম তথা মার্কস্‌বাদ, ফ্যাসীবাদ বা গান্ধীবাদ,—কোন একটি মতবাদকে অখণ্ড সত্য বলে গ্রহণ করতে নেতাজীর বিচারশীল মন রাজী হয়নি। কম্যুনিজমের জড়বাদ, ইতিহাসের একবাদী আর্থিক ব্যাখ্যা এবং রাষ্ট্র-ধর্ম-পরিবার-বিলোপের তত্ত্ব তিনি অযৌক্তিক বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু মার্কস্‌বাদী বৈপ্লবিক ঐতিহ্য ও আর্থিক পরিকল্পনার অনেক সারবত্তা গ্রহণে দ্বিধা করেননি। গান্ধীবাদের আধ্যাত্মিক মূল্য এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নেতাজী পরমাগ্রহে গ্রহণ করেছেন কিন্তু শক্তিবাদবিমুখ অহিংসাতত্ত্বের আতিশয্য এবং বিজ্ঞান তথা শিল্পায়ন বর্জন এবং আর্থিক ক্ষেত্রে শ্রেণী-স্বার্থ সমন্বয়ের নীতিকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। ফ্যাসীবাদের রাষ্ট্রীয় সংগঠন নেতাজীকে আকর্ষিত করেছে কিন্তু তার গণতন্ত্র-বিরোধিতা, অর্থনীতির ধনতান্ত্রিক কাঠামো এবং পররাজ্য আক্রমণের মনোবৃত্তি নেতাজীর মনে সমর্থন সৃষ্টি করতে পারেনি। বস্তুতঃ নেতাজী কোন একটি মতবাদকে সমাজ পরিবর্তনের শেষ কথা বলে গ্রহণ করাকে অবৈজ্ঞানিক মনে করেছেন। কম্যুনিজম বা মার্কস্‌বাদ 'আইডিওলজির' নামে মানব-সমাজের মূল্যবোধ ও জীবন-পরিকল্পনাকে লোহার ছাঁচে ঢালাই করার যে পথ নির্দেশ করেছে নেতাজী তা' গ্রহণ করেননি।

মানব-সমাজে শেষ কথা বলে কিছু নেই,—তাই চূড়ান্ত কোন আইডিওলজি দাঁড় করাবার চেষ্টা মানব-মনকে যান্ত্রিক কাঠামোয় নিষ্প্রাণ করে দেবার বিভ্রান্তি মাত্র। নেতাজী তাই বলেছেন, 'কোন একটি ব্যবস্থা মানব প্রগতির শেষ কথা,—একথা ভাবা নির্বুদ্ধিতার সামিল হবে। মানব প্রগতি কোনদিন থামতে পারে না,—অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদের নূতন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।"

"আমাদের রাজনৈতিক দর্শন কি হবে? এসম্বন্ধে দশ বছর আগে 'ভারতীয় সংগ্রাম' বলে আমি যে বই লিখেছি তাতে আমার

মত লিপিবদ্ধ করেছি। ভারতে আমাদের কাজ হবে এমন একটি নূতন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা' হবে পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থার একটি সুসংবদ্ধ সমন্বয়। এমনি ভাবে ভারতকে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের পরের ধাপে এগিয়ে যেতে হবে" (টোকিও ভাষণ)। নেতাজীর এই সমন্বয়ী জীবন-দর্শন সংস্কারবাদ বা যে-কোন মতবাদদ্বয়ের মধ্যে আপসরফা করা নয়। কোন একটি জাতি এবং যুগের ইতিহাস, পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন মতবাদ রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-ব্যবস্থার কল্যাণকর অংশকে বিচারশীল ও গ্রহীষ্ণু মন নিয়ে একটি সমন্বয়ী দর্শনে গ্রথিত করে জন-জীবনে প্রয়োগ করাই নেতাজীর সমন্বয়বাদের মূল কথা। নেতাজী এই সমন্বয়ী জীবন-দর্শনের মধ্যে মানব-মনের স্বাধীন সত্তা ও সৃজনশীল প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছেন যা কম্যুনিজম বা মার্কস্‌বাদ স্বীকার করেনি।

সমন্বয়বাদী জীবনাদর্শ

ভারতের ইতিহাস নেতাজীকে সমন্বয়বাদী জীবনাদর্শের শিক্ষা দিয়েছে। নেতাজী এই জীবনাদর্শ নিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছেন ভারতের জাতীয় জীবন যার মূল দৃষ্টিভংগী হলো অধ্যাত্মমূল্য ও বস্তুবাদ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বিজ্ঞানবাদ ও মানবিকতা, জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদ, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তা, ব্যষ্টি ও সমাজ,—এমনিতর সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিক্‌গুলির সমন্বয় সাধন করে এক স্বাধীন স্বচ্ছন্দ ও সৃজনশীল সমাজ-জীবন গড়ে তোলা।

যে স্বাধীন ভারতে নেতাজী এই সমন্বয়ী দর্শনকে বাস্তবে রূপায়িত করার স্বপ্ন দেখেছেন, সেই স্বাধীন ভারতের রূপায়ণ দেখতে চেয়েছেন পরিপূর্ণ বিপ্লবের মাধ্যমে। বৈপ্লবিক রূপান্তর ব্যতীত জাতীয় জীবনে নতুন প্রাণশক্তির অভ্যুদয় ও ব্যঞ্জনা সম্ভব নয়। নেতাজী তাই স্বাধীন ভারতের প্রথম পদক্ষেপের কল্পনা করে বলেছেন, "আমরা একটু

আধটু জোড়াতালি চাই না, সংস্কারও আমরা চাই না, আমরা চাই আমূল পরিবর্তন। যা আমাদের প্রয়োজন তা' হলো আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের সর্বাঙ্গীণ রূপান্তর,—পরিপূর্ণ বিপ্লব সাধন।"

বৈপ্লবিক রূপান্তরের পথে যে স্বাধীন ভারতের জন্ম হবে, তার পুনর্গঠন পরিকল্পনার নির্দেশ দিয়ে নেতাজী বলেছেন, "সর্বপ্রথম নূতন শিল্পায়নের ভিত্তিতে ভারতের দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে ; দ্বিতীয় দৃষ্টি দিতে হবে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা নিবারণে ; এবং তৃতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণে।" নেতাজী অতি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, সমাজবাদী আদর্শে রাষ্ট্র ও আর্থিক ব্যবস্থার আমূল রূপান্তর ব্যতীত ভারতের জাতীয় সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে না। তিনি তাই সিদ্ধান্ত করেছেন, "যদি আমরা দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা নিবারণের দায়িত্ব ব্যক্তিগত উদ্যমের উপর ছেড়ে দিই, তা'হলে সম্ভবত এক শতাব্দীতেও এই সমস্যার সমাধান হবে না, আর্থিক সমস্যা তা' দেশের দ্রুত শিল্পায়নই হোক বা কৃষির অধুনাকরণই হোক—রাষ্ট্রকে তার দায়িত্ব নিতে হবে এবং রাষ্ট্রকে হতে হবে জনগণের সেবক,—মুষ্টিমেয় ধনিক চক্রান্তের তাঁবেদার নয় (servant of the masses and not of a clique of a few rich individuals)" (টোকিও ভাষণ)

স্বাধীন ভারত কি নেতাজীর প্রদর্শিত পথে এগিয়ে চলেছে? ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত, ভারতের দেশরক্ষা ব্যবস্থা আজ গুরুতরভাবে বিঘ্নসঙ্কুল, উদ্বাস্তু ও সংখ্যালঘু সমস্যায় সমাজ-জীবন ক্ষত-বিক্ষত, পাঁচশালা পরিকল্পনা ধনতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে রচিত, রাষ্ট্র কর্তৃত্বে ধনিক শ্রেণীর প্রতিপত্তি সর্বত্র বিদ্যমান। ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না আজিকার রাষ্ট্রীয় আদর্শে। স্বাধীনতা এসেছে কিন্তু স্বাধীন জন-জীবনের সর্বাঙ্গীণ রূপান্তরের বৈপ্লবিক প্রয়াস কোথায়? ভাবী

ভারতকে স্মরণ করে নেতাজী যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন আজি তার পুনরুচ্চারণের সময় এসেছে, "ভারতের জনগণ—যাদের অধিকাংশই দরিদ্র—তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি আমরা আমাদের আর্থিক সমস্যার সমাধান না করি, তা'হলে আমাদেরও চীন দেশের মত বিপদ ও বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হবে।" (টোকিও ভাষণ)

নেতাজী যে ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন, যে ভারত তার জীবন-বাণী নিয়ে যাবে বিশ্বজনের কাছে,—কবে হবে সেই ভাস্বর ভারতের তেজোময় অভ্যুদয় ?

—আনন্দবাজার

ভারতীয় সমাজবাদ

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সমাজবাদী আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির অন্যতম উদ্‌গাতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় গণ-আন্দোলনে গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মপন্থার সঙ্গে সমাজবাদী কর্মপন্থা যুক্ত করে গণ-সংগঠনের নতুন কর্মসূচী রচনা করেন।

সমাজবাদ কথাটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ভারতের সর্বত্র উচ্চারিত হলেও, সমাজবাদের দর্শন সম্বন্ধে তখনও কোন সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয়নি। সমাজবাদের প্রামাণিক ভিত্তি মার্কস্‌বাদ বা কম্যুনিস্ট দর্শন,—সমাজবাদের অন্য সমস্ত ব্যাখ্যাই নিছক 'ইয়োটোপিয়ান' বা কাল্পনিক,—এই ছিল সেদিনের ভারতীয় সমাজবাদী রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

সমাজবাদ সম্বন্ধে নেতাজীর চিন্তাধারা স্বরু থেকেই মৌলিক ও স্বতন্ত্র। তিনি সোস্যালিজম ও কম্যুনিজমকে সম-অর্থে গ্রহণ করেননি। নেতাজীর কাছে সোস্যালিজম ও কম্যুনিজম দুইটি ভিন্ন আদর্শবাদ। তিনি সোস্যালিজমের সমর্থক কিন্তু কম্যুনিজমের বিরোধী।

নেতাজী বিশ্বাস করেন, এযুগে সমাজবাদী দর্শনের নবতম পরীক্ষা হবে ভারতবর্ষে এবং এই পরীক্ষা থেকে সারা বিশ্ব উপকৃত হবে। সমাজবাদের ভারতীয় দর্শন ও পদ্ধতি রচনায় নেতাজী যে আহ্বান জানিয়েছেন তারই মূল তথ্যগুলি আলোচনা করা হয়েছে 'নেতাজীর দৃষ্টিতে সোস্যালিজম ও কম্যুনিজম', এবং 'নেতাজীর সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গী' নামের প্রবন্ধ দুইটিতে।

নেতাজীর দৃষ্টিতে সোস্যালিজম ও কম্যুনিজম

শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবীর গৌরবে ভারতের জনতা নেতাজীকে অভিনন্দিত করেছে কিন্তু নেতাজীর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনাদর্শ সম্বন্ধে তেমন সচেতনতার পরিচয় দেয়নি। ভারতে আজ সমাজবাদী আদর্শের প্রভাব দেখা দিয়েছে, কিন্তু নেতাজী যে এই সমাজবাদী আদর্শের অন্যতম অগ্রদূত সে সম্বন্ধে অনেকেরই স্মরণ নেই। মান্দালয় জেল থেকে মুক্তি পেয়েই তিনি স্বাধীনতার আদর্শকে সমাজবাদের আদর্শে পূর্ণাঙ্গ করে তোলার আহ্বান জানান ভারতের জনতাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন ছাত্র ও যুব সম্মেলনে ভারতের নওজোয়ানদের চিন্তাধারাকে পূর্ণ স্বাধীনতার সমাজবাদী পরিকল্পনায় উদ্দীপ্ত করে তোলবার জন্য তিনি বলেন, "স্বাধীনতা যদি আমাদের মূল আদর্শ হয়, যদি সমস্ত কাজের প্রাণ-শক্তি হয়,—তা'হলে এই স্বাধীনতা হবে সমাজ পুনর্গঠনের ভিত্তি। যদি স্বাধীনতাকে সমাজ গড়ে তোলার মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করি তা'হলে এর অর্থ হবে সমাজ বিপ্লব। ধনের বৈষম্য,—যা সামাজিক প্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে,—তা দূর করে দিতে হবে এবং শিক্ষা ও প্রগতির সমান সুযোগ, ধনের সমবণ্টন, সামাজিক অন্তরায়ের অপসারণ, বর্ণ প্রথার (কাস্ট সিসটেম) বিলোপ,—আমাদের নয়া-সমাজ গঠনের আদর্শের মধ্যে কয়েকটি নীতি হবে এই।" (অমরাবতী ছাত্র সম্মেলন, ১৯২৯)।

শুধু ছাত্র ও যুবকদের মধ্যেই নেতাজী এই আদর্শ প্রচার করেননি। লাহোর কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার পরিকল্পনাকে সমাজবাদের ভিত্তিতে গড়ে তোলবার আহ্বান জানিয়ে নেতাজী বলেন, "স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি 'ভারতীয় সোস্যালিস্ট রিপাবলিক' গঠন করা।" তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণ বিশ্লেষণ করে বলেন, "কংগ্রেসের প্রধান দুর্বলতা হলো যে, এই প্রতিষ্ঠানের নীতি প্রগতিবাদের উপর গঠিত নয়। জমিদার ও প্রজা, পুঁজিবাদী ও শ্রমজীবী, তথাকথিত উচ্চ ও নিম্নশ্রেণী—এরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপসরফা করাই কংগ্রেসের নীতি।" নেতাজী তাই গঠনমূলক কর্মপন্থার সঙ্গে "সোস্যালিস্ট প্রোগ্রাম" সংযুক্ত করে ভারতের কিষাণ-মজুর ও অনুন্নত শ্রেণীকে তাদের বিশিষ্ট অভাব-অভিযোগের ভিত্তিতে সংগঠিত করে গড়ে তোলার আবেদন জানান স্বাধীনতার সংগ্রামীদের।

নেতাজীর দৃষ্টিতে কম্যুনিজম

নেতাজী যে এই সমাজবাদের আদর্শ প্রচার করেন তার স্বরূপ কি? বস্তুতঃ, বিংশ দশকে এই প্রশ্নটি খুব কম লোকের মনকে চিন্তিত করেছে। রুশ-বিপ্লব,—যেখানে কম্যুনিজম তথা মার্কস্‌বাদের আদর্শ সাফল্যলাভ করে,—তার খুব কাছাকাছি যুগে মার্কস্‌বাদের তথা কম্যুনিজম ছাড়া সমাজবাদের অন্য সব কল্পনার পক্ষে প্রভাব বিস্তার করা খুব সহজ ছিল না। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা ও অন্যান্য সমাজবাদীরা,—এমন কি পণ্ডিত নেহরু পর্যন্ত—সে সময়ে সমাজবাদকে কম্যুনিজম বা মার্কসিজমের অর্থে প্রকাশ করেছেন। তখনকার দিনে সাধারণত কম্যুনিজম, মার্কসিজম তথা সমাজবাদ একই আদর্শের নামান্তর ছিল মাত্র। পণ্ডিত নেহরু পর্যন্ত সে সময় সুস্পষ্ট-ভাবে বলেছেন, "কম্যুনিজমের মূল আদর্শ এবং তার ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যুক্তি-যুক্ত।" একমাত্র নেতাজী শুরু থেকেই

সমাজবাদকে কম্যুনিজম বা মার্কসিজম থেকে স্বতন্ত্র আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন এবং দ্বিধাহীন কণ্ঠে তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ১৯২৯ সালে রংপুরের সম্মেলনের ভাষণে তিনি বলেছেন, "আজকাল সমাজবাদের আদর্শ পাশ্চাত্য জগৎ থেকে ভারতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে এবং অনেকের চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। কিন্তু সমাজবাদের চিন্তাধারা এদেশে নূতন নয়। আমরা এরূপ মনে করি, এজন্য যে আমরা এদেশের গতিসূত্র হারিয়ে ফেলেছি। কোন চিন্তাধারাকেই নির্ভুল এবং অখণ্ড সত্য বলে গ্রহণ করা ঠিক নয়। এইজন্য রাশিয়ার কাছ থেকে চিন্তার আলোকপাতের জন্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা নির্বুদ্ধিতার সামিল হবে। আমাদের নিজস্ব সমাজ ও রাজনীতি আমাদের প্রয়োজনের মত করেই গড়ে তুলতে হবে।" একই ভাষণে তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট করে বলেন যে, তিনি যে সমাজবাদ প্রচার করেন সেই সমাজবাদ "কার্লমার্কসের পুঁথির পাতায় জন্মলাভ করেনি। ভারতের কৃষ্টি ও চিন্তা এই মতবাদের সঞ্জাতা।"

কেন তিনি কম্যুনিজম বা মার্কস্‌বাদের চিন্তাধারাকে অখণ্ড সত্য বলে গ্রহণ করতে পারেননি তার কারণ দেখিয়ে নেতাজী 'ভারতীয় সংগ্রাম' নামক বইয়ে লিখেছেন, "প্রথমত, জাতীয়তাবাদের প্রতি কম্যুনিজমের কোন সহানুভূতি নেই। দ্বিতীয়ত, রাশিয়ার ইতিহাসে গির্জা ও গভর্ণমেন্টের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় এবং অনেক সংগঠিত গির্জার অস্তিত্বের জন্য রাশিয়াতে কম্যুনিজম ধর্মবিরোধী ও নিরীশ্বরবাদী হয়ে গড়ে উঠেছে। পক্ষান্তরে ভারতীয়দের মধ্যে কোন সংগঠিত গির্জা নাই এবং গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন সংযোগ গড়ে উঠে নাই। ইহার ফলে ধর্মের বিরুদ্ধে ভারতে কোন বিদ্বেষ গড়ে উঠে নাই, বরং ভারতের জাতীয় জাগরণ ধর্মীয় সংস্কার ও কৃষ্টিগত পুনরুত্থানের আন্দোলনের মারফতেই গড়ে উঠেছে। তৃতীয়ত, রাশিয়া এখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত এবং বিশ্ববিপ্লব সাধনে তার খুব কমই আগ্রহ

আছে, যদিও আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে এরূপ একটা মনোভাব দেখানো হয়ে থাকে। চতুর্থত, ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা—যা কম্যুনিস্ট মতবাদের মূল ভিত্তি—ভারতে তা গৃহীত হবে না। পঞ্চমত, কম্যুনিস্ট মতবাদে অর্থনীতির কোন কোন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান থাকলেও অন্যদিকে এই মতবাদ দুর্বল। মুদ্রানীতির ক্ষেত্রে কম্যুনিজমের কোন নূতন দান নেই। সুতরাং নিঃসন্দেহে যেমন এই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে ভারত রাশিয়ার একটি দ্বিতীয় সংস্করণ হবে না। অন্যদিকে তেমনি বলা যায় যে, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন পরীক্ষা এবং আধুনিক রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন ভারতীয় প্রগতিকে অনেকাংশে প্রভাবান্বিত করবে।"

অনেকে বলে থাকেন নেতাজীর ন্যায় একজন গতিশীল ব্যক্তি আজ ভারতীয় রাজনীতিতে উপস্থিত থাকলে কম্যুনিজম বা মার্কস্‌বাদের চিন্তাধারাকে গ্রহণ করে তাঁর নিজের মতের রূপান্তর সাধন করতেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, নেতাজীর সমাজবাদের কল্পনা কতকগুলি মৌলিক চিন্তাধারার উপরে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। তাই তিনি ১৯২৯ সালে অমরাবতী অথবা করাচীর নওজোয়ান কংগ্রেসে সমাজবাদী চিন্তাধারার মূল বুনিয়াদের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন ১৯৩৫ সালে রচিত 'ভারতীয় সংগ্রাম' নামক পুস্তকে সেই মূল আদর্শবাদেরই পুনরুচ্চারণ করেছেন এবং ১৯৪৪ সালে টোকিও ভাষণে সেই আদর্শবাদেরই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী আবার তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কম্যুনিজম তথা মার্কস্‌বাদের সমালোচনা করে টোকিও ভাষণে তিনি বলেছেন, "কম্যুনিজম জাতীয়তার মূল্য স্বীকারে অপরিপূর্ণ। ভারতে আমরা যে প্রগতিশীল ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই তা ভারতের সমাজ ও জনতার প্রয়োজনে এবং ভারতীয় জাতীয়তার ভাবাবেগের্ ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। রাশিয়া মজুর শ্রেণীর সমস্যার উপরে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। ভারত ব্যাপকভাবে কিষাণের দেশ এবং এখানে মজুর শ্রেণীর চেয়ে

কিষাণের সমস্যা অধিক গুরুত্ব লাভ করবে। আমরা মার্কসিজমের আরেকটি বিষয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একমত নই। এই মতবাদ অনুযায়ী মানব-সমাজের অর্থনৈতিক গুরুত্ব,—যা আগে অস্বীকার করা হতো না,—তার মূল্য আমরা স্বীকার করি, কিন্তু তার উপরে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া অনাবশ্যক।"

ভারতীয় সমাজবাদ

নেতাজী সমাজবাদের আদর্শে ভারতের জাতীয়-জীবন গড়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি ভারতের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যেই এই মতবাদের নীতি ও কর্মপদ্ধতি রচনা করার কল্পনা করেছেন। সমাজবাদকে নূতন ভিত্তিতে দাঁড় করাবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৯৩১ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে নেতাজী বলেন, "আমরা সমাজবাদ চাই, —পরিপূর্ণ সমাজবাদ চাই, কিন্তু ভারত তার নিজস্ব সমাজবাদের স্বরূপ ও পদ্ধতি নিজেই উদ্ভাবন করবে। আমার মনে একটুও সন্দেহ নেই যে, ভারত এবং সারা বিশ্বের মুক্তি নির্ভর করছে সমাজবাদের উপরে। ভারত অন্য দেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং অন্য দেশের পরীক্ষার দ্বারা উপকৃত হবে, কিন্তু ভারত নিজস্ব প্রয়োজন ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজবাদের নিজস্ব পদ্ধতি উদ্ভাবন করবে।"

নেতাজী ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সমন্বয়ী ও সৃজনশীল জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে সমাজবাদের নতুন দর্শন ও পদ্ধতি গড়ে তুলতে চেয়েছেন। নেতাজীর মতে মার্কস্‌বাদ কেন, কোন মতবাদই মানব-মনীষার শেষ কথা নয়। কোন আদর্শবাদ চিরকালের জন্য পরিপূর্ণ হতে পারে না বা মানবসভ্যতার ভাবী যাত্রাপথের জ্যামিতিক চিত্র গড়ে তুলতে পারে না। মানব-মনীষা যদি বিবর্তনবাদ তথা চিরন্তন সৃজনশীলতার বৃত্তিকে অস্বীকার না করে তা'হলে কোন মতবাদকেই চিরকালের জন্য পূর্ণাঙ্গ বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যে দর্শনে নূতন

চিন্তা ও সীমাহীন মননার সম্ভাবনা আছে সেই আদর্শই মানবসমাজ ও মানব-মনকে সৃজনশীলতার আগ্রহে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে। নেতাজী তাই সমাজবাদের নিয়ন্ত্রণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করে বলেছেন, "একটি আধুনিক জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদ ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে সেই দেশের ইতিহাস, পরিবেশ ও প্রয়োজনের সমন্বয়ে এবং তাদের রূপান্তর ও প্রগতি মানবজীবনের মতই পরির্তনশীল।"

নেতাজীর সমাজবাদের মূল ভিত্তি হল সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী। সমন্বয়ের অর্থ সৃজনশীল বৃত্তির স্বীকৃতি। মানব-মনীষা বিভিন্ন মূল্য ও বস্তুনৈতিক পরিবেশের স্বরূপ অনুধাবন করবে এবং প্রয়োজন ও পরিবেশ অনুযায়ী তার সমন্বয়ের সূত্র খুঁজে বের করবে। এই সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী শুধু ভারতীয় ইতিহাসের শিক্ষা নয়,—বিজ্ঞান ও নয়া সমাজতত্ত্বেরও এই নির্দেশ। বহু ঘটনা ও মূল্যের কোন একবাদী সমাধান ও বিশ্লেষণ নেই, বহুর আংশিক এবং আপেক্ষিক মূল্যের স্বীকৃতি ও সমন্বয়েই আজিকার দিনের সামাজিক মূল্যমান রচনা করা সম্ভব। নেতাজী তাই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে যে সমাজবাদী আদর্শ গড়ে তুলতে চেয়েছেন তার লক্ষ্য হল,—'বস্তু ও অধ্যাত্ম তথা আত্মা ও দেহের স্বর্ণসূত্র রচনা করা', 'বর্তমানের মধ্যে অতীতের মূল্যকে স্বীকৃতি দেওয়া', 'জাতীয়তার সঙ্গে সমাজবাদের' সংযোগ করা, 'সাম্যের আদর্শে গণতন্ত্রকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলা' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যা কল্যাণকর তার সমন্বয় সাধন করা।' ১৯৩৪ সালে নিজের মতবাদ ব্যাখ্যা করে নেতাজী বলেন, "আমি সর্বদাই এই অভিমত পোষণ করেছি যে, আজিকার দিনের বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে যা কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয় তার সমন্বয় সাধন করাই হবে ভারতের কাজ।" একই চিন্তাধারার পুনরুচ্চারণ করে পরবর্তীকালে তিনি আরো বলেন, "পৃথিবীতে যে বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে, তার সমন্বয়ে এক নূতন বিধান গড়ে তোলাই হবে ভারতের কাজ।

মানব-সমাজের প্রগতিতে যে-কোন একটি ব্যবস্থাকে একটি চূড়ান্ত প্রগতির নিদর্শন বলে গণ্য করা নির্বুদ্ধিতার সামিল হবে। মানব-প্রগতি কোন দিন শেষ হতে পারে না। অতীতের অভিজ্ঞতার উপরেই পৃথিবীতে বার বার নূতন বিধান গড়ে উঠবে।” নেতাজী ভারতে প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁর সমাজবাদী জীবন-দর্শন। তাঁর মতে, “আমরা আধুনিক যুগে আধুনিক পরিবেশের মত করেই বাস করব। কিন্তু আমি তাদের দলে নই, যারা আধুনিকতার উন্মাদনায় অতীতের গৌরবকে ভুলে যায়। আমরা অতীতের বুনিয়াদেই আমাদের জীবন গড়ে তুলব। ভারতের একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি আছে যা তার নিজস্ব ধারায় সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে। এক কথায় আমাদের সমন্বয় সাধন করতে হবে। ‘বেদের যুগে ফিরে যাও’—এই পশ্চাদ্‌গামী আহ্বানকে আমরা যেমন বাধা দেব, তেমনি আধুনিকতার নামে অর্থহীন ফ্যাসান ও পরিবর্তনকেও রোধ করতে হবে।”

ভারতের বাণী

ভারতের একটা বাণী আছে যা বিশ্বের মানব-সমাজকে শোনাতে হবে,—এই জ্বলন্ত বিশ্বাস নেতাজীর জীবনকে আগাগোড়া প্রবুদ্ধ করে তুলেছে। তিনি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ও লিখনে এই ভারত-বাণীর কথা ব্যক্ত করেছেন। এই ভারত-বাণীর কল্পনা জাতীয় ভাবাবেগের একটা আতিশয্যময় কল্পনা বলে যাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন তাঁদের সমালোচনার উত্তরে নেতাজী স্পষ্ট করে বলেছেন, “আমাকে যদি কেউ অন্ধ জাতীয়তাবাদী বলে তবুও আমি দেশবাসীকে বলব, ভারতের একটি বাণী আছে এবং এইজন্য আজও ভারত বেঁচে আছে। এই ভারত-বাণী শব্দের মিষ্টিক বলে কিছুই নাই। বিশ্বের কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রতি ক্ষেত্রে ভারতের মৌলিক কিছু দেবার আছে।” নেতাজীর মতে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন-

দর্শনের তাৎপর্য হল চির-প্রগতিকামী কল্পনার মূল্যে। সমাজের জীবন-দর্শন যুগে যুগে ও কালে কালে রূপান্তরিত হবে এবং মানব-মনীষা সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই রূপান্তর ও পুনর্বিধানের সূত্র ও সমন্বয় খুঁজে বের করবে। নেতাজী তাই বিশ্বাস করেছেন ভারতে যে সমাজবাদী আদর্শ গড়ে উঠবে তা মৌলিক চিন্তা ও নূতন পরীক্ষায় বিশ্ব সমাজে নূতন অবদান তুলে ধরবে। নেতাজীর আশা, "স্বাধীন ভারতের কাছে বিশ্বের কৃষ্টি ও সভ্যতা নতুন অবদানের প্রত্যাশী"। তিনি এই আশাবাদ প্রকাশ করেছেন ১৯৩৩ সালে লণ্ডন ভাষণে। ১৯৪৪ সালে টোকিও ভাষণে নতুনভাবে এই আশাবাদ অনুরণিত হয়ে উঠেছে নেতাজীর কণ্ঠে। তিনি ভারতীয় জনতাকে তাঁর এই ঐতিহাসিক সম্ভাষণে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, "বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের ধারায় ভারতকে পরের ধাপে এগিয়ে যেতে হবে।"

—যুগান্তর

নেতাজীর সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

ভারতে আজ সুনিশ্চিতভাবে সমাজবাদী যুগারম্ভের পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। জনতার সাম্য ও সমমর্যাদার দাবী এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে সমাজবাদী প্রভাবকে অস্বীকার করা আজ কোনো রাজনৈতিক সংস্থার পক্ষেই সম্ভব নয়। 'সমাজবাদী ধরন', 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ', 'মার্কসীয় সমাজবাদ' বা 'সর্বোদয়,'—সমাজবাদের যে কোনোরূপ ভাষ্যই করা হোক না কেন ভারতের জাতীয় জীবনে সমাজবাদী ভাবধারার প্রভাব আজ সর্বত্র সুস্পষ্ট।

ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশে এই সমাজবাদী প্রভাব আকস্মিক সৃষ্টি হয়নি। ভারতে সমাজবাদী ভাবধারার প্রসারলাভে আন্তর্জাতীয় সমাজবাদী আন্দোলনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিঃসন্দেহে কার্যকরী হয়েছে, কিন্তু ভারতে সমাজবাদী ভাবাদর্শের পটভূমি গড়ে উঠেছে মূলতঃ ভারতীয় রাজনীতির সচেতন প্রয়াসের ফলে। এই সচেতন প্রয়াসে নেতাজীর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ, নেতাজী ভারতীয় সমাজবাদী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত। নিজের কর্ম ও বাণীতে সমাজবাদী আদর্শবাদের অবিচ্ছিন্ন প্রচারকরূপেই নয় শুধু, সমাজবাদী চিন্তাধারাকে ভারতের প্রয়োজন ও পরিবেশ অনুযায়ী মৌলিক বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ করে তোলার সার্থক প্রয়াসেও নেতাজীর স্থান বিশিষ্ট সমাজবাদী চিন্তানায়করূপে স্বীকৃতি লাভ করবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বামপন্থী আন্দোলনে সমাজবাদের একমাত্র ভিত্তি ছিল কম্যুনিস্ট মতবাদ বা মার্কস্‌বাদ। মার্কস্‌, এঙ্গেলস বা লেনিনের রচনাবলী বা তাঁদের রচনাবলীর উপর ভিত্তি করে রচিত সমাজবাদী ভাষ্য ছাড়া সমাজবাদী পণ্ডিতদের কাছে সমাজবাদের আর সমস্ত ব্যাখ্যাই কাল্পনিক বা প্রতিক্রিয়াপন্থী বলে প্রত্যাখ্যাত হত। একমাত্র মার্কস্‌বাদী সমাজবাদকেই তাঁরা বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের মর্যাদা দিতেন। সে সময়ে প্রায় সব কয়টি বামপন্থী দল ও নেতৃবর্গও একমাত্র মার্কস্‌বাদী ভাষ্যকেই সমাজবাদ বলে গ্রহণ করতেন। কিন্তু বামপন্থী আন্দোলনের অগ্রদূত হয়েও নেতাজী মার্কস্‌বাদের ভিত্তিকে অখণ্ড সত্য বলে গ্রহণ করেননি। সমাজবাদী আদর্শে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হয়েও নেতাজী ভারতে প্রযোজ্য সমাজবাদী চিন্তাধারাকে নতুন মূল্যমান ও দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

স্বাধীনতার সমাজবাদী আদর্শ

মান্দালয় জেল থেকে মুক্তিলাভের পরে ভারতের যুব আন্দোলনের চিন্তাধারাকে সমাজবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তোলার চেষ্টায় বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেন নেতাজী। যুব ও ছাত্র সম্মেলনের বিভিন্ন ভাষণে স্বাধীনতার পরিকল্পনাকে সর্বাঙ্গীণ বিপ্লবের সমাজবাদী ভাবাদর্শে রূপায়িত করে ভারতের যুবমনকে নতুন সমাজ রচনার নতুন স্বপ্নে অনুপ্রাণিত করার প্রয়াসে নেতাজী বলেন, "আমরা যা চাই সে হলো জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ রূপান্তর বা পরিপূর্ণ বিপ্লব সাধন।...স্বাধীনতা যদি হয় আমাদের সমাজ-জীবনের প্রাণসঞ্জীবনী, তা'হলে এই স্বাধীনতার ভিত্তি হবে সমাজ পুনর্গঠনের আদর্শ। স্বাধীনতার অর্থ তাই সমাজ-বিপ্লব ছাড়া আর কিছুই নয়। জন্মের জন্য দায়ী করে সমাজে অনেক শ্রেণীর লোকদের নিম্নস্তরে ফেলে রাখবার উদ্দেশ্যে যে বাধা-ব্যবধান গড়ে তোলা হয়েছে, নির্মমভাবে

সেগুলি ভেঙ্গেচুরে ফেলতে হবে, যে ধনবৈষম্য সমাজপ্রগতিকে ব্যাহত করছে তাকে দূর করতে হবে,—সমাজ পুনর্গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে সবাইকে সমান সুযোগ দিতে হবে। সমাজ ও অর্থনীতিতে সবাইকে দিতে হবে সমান স্বাধীনতা ও সম-মর্যাদা। সবার জন্য সমান সুযোগ, জাতীয় ধনের সমবণ্টন, সামাজিক বৈষম্যের বিলোপসাধন,—এই হবে আমাদের নতুন সমাজ গঠনের আদর্শ।"

নেতাজীর সমাজবাদী বিশ্বাস সুস্পষ্ট এবং আরও দৃঢ়তর হয়ে ওঠে লাহোর কংগ্রেস ও করাচী কংগ্রেসের সমসময়ে। গণ-সংযোগের কর্মপন্থারূপে 'গঠনমূলক কর্মপন্থা'র সঙ্গে 'সমাজবাদী কর্মপন্থা' গ্রহণের আহ্বান নেতাজীর কণ্ঠেই সর্বপ্রথম শোনা যায় লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনে। ১৯৩১ সালে নওজোয়ান সভার সম্মেলনে "সমাজবাদী কর্মসূচীর ভিত্তিতে কিষাণ ও মজুর সংগঠন, যুব সংগঠন, নারী সমিতি গঠন, ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার সাধন, সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার এবং সমাজবাদী আদর্শে রচিত নতুন সাহিত্য প্রচারের" সমাজবাদী কর্মসূচী সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে নেতাজী বলেন, "ভারতে আমি প্রতিষ্ঠা করতে চাই একটি সমাজবাদী লোকতন্ত্র,—একটি সোস্যালিস্ট রিপাব্লিক। এই সমাজবাদী রাষ্ট্রের রূপায়ণ কিরূপ হবে বর্তমানে তার মূল নীতি ও বৈশিষ্ট্যের রূপরেখা নির্ধারণ করে আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, প্রথমত, আমরা চাই ব্রিটিশ প্রভাবমুক্ত একটি স্বাধীন ভারতীয় গঠনতন্ত্র ; দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক মুক্তি তথা জাতীয় সম্পদের সমান ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টন অর্থাৎ সমাজে কোনো অনার্জিত সম্পদ্ থাকতে পারবে না এবং রাষ্ট্রকে উৎপাদন ও বণ্টনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে ; এবং তৃতীয়ত, রাষ্ট্রকে পূর্ণ সামাজিক ঐক্য স্থাপন করতে হবে।"

সমাজবাদ মার্কসবাদ নয়

নেতাজীর এই সমাজবাদী আদর্শ যে কম্যুনিস্ট মতবাদ বা

মার্কস্‌বাদ অনুসারী নয় তিনি নিজেই সে সম্বন্ধে রংপুর সম্মেলনে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেন যে "এই সমাজবাদ কার্লমার্কসের পুঁথির পাতায় জন্মগ্রহণ করেনি।" পরবর্তী নওজোয়ান সম্মেলনেও কম্যুনিজম বা মার্কস্‌বাদের আদর্শ সম্বন্ধে ভারতীয় যুবমনকে সতর্ক করে দিয়ে নেতাজী বলেন, "বাইরে থেকে আলো ও অনুপ্রেরণা গ্রহণ করার সময় আমাদের ভুললে চলবে না যে, আমরা অন্য কোনো দেশকে অন্ধভাবে অনুকরণ করতে পারি না। অন্য দেশ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে তাকে অনুধাবন করার পরে আমাদের জাতীয় প্রয়োজনের অনুপাতে আমরা তার প্রয়োগ করবো।" কারণ, নেতাজীর মতে, "একটি দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ গড়ে ওঠে সে দেশের ভূগোল, ইতিহাস ও সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে।"

ভারতে একটি নতুন সমাজবাদী আদর্শ গড়ে উঠবে, যার চিন্তা-ধারা ও কর্মপন্থায় শুধু ভারতেরই কল্যাণ হবে না,—বিশ্বের কল্যাণ হবে,—এই কথাটি আবার স্মরণ করিয়ে দেন নেতাজী ১৯৩১ সালের নিখিল ভারত শ্রমিক সম্মেলনে। তিনি বলেন, "আমার মনে এতটুকুও সন্দেহ নেই যে ভারত তথা বিশ্বের মুক্তি নির্ভর করছে সমাজবাদের উপরে। ভারত অন্য দেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের কল্যাণে তা প্রয়োগ করবে, কিন্তু ভারতকে তার নিজস্ব প্রয়োজন ও পরিবেশ অনুযায়ী তার স্বকীয় কর্মপদ্ধতি রচনা করতে হবে। কোনো নীতিকে প্রয়োগ করতে গিয়ে ভূগোল ও ইতিহাসের কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। আমি মনে করি ভারত তার সমাজবাদের নিজস্ব কাঠামও গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। এমনও হতে পারে যে এই ভারতীয় সমাজবাদে এমন নূতনত্ব ও মৌলিকতা থাকবে যাতে বিশ্বের পক্ষেও কল্যাণ হবে।"

সোস্যালিজম বনাম কম্যুনিজম

নেতাজী সমাজবাদ ও কম্যুনিজমকে এক অর্থে গ্রহণ করেননি।

সমাজবাদী আদর্শকে তিনি কম্যুনিজমের মৌলিক দর্শন থেকে স্বতন্ত্র আদর্শরূপে কল্পনা করেছেন। তেমনি নেতাজী রাশিয়ার অন্ধ অনুকরণকেও সমর্থন করতে পারেননি। তিনি বহু ভাষণ ছাড়াও 'ভারতীয় সংগ্রাম' বইটিতে অতি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরীক্ষা হচ্ছে ভারত সুনিশ্চিত আগ্রহে তার পর্যালোচনা করবে এবং অনেক কিছু গ্রহণও করবে, কিন্তু "ভারত কখনও সোভিয়েট রাশিয়ার দ্বিতীয় সংস্করণে পরিণত হবে না।" অবশ্য নেতাজীর এই উক্তির তাৎপর্য এই নয় যে, নেতাজী সংকীর্ণ অর্থে কম্যুনিজম বা রাশিয়ার বিরোধী। বরং নেতাজী রাশিয়ার প্রতি সাগ্রহ ও সহমর্মিতার মনোভাব পোষণ করেছেন। ভারতের জনমন যে কম্যুনিজমের সমর্থক না হয়েও রাশিয়ার প্রতি সপ্রশংস ও বন্ধুত্বপূর্ণ হতে পারে ১৯৪৪ সালে টোকিও ভাষণে তার উল্লেখ করে নেতাজী বলেন, "ভারতের জনতা কম্যুনিস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে তেমন আগ্রহশীল হয়নি, যেমন হয়েছে রাশিয়ার পুনর্গঠন সম্বন্ধে। সোভিয়েট সরকারের পুনর্গঠন ব্যবস্থা আমাদের দেশকে আকর্ষিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের মত মনীষীদের কম্যু-নিজমের প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না,—কিন্তু রাশিয়ার শিক্ষা উন্নয়ন ব্যবস্থায় তিনি গভীরভাবে উৎসুক হয়েছিলেন।"

নেতাজী কেন কম্যুনিজম সমর্থন করতে পারেননি তার কারণ সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন: "প্রথমত, কম্যুনিজম জাতীয়তা-ধর্মের বিরোধী; দ্বিতীয়ত, নীতির দিক দিয়ে রাশিয়া বিশ্ব বিপ্লবের কথা বললেও রাশিয়ার আত্মস্বার্থরক্ষা প্রয়াসী; তৃতীয়ত, কম্যুনিস্ট মতবাদ ধর্মবিরোধী,—যে মনোভাব ভারতে কোনোদিন সমর্থন পাবে না; চতুর্থত, কম্যুনিস্ট মতবাদ ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত,—যে দর্শন ভারত কোন দিনই গ্রহণ করবে না; পঞ্চমত, মুদ্রানীতির দিক দিয়েও কম্যুনিজমের মধ্যে আকর্ষণীয় নূতন কিছু নেই।" নেতাজী অতি স্পষ্টাক্ষরে 'ভারতীয় সংগ্রাম' বইটিতে

কম্যুনিজমের সমালোচনা করে নিজের এই মতামত ব্যক্ত করেছেন। ১৯৪৪ সালে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষণেও তিনি কম্যুনিজম প্রত্যাখ্যান করার এই কারণগুলির পুনরুক্তি করেন। তিনি আরও বলেন, "কম্যুনিজমের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অনেক কিছু হয়ত ভারতীয় মনের কাছে প্রবল আবেদন সৃষ্টি করবে কিন্তু সমগ্রভাবে কম্যুনিস্ট মতবাদ ভারতে গৃহীত হবে না"।

নেতাজীর বহুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

একটি দেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শবাদ গড়ে ওঠে সে দেশের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজন, পরিবেশ ও মানসিকতার উপরে,—একথা নেতাজী ভারতের চিন্তাকামী মনকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই সমাজতাত্ত্বিক বহুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়াও দার্শনিক দিক দিয়েও নেতাজী কম্যুনিজমের একবাদী জীবন-দর্শনকে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করতে পারেননি। ১৯৩৪ সালে ভারতে কম্যুনিজম বনাম ফ্যাসীজমের একটি রাজনৈতিক বিতর্ক উঠেছিল। নেতাজী এই বিতর্কের প্রত্যুত্তরে বলেন, "আমরা যদি বিবর্তনের শেষ প্রান্তে এসে না থাকি অথবা বিবর্তনবাদকেই মূলত অস্বীকার না করি তা'হলে আমাদের যে কোনো একটি মতবাদকে অখণ্ড সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে তার কোনো অর্থ নেই। হেগেলিয়ান কি বর্গাসোঁনিয়ান,—কি অন্য যে কোনো বিবর্তনবাদেই আমরা বিশ্বাস করি না কেন,—সৃষ্টি শেষ সীমায় এসে গেছে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই।" এই কথাটিই তিনি আবার স্মরণ করিয়ে দেন ১৯৪৪ সালে। তিনি বলেন, "কোনো ব্যবস্থাই মানবপ্রগতির অন্তিম পর্যায় হতে পারে না। মানবপ্রগতির বিরাম নেই। অতীতের অভিজ্ঞতায় চিরকাল আমাদের নূতন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।"

জীবন-দর্শনের সূত্র-সমন্বয়বাদ

নেতাজী জড়বাদ, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বা নৈরাজ্য সমাজমার্গী একমুখী বিবর্তনবাদ তথা কম্যুনিজমের এই মূল দার্শনিক ভিত্তিকে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী বলে বস্তুজগতের বিভিন্ন রূপকে তিনি সত্যের আপেক্ষিক প্রকাশ বলে মনে করেন। নেতাজীর মতে বিবর্তনের ধারায় কোনো অন্তিম পর্যায় বলে কিছু নেই। 'আমার দার্শনিক মতবাদ' প্রবন্ধে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। কোনো জাতির সমাজ-দর্শন রচনায় বড় জোর আমরা সে জাতির পরিবেশ ও যুগধর্ম অনুযায়ী একটি সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী রচনা করতে পারি। যুগে যুগে এবং দেশে দেশে এই সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গীর মূল উপাদানের পরিবর্তন ঘটবে এবং মানবমনীষার সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বিভিন্নকালে সন্ধান করতে হবে সমন্বয়ের সুবর্ণ-সূত্র। নেতাজীর মতে ভারতবর্ষের এযুগের প্রয়োজন 'দেহ ও আত্মা', 'ব্যক্তি ও সমষ্টি', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'অতীত ও বর্তমান', 'জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তা'— এমনি বিভিন্ন ধর্ম ও সামাজিক গতির মূল্যমানের সমন্বয় সাধন করে একটি ভারতীয় সমাজবাদী জীবন-আদর্শ রচনা করা।

জরাজীর্ণ ভারতের ত্বরান্বিত প্রগতির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য "মুষ্টিমেয় ধনী বা কুচক্রীর ক্রীড়নকরূপে নয়,—জনগণের সেবক বা মুখপাত্ররূপে একটি কেন্দ্রানুগ রাষ্ট্র গঠনের" কথা বলেছেন নেতাজী। কিন্তু সেই সঙ্গে ১৯৩৩ সালের লণ্ডন-ভারতীয় সম্মেলনে, 'ভারতীয় সংগ্রাম' বইটিতে এবং হরিপুরা কংগ্রেস' ও রামগড় আপস-বিরোধী সম্মেলনের ভাষণে ভারতের রাষ্ট্র কাঠামোকে গণতন্ত্রের আদর্শ অনুসরণ করে "অতীতের গ্রামপঞ্চায়েতী শাসনের ভিত্তিতে নূতন সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলার" কথাও বলেছেন। নিম্নতম স্তরে সরাসরি গণতন্ত্র এবং ঊর্ধ্বতম স্তরে একটি সমাজবাদী কেন্দ্রানুগ

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা,—ভারতীয় রাষ্ট্র কাঠামো রচনার পরিকল্পনায় এই নেতাজীর মূল দৃষ্টিভঙ্গী।

নেতাজী সমন্বয়ী দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে সমাজবাদী আদর্শ রচনার কথা বলেছেন তা' কম্যুনিজমবিমুখী হলেও এই আদর্শবাদে সমন্বয়ের নামে আপসবাদ বা সুবিধাবাদের কোন অবকাশ নেই। ভারতের সামাজিক বর্ণভেদ ও আর্থিক শ্রেণী বিভাগ বিলোপ সাধনের প্রয়োজনীয়তাকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে নেতাজী তাঁর মতবাদে প্রকাশ করেছেন। সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতের জাতীয় পরিকল্পনা রচনার যে অভিমত তিনি হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে ব্যক্ত করেন এবং ভারতের জাতীয় পরিকল্পনার প্রথম উদ্যোক্তারূপে তিনি যে চিন্তাধারা প্রকাশ করেন সেই সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে আজিকার সমাজবাদী ধাঁচের আর্থিক পরিকল্পনার তুলনামূলক বিচার জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়ে কল্যাণপ্রসূ বলে বিবেচিত হবে। নেতাজী বলেন, "আমার মনে এতটুকুও সন্দেহ নেই যে, ভারতের দারিদ্র্য, ব্যাধি ও নিরক্ষরতার প্রধান সমস্যার সমাধান এবং বৈজ্ঞানিক পন্থায় উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হবে সমাজবাদী উপায়ে। জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য জমিদারী উচ্ছেদ সহ ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করতে হবে। কৃষি-ঋণ-মুক্তির ব্যবস্থা সহ গ্রামবাসীদের সহজ ঋণদানের এবং উৎপাদক ও গ্রাহকদের জন্য সমবায়ী সংগঠন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ও উদ্যোগে ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বৃহৎ শিল্পের উৎসাহদান সত্ত্বেও কোন্ কোন্ কুটীর-শিল্পের পুনরুদ্ধার করা হবে পরিকল্পনা কমিশনকে তার সতর্ক বিচার করতে হবে। শিল্পোন্নয়নের নীতি আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে. এবং সেই সঙ্গে তার কুপ্রভাবও রোধ করতে হবে এবং কারখানার প্রতিযোগিতা উত্তীর্ণ করে কোন্ কোন্ কুটীর-শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলা যায়,—তার সম্ভাবনারও সন্ধান করতে হবে। ভারতের মত দেশে

কুটীর-শিল্পের প্রচুর সুযোগ রয়েছে,—বিশেষ করে কৃষির সংগে সংযুক্ত চরখা ও তাঁত বস্ত্রের মত শিল্পাদির। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উৎপাদন ও বণ্টন উভয় ক্ষেত্রেই সমগ্র কৃষি ও শিল্পকে ক্রমশ সমাজবাদী ব্যবস্থায় রূপান্তরের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে ব্যাপক নীতি গ্রহণ করতে হবে।”

ভারতীয় সমাজবাদ

সংকীর্ণ অর্থে রুশ বিরোধিতা বা কম্যুনিজমের বিরোধিতা করার জন্যই তিনি কম্যুনিজমকে পরিহার করেননি। তিনি রুশিয়ার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবপ্রগতির আলোতে একটি অধিকতর অগ্রণী জীবন-দর্শনের সন্ধানে কম্যুনিজমের চেয়েও প্রগতিশীল জীবনবাদরূপে সমন্বয়ধর্মী সমাজবাদের আহ্বান জানিয়েছেন ভারতকে। ১৯৩৩ সালে লণ্ডন সম্মেলনে নেতাজী স্বাধীন ভারতের ভাবী জনমনকে লক্ষ্য করে বলেন, “ভারত যখন স্বাধীন হবে তখন ভারতে নূতন ও মৌলিক পরীক্ষার প্রয়োজন হবে। নিকট ভবিষ্যতে ভারত আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। সতের শতাব্দীতে ইংলণ্ড বিশ্বকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের চিন্তাধারা উপহার দেয়। ফ্রান্স সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বের সংস্কৃতিকে নূতনভাবে সমৃদ্ধ করে। উনিশ শতাব্দীতে জার্মানী মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বের সামনে বিশিষ্ট অবদান তুলে ধরে। বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া প্রোলেটারিয়েটের রাষ্ট্র গঠন করে বিশ্বকে সমৃদ্ধ করে তোলে। বিশ্বের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি-জীবনে এর পরবর্তী অবদান তুলে ধরতে হবে ভারতকে।” ভারতে সমাজবাদী আন্দোলনকে নূতন স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ১৯৪৪ সালে নেতাজী আবার স্মরণ করিয়ে দেন, “বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের পথে ভারতকে পরবর্তী অধ্যায়ে এগিয়ে যেতে হবে।”

ভারতের সমাজবাদী আন্দোলনের ভাবাদর্শে এক মৌলিক

চিন্তাধারার ভূমিকা রচনা করেছেন নেতাজী। ভারতের সমাজবাদী চিন্তাধারা যে আজ বহু পরিমাণে তত্ত্ববাগীশতামুক্ত হয়ে স্বচ্ছন্দ ও সৃজনশীল হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে, তার পিছনে রয়েছে নেতাজীর স্বাধীন মনোভাবের মৌলিক অবদান। ভারতের সমাজবাদী ভাবধারার প্রসারে নেতাজীর এই অবদান শুধু অন্যতম প্রচারকরূপেই নয়, সমাজবাদী আদর্শের ব্যাখ্যায় মৌলিক চিন্তাধারা প্রকাশের অগ্রণীরূপেও তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাসে।

—আনন্দবাজার

মানুষ গড়ার সাধনা

ভারতের যুব আন্দোলনের প্রধান উদ্‌গাতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র। মান্দালয় জেল থেকে মুক্তি পেয়ে অগণিত যুব ও ছাত্র সম্মেলনের সভাপতিরূপে ভারতের যৌবনশক্তিকে তিনি আমন্ত্রণ জানান আত্মত্যাগী অগ্নিব্রতের দুর্জয় সংকল্প অনুসরণে।

অতীতের জরাজীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থাকে ভেঙে-চুরে নতুন জীবন রচনার চিরবিদ্রোহে তিনি উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চেয়েছেন ভারতের যৌবন-শক্তিকে। তাই তিনি স্বাধীনতার কল্পনাকে প্রাণবন্ত করে গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখেছেন নতুন সমাজ-দর্শনের আদর্শে। গুপ্ত বিপ্লববাদী আন্দোলনকে তিনি সম্প্রসারিত করেছেন ব্যাপক গণ-আন্দোলনের বৃহত্তর মুক্তি-সংগ্রামে।

কিন্তু যুব আন্দোলনের আদর্শরূপে তিনি সবচেয়ে বড় স্থান দিয়েছেন মানুষ গড়ার সাধনাকে। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, খাঁটি মানুষ ছাড়া কোন 'ইজম' দিয়ে কোন বড় কাজ হয় না। মানুষ গড়ার সাধনাই যে যুব আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য—নেতাজী-পরিকল্পিত যুব আন্দোলনের সেই আদর্শ-বাদের উপরে রশ্মিপাত করা হয়েছে—'যুব আন্দোলনের উদ্‌গাতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র, এবং 'নওজোয়ানের নেতা নেতাজী' প্রবন্ধ দুটিতে।

বাংলার যুবচিত্ত আজ বিক্ষুব্ধ, বিভ্রান্ত। সমাজ-বিপ্লবের প্রবল আগ্রহে প্রচণ্ড মন্থন শুরু হয়েছে বাংলা ও ভারতের যুব-জীবনের অনুভূতিতে। এই বৈপ্লবিক আলোড়নকে সৃজনশীল ভূমিকায় সার্থক করে তুলতে পারে নেতাজীর জীবনবাদ। নেতাজীর আদর্শই ভারতের নবজীবনায়ণের আদর্শ।

যুব-আন্দোলনের উদ্‌গাতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র

স্বদেশ সেবাব্রতে নেতাজীর প্রথম অভ্যুদয় যুব আন্দোলনের অগ্রদূতরূপে। বস্তুত, বিশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে নেতাজী ছিলেন ভারতের তারুণ্য ও যৌবনশক্তির ভাস্বর প্রতীক। নেতাজীর কর্ম ও বাণীতে ভারতের যুব আন্দোলন সেযুগে প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে,—এক নূতন স্বপ্ন ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে ভারতে যুব-মানস। নেতাজী যত ছাত্র ও যুব সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন,—ভারতের নব-জাগ্রত তরুণ-শক্তির সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রেখেছেন,—ভারতের আর কোনো জাতীয় নেতার পক্ষেই যুবমনের সঙ্গে তেমনভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। নেতাজীর আগেও যুব আন্দোলন ছিল, কিন্তু সে আন্দোলন ছিল প্রধানতঃ রাজনৈতিক আন্দোলনের অনুচ্ছেদরূপে। ১৯০৫ সালে স্বদেশী-যুগে বাংলাদেশে যে ছাত্র তথা যুব জাগৃতি দেখা দেয় কিছুকালের মধ্যেই তা' বৈপ্লবিক আন্দোলনের অপ্রকাশ্য পথে আত্মগোপন করে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিতে যুব আন্দোলন আবার কর্মমূর্ত হয়ে ওঠে অসহযোগ আন্দোলনের সরকারী শিক্ষায়তন বয়কট করার কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুব আন্দোলনও নিষ্প্রভ হয়ে যায়। শুধু খাদি ও গঠনমূলক কর্মপন্থা সেদিনের যুবমনের ক্ষুধা

মেটাতে পারেনি। ভারতের যুব-মন নূতন বাণী ও নূতন প্রেরণায় ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে যুবনেতা সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে। মান্দালয় জেল থেকে মুক্তিলাভের পরে সেদিনের যুবনেতা সুভাষচন্দ্র যেন রুদ্র ঝঞ্ঝার মত ঘুরে বেড়ান ভারতের প্রান্তে প্রান্তে। অগণিত ছাত্র ও যুব-সমাবেশে সম্মিলিত হয়ে গড়ে তোলেন যুব আন্দোলনের এক নূতন ভিত্তি। নেতাজীর কর্ম ও বাণীতে ভারতের যুব আন্দোলন সেদিন এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করে। নিছক রাজনৈতিক আন্দোলনের পুচ্ছ হওয়ার পরিবর্তে এক স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনরূপে গড়ে ওঠে ভারতীয় যুব আন্দোলনের পটভূমিকা।

যুব আন্দোলনের প্রকৃতি

যৌবন-শক্তি চির অশান্ত, চির অবুঝ। অকারণে ঔদ্ধত্য অপ্রয়োজনে দুর্বার বিদ্রোহ, চির-চাঞ্চল্যের উদ্দাম প্রাণধারায় ঊর্মি-মুখর অপরিমিত উচ্ছ্বাস,—এই যৌবনের ধর্ম। যৌবনের এই ধর্মে যেন আগুনের আকৃতি। যৌবন ভাঙতে পারে, গড়তেও পারে; আত্মবিলোপ করতে পারে, আবার আত্মবিকাশও ঘটাতে পারে। যৌবনের এই ধর্মকে স্মরণ রেখেই নেতাজী যুব আন্দোলনের প্রকৃতি নির্ণয় করে বলেন, "যুব আন্দোলন হল স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অসন্তোষের প্রতিমূর্তি। এই আন্দোলন অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং যুগ-যুগাগত বন্ধনের চির-বিরোধী। এই আন্দোলন সমস্ত রকম বাধা-বন্ধন দূর করে নূতন ও কল্যাণকামী বিশ্ব-রচনার স্বপ্ন-প্রয়াসী। অস্থিরতা ও অসন্তোষ তাই যুব আন্দোলনের প্রধান লক্ষণ। বন্ধন থেকে মুক্তি, সংস্কার ও চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, মানবতা-বিরোধী স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান,—এই যুব আন্দোলনের মূল আহ্বান। অন্ধ আনুগত্য এবং যুক্তিহীন বশ্যতার পরিবর্তে আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-প্রতীতে চলার দিকেই এই আন্দোলনের

প্রাবল্য।" যৌবনের ধর্মকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করা বা একে অবদমিত করে বশংবদ পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করার প্রয়াস ব্যর্থ হতেই শুধু বাধ্য নয়,—যে জাতি তার যৌবনশক্তিকে স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে, সে জাতির যৌবন-শক্তি আত্মদহন ও স্বধর্ম বিচ্যুতির পথে বিনষ্ট হয়ে যায়,—জাতীয় সৃজনশীলতার প্রগতি সম্ভাবনাও ক্ষুণ্ণ হয়ে জাতীয় বিকাশ ব্যাহত হয়। যে জাতির যৌবন-শক্তির সামনে কোনো আশা নেই, আদর্শ নেই, যৌবনের আগুনকে সহস্র দীপাবলীর আলোক-সজ্জায় জ্বালিয়ে তোলার রোমাঞ্চকর আহ্বান নেই,—সে জাতির ভবিষ্যৎও নেই। নেতাজী তাই চেয়েছিলেন নূতন সমাজের এক নূতন স্বপ্নে ভারতের যুব-মানসকে প্রাণবন্ত করে তুলতে।

নতুন সমাজের স্বপ্ন

নেতাজী ভারতের যুব আন্দোলনের সামনে এক নতুন জীবনায়নের বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য রেখে বলেন, "যুব আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল এক নূতন আদর্শের প্রেরণায় সমগ্র জীবনকে নূতনভাবে গড়ে তোলা। এই আদর্শ আমাদের জীবনে এনে দেবে এক অনাগত জীবনের সংকেত। এই আদর্শ হল সর্বাঙ্গীণ মুক্তি ও পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের আহ্বান···যা আমরা চাই তা' হল সার্বিক জাগৃতি—যার স্পর্শে আমাদের জীবনে আসবে আমূল রূপান্তর। খানিকটা সংস্কারে চলবে না, উপরে উপরে চুনকাম করেও কোনো লাভ নেই। প্রয়োজন আজ আমাদের সমগ্র জীবনের নব পরিগ্রহ তথা পরিপূর্ণ বিপ্লব সাধন। নেতাজী অনুভব করেছিলেন ভারতের যুবশক্তিকে যদি নূতন সমাজের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করে না তোলা যায়, যদি সমাজ-বিপ্লবের কর্মপ্রেরণায় তাদের প্রাণধারাকে উদ্দাম করে দেওয়া না যায় তা'হলে নূতন ভারত রচনা করা কোনো দিনই সম্ভব হবে না। জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে যুবশক্তির উপরে। সেই

যুবশক্তির দৃষ্টি যদি ভবিষ্যতের কল্পনায় উদ্দীপ্ত হয়ে না উঠে তা'হলে সমগ্রভাবে জাতীয় বিপ্লবসাধনও সম্ভব নয়, ভারতের ন্যায় জরাজীর্ণ জাতিকে বলিষ্ঠ অভ্যুত্থানে পুনর্গঠিত করাও সম্ভব নয়। নেতাজী তাই সমাজ-বিপ্লবের মাধ্যমে নব-ভারত রচনার আহ্বানে ভারতের যুব-সমাজকে বিশেষভাবে বেগবান করে তুলবার চেষ্টা করেন।

জাতীয় জীবনে ত্রিমুখী বিভ্রান্তি

সে যুগে ভারতের যুব-জীবনের সামনে ছিল ত্রিমুখী বিভ্রান্তি। আজকের যুব-জীবনও এই বিভ্রান্তির প্রকোপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পায়নি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এই বিভ্রান্তি আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। সমাজ-বিপ্লবের মাধ্যমে যে নব-জীবন রচনার আমন্ত্রণ এসেছে ভারতের জনজীবনে তার প্রগতি হবে কোন্ পথে? একটি মতের আহ্বান প্রাচীন ভারতের দিকে এবং ঐকান্তিক অধ্যাত্ম-সাধনার ব্যক্তিক প্রয়াসের পথে। দ্বিতীয় কণ্ঠের আমন্ত্রণ,—ভারতের সব-কিছুকে অস্বীকার করে পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুসরণে এবং তৃতীয় মতের নির্দেশ হল রুশিয়া বা কম্যুনিজমের আদর্শবাদের অনুসরণে। নেতাজী ভারতের যুব-মানসকে বার বার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, এই তিনটি পথই আবেগান্ধ আতিশয্যের বিভ্রান্ত সংকেত মাত্র। তিনি ভারতের যুব-সমাজকে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, কোন মত বা কোন পথের অন্ধ অনুসরণ নয়,—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তিবাদই হবে যুব-জীবন-দর্শন রচনার মূল নিয়ামক। কোন্ পথে ভারতের কল্যাণ হবে, কোন্ পথে পদক্ষেপ করবে ভারতের যুবশক্তি, কোন্ পথে সম্ভব হবে যুগধর্মসাপেক্ষ নূতন সমাজ রচনা করা,—তার গতি অনুধাবনের আগে স্মরণ রাখতে হবে যে, "একটি দেশের জাতীয় আদর্শ গড়ে ওঠে তার ইতিহাস, প্রয়োজন ও পরিবেশের প্রভাবের উপরে। যে মতবাদই আমরা

গ্রহণ করি না কেন, তাকে যদি সার্থক করে তুলতে হয় তা'হলে সবার আগে মনে রাখতে হবে আমাদের অতীত ইতিহাসের ধারা, আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং জাতীয় প্রয়োজনের কথা।"

প্রাচীন ভিত্তিতে আধুনিক ভারত

নেতাজী একান্তচিত্তে ভারত-প্রেমিক এবং জীবনের অধ্যাত্ম-মূল্যে বিশ্বাসী। তিনি ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করে ভারতের যুব-শক্তিকে বার বার একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, "মিশর বা ব্যাবিলন, ফোয়েনিশিয়া বা গ্রীসের মত ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতা মরে যায়নি। আমাদের পূর্ব-পুরুষের মত আজও আমাদের জীবনে মূলত একই চিন্তা একই জীবনের আদর্শ এবং একই অনুভূতির প্রভাব রয়েছে।...অন্য কথায় অতীতকাল থেকে আজকের দিনেও ভারতবাসীর জীবনে একই ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত রয়েছে। এরূপ ধারা ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। অনেক সময় নূতন প্রভাব, নূতন আদর্শ ও নূতন সংস্কৃতিকেও ভারতের জাতীয়-জীবন ধীরে ধীরে আপন করে নিয়েছে। আমাদের জাতীয়-জীবনে কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারা অব্যাহত রয়েছে তথাপি সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে আমাদের পরিবর্তনও রয়েছে, আমরা প্রগতিও করেছি।" তিনি আরও বলেছেন, "আমাকে অন্ধ-জাতীয়তাবাদী বলা হলেও আমি বলবো যে, ভারতের একটি বাণী আছে। আধুনিকতার অতি আগ্রহে আমাদের অতীত গৌরবকে ভুললে চলবে না।... অতীতের ভিত্তিতে আমাদের একটি আধুনিক জাতি গড়ে তুলতে হবে। ভারতের সংস্কৃতিকে তার নিজস্ব ধারায় বর্ধিত করতে হবে। এককথায় আমাদের অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে হবে। 'বেদের যুগে ফিরে চলো'—এই আহ্বানকেও যেমন আমাদের বাধা দিতে হবে তেমনি আমাদের আধুনিক পাশ্চাত্য

জগতের নিত্য-নতুন বিলাস ও ব্যসনের অত্যুগ্র আমন্ত্রণকেও রোধ করতে হবে।”

নেতাজী গভীরভাবে অধ্যাত্মবাদের অনুসারী হয়েও ভারতের যুব-শক্তিকে ব্যক্তিসর্বস্ব অধ্যাত্মবাদের আতিশয্য সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। অধ্যাত্ম-সাধনায় উচ্চশ্রেণীর মহামানব ভারতে কম আবির্ভূত হয়নি, কিন্তু আজ প্রয়োজন 'নিষ্কর্ম সাধনা' নয়,—একটি কর্মবাদের 'জীবন-দর্শন' এবং 'সম্মিলিত কর্মযোগ' ও অধ্যাত্মমূল্যের সঙ্গে ঐহিক উদ্যমের সমন্বয় সাধন। নেতাজী ভারতের যুব-মনকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, “শত শত মহাপুরুষ এদেশে আবির্ভূত হয়েছেন, অথচ তাঁদের আবির্ভাব সত্ত্বেও জাতি আজ কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় পড়ে রয়েছে। জাতিকে আবার বাঁচতে হলে আমাদের সাধনার ধারা অন্য-পথে পরিচালিত করতে হবে। জাতিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিত্বের সার্থকতা নেই। আজ আমাদের প্রয়োজন হল 'সম্মিলিত সাধনা' ('Collective Sadhana')।” তিনি নবভারতকামী যুবমানসকে আরও স্মরণ করিয়ে দেন, “অধ্যাত্ম-জীবনের দিকে একান্ত দৃষ্টি দেওয়ায় বিজ্ঞানের প্রগতি উপেক্ষিত হয়েছে, দৈহিক ও পার্থিব জীবনে আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি। ভারতের ইতিহাসে সেইদিনই ছিল গৌরবময় যুগ, যেদিনে জড় ও চেতন, দেহ ও আত্মার দাবীর সুবর্ণ সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়েছিল। আজকের ভারতবর্ষ দেহের লাঞ্ছনাতেই ভুগছে না, আত্মার ক্ষীণতায়ও ভুগছে। আজ আমাদের আবার দুদিকেই এগিয়ে যেতে হবে।” সনাতন ভারতের নামে পশ্চাদ্গামী হওয়া নয়, আবার আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্যের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দেওয়াও নয়,—আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবদানের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের মূল্যমানের সমন্বয় সাধন করে গড়ে তুলতে হবে নতুন দিনের নতুন ভারত। ভারতের নবজাগ্রত যুবমানসের কাছে এই নেতাজীর আহ্বান।

ভারতীয় সমাজবাদ

নেতাজী ভারতের যুবমনকে সমাজ-বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে যারা সমাজবিপ্লবের নামে রুশ বিপ্লবের অন্ধ অনুসারী বা ভারতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার আগ্রহে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী নেতাজী তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, তিনি সমাজবিপ্লব সাধনের জন্য যে সমাজবাদী আদর্শের কথা বলেছেন, সেই "সমাজবাদ কার্ল মার্কসের পুঁথির পাতায় জন্মগ্রহণ করেনি,—তার জন্ম হয়েছে ভারতের মনীষায়।" তিনি করাচীর নওজোয়ান সম্মেলনে ভারতের সমাজবিপ্লব প্রয়াসী যুবমনকে লক্ষ্য করে বলেন, "বাইরে থেকে আলো ও অনুপ্রেরণা গ্রহণ করার সময় আমাদের ভুললে চলবে না যে, আমরা অন্য কোনো দেশকে অন্ধভাবে অনুকরণ করতে পারি না। অন্য দেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাকে অনুধাবন করার পরে আমাদের জাতীয় প্রয়োজনের অনুপাতে তার প্রয়োগ করবো আমরা।" নেতাজী রাশিয়া বা কম্যুনিজম সম্বন্ধে অন্ধ জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ আবেগে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেননি। বরং রাশিয়ার শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টা ও সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানের বহু প্রশংসা করেছেন তিনি এবং বহুক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সহানুভূতির মনোভাবও ব্যক্ত করেছেন। তবু অতি সুস্পষ্ট কণ্ঠে নেতাজী বলছেন, "ভারত কখনো রাশিয়ার নূতন সংস্করণে পরিণত হবে না।" তেমনি আর্থিক নীতির দিক দিয়ে কম্যুনিজমের কিছু অংশ সমর্থন করেও কম্যুনিস্ট মতবাদের দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তির সমালোচনা করে নেতাজী বলেছেন, "বিভিন্ন মতের মধ্যে অল্পবিস্তর সত্য আছে কিন্তু নিরন্তর প্রগতিশীল জগতে কোনো মতবাদকেই চরম সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না।" নেতাজীর মতে ভারত সব দেশের আদর্শবাদকেই পর্যালোচনা করবে, কিন্তু "ভারতকে নিজস্ব ধারায় সমাজবাদের নিজস্ব রূপ ও পদ্ধতি রচনা করতে হবে। আমার

এতটুকুও সন্দেহ নেই যে, ভারত তথা বিশ্বের মুক্তি নির্ভর করছে সমাজবাদের উপরে। ভারতে যে সমাজবাদ গড়ে উঠবে, মৌলিকতা ও নূতনত্বে তা হবে অনেক দিক দিয়ে বিশিষ্ট,—যাতে বিশ্বেরও কল্যাণ হবে।" নেতাজী ভারতের যুবমানসকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "সতের শতাব্দীতে ইংলণ্ড বিশ্বকে কন্‌স্টিট্যুশন্যাল বা গঠনতান্ত্রিক চিন্তাধারা উপহার দিয়েছে। ফ্রান্স দিয়েছে আঠার শতাব্দীতে সাম্য মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রের বাণী। উনিশ শতাব্দীর জার্মানী বিশ্বকে দিয়েছে মার্কসীয় দর্শন এবং বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া প্রোলেটারিয়েট সরকার গঠন করে বিশ্বকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশ্বের সংস্কৃতি-জীবনে এর পরবর্তী অবদান তুলে ধরতে হবে ভারতকে। বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের পথে ভারতকে এগিয়ে যেতে হবে পরবর্তী অধ্যায়ে।"

যুব আন্দোলনের গোড়ার কথা

নেতাজী ভারতের যুবমানসের সামনে সমাজবাদী আদর্শ প্রতিষ্ঠার বৈপ্লবিক আহ্বান তুলে ধরেছেন। যুবজীবনকে স্বপ্নচারী ত্যাগব্রতী এবং স্বদেশানুরাগী করে তোলার জন্য এবং দুর্বার কর্মের আগ্রহে প্রাণপ্রবাহ সৃষ্টির জন্য একটি জীবন্ত আদর্শবাদের প্রয়োজন। কিন্তু এই আদর্শবাদ হল আকাশচুম্বী সৌধের মত। যদি এই সৌধের গেড়ায় সুদৃঢ় ভিত্তি না থাকে তা'হলে কোনো সৌধ রচনা করা সম্ভব নয়। তেমনি আদর্শবাদ যত উজ্জ্বল, যত প্রাণবন্ত বা যত বৈপ্লবিকই হোক না কেন, আদর্শবাদীর জীবনের ভিত্তি যদি সুগঠিত না থাকে, তা'হলে আদর্শবাদের মূল্য রঙিন তাসের ঘরের চেয়ে বেশি নয়। নেতাজী তাই ভারতের যুবমানসকে যুব-আন্দোলনের গোড়ার কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, "এক একটি ইজমের গোঁড়া ভক্তরা মনে করেন যে, ঐ মতের প্রতিষ্ঠা হলেই পৃথিবীর সব দুঃখ দূর হবে। আজকাল তাই ইজমের লড়াই খুব ঘনিয়ে উঠেছে।



আমার নিজের কিন্তু বিশ্বাস কোনো ইজমের দ্বারাই মানব-জাতির মুক্তি সম্ভব নয়, যদি না সবার আগে আমরা মানুষের ন্যায় শক্তি অর্জন করতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলতেন,—মানুষ গড়াই আমার সাধনা—Man-making is my mission ;—জাতি গঠন এবং যে-কোনো ইজম প্রতিষ্ঠার মূল বনিয়াদ হল খাঁটি মানুষ। খাঁটি মানুষ তৈরী করাই হবে যুব-আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।" তিনি আরও বলেন, "ভারতের হীন অবস্থা কেন? আছে তো সবই,—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শারীরিক বল, শিক্ষা-দীক্ষা শৌর্য-বীর্য, বিদ্যা-বুদ্ধি কিছুরই তো অভাব নেই। আছে আমাদের সবই, নেই শুধু একটি বস্তু—উদ্দেশ্য সাধনের দৃঢ়তা—tenacity of purpose। উদ্দেশ্য সাধনের দৃঢ়তা বা নৈতিক বল—tenacity of purpose বা moral stamina—কোথায় পাব আমরা? ঘরে বসে সাধনা করে বা সংসার ত্যাগ করে শক্তি সঞ্চয় হয় না,—শক্তি আসে নিষ্কাম কর্ম ও অবিরাম সংগ্রামে জীবন ঢেলে দিয়ে।"

যুব আন্দোলনের উদ্দেশ্য

যুব আন্দোলন নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন নয়,—আবার রাজনীতিবর্জিত সংস্কারপন্থী আন্দোলনও নয়। নিছক 'ইজম' বা মতবাদের লড়াই করাও যুব আন্দোলনের লক্ষ্য নয়। যুব আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ভারতের যুবশক্তিকে কর্ম ও মানসে বলিষ্ঠ ও আদর্শবতী করে গড়ে তুলে সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রাণবন্ত ধারায় ভারতের জাতীয় জাগৃতির ধারাকে অব্যাহত রাখা। যুব আন্দোলন সুনিশ্চিতভাবে জাতীয় আন্দোলন, কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। নেতাজী তাই বলেছেন, "কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ মনে করে থাকেন যে, যুব আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের নামান্তর মাত্র,—কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। যুব আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, কিন্তু তাই বলে অ-রাজ-

নৈতিকও নয়। রাজনীতি বর্জন করা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়। এই আন্দোলনে রাজনীতির স্থান আছে কিন্তু তাই বলে যুব আন্দোলন নিছক রাজনৈতিক আন্দোলনও নয়। এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য শারীরিক শক্তি, মানসিক তেজ, নৈতিক বল, শৌর্য, বীর্য,—সব দিক দিয়ে মানুষ গড়ে তোলা এবং…কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পকলায়, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ব্যায়াম-ক্রিয়ায় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় তারুণ্যশক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটান এবং শতমুখী প্রাণধারায় তাদের বিকশিত করা। নেতাজী তাই ছাত্র ও যুব আন্দোলনের সামনে একটি সুচিন্তিত কর্মসূচী রেখে বলেন, "এই আন্দোলন ও সংগঠনের লক্ষ্য হবে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষাদান,—যাতে ব্যক্তিগতভাবে ও সম্মিলিতভাবে ছাত্র ও যুবকেরা ভারতের বলিষ্ঠ মানুষ ও বলিষ্ঠ নাগরিকে পরিণত হতে পারে।" তিনি তাই এই কর্মসূচীকে বিস্তৃত করে ছাত্র ও যুবসমাজকে পথনির্দেশ দিয়ে আরও বলেন, "যুবসমাজের কল্যাণের জন্য কো-অপারেটিভ বা সমবায় সংঘ গড়ে তুলতে হবে। তাদের কাজের তালিকায় গ্রহণ করতে হবে দেহচর্চার জন্য সমিতি গঠন, ব্যায়ামাগার গড়ে তোলা, আলোচনা বৈঠক ও বিতর্ক সভার আয়োজন করা, পত্র-পত্রিকা লেখা, সঙ্গীতের আসর গড়ে তোলা, লাইব্রেরী ও পাঠাগার গঠন করা এবং সমাজসেবার বিভাগ খোলা ইত্যাদি কর্মসূচীর প্রোগ্রাম।"

সমাজবাদী সংস্কৃতি

স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে যুবমনের স্বপ্ন ছিল,—জাতীয় স্বাধীনতা। স্বাধীনতার আদর্শে তাদের প্রাণ-মন ছিল উদ্বুদ্ধ। কিন্তু স্বাধীনতার যুগে যুবমন কোন্ স্বপ্নের স্পর্শে উদ্দীপিত হয়ে উঠবে? সমাজবাদ হবে যুবমনের এই জীবন-কাঠি। সমাজবাদী স্বপ্নে, সমাজবাদী কল্পনায়, সমাজবাদী মূল্যায়নে সমাজবাদী মানুষ গড়ে তোলার

আমন্ত্রণে এক সমাজবাদী সংস্কৃতির সর্বময় মানস রচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন নেতাজী। এই সমাজবাদী সংস্কৃতি রাজনীতি ও অর্থনীতির তাৎপর্যে সীমাবদ্ধ নয়,—এই সমাজবাদী সংস্কৃতির মূল আবেদন জীবন-মূল্য ও সমাজ-মূল্যে। সমাজবাদ মানব-সভ্যতার নূতন মূল্যায়ণ, মানুষে মানুষে নূতন সাম্য ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক স্থাপনের নূতন আবেদন। শুধু রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও অর্থ-ব্যবস্থার পরিবর্তন করে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন মানুষের সমাজ-মূল্য-বোধের রূপান্তর। এরূপ রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন সমাজবাদী সংস্কৃতি এবং মানুষে মানুষে নূতন সম্পর্ক রচনার উদ্দেশ্যে সমাজবাদী মানুষ রচনা করা। নূতন সমাজ-মূল্যের কল্পনায় সমাজবাদী মানুষ রচনার উদ্দেশ্যে তাই আবশ্যক এক সমাজবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা। নেতাজী এই সমাজবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রদূতের ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন স্বাধীন ভারতে যুব সম্প্রদায়কে। সমাজবাদী সংস্কৃতির আবেদনে 'সমাজবাদী মানুষ' রচনা করা হবে যুব আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। যুব সমাজের প্রতি এই নেতাজীর নির্দেশ।

যুবমানসের সামনে যদি নূতন সমাজবাদী সমাজ রচনার জীবন্ত আদর্শ প্রদীপ্ত ভাস্করের মত উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাকে এবং এমনি গঠনমূলক কর্মসূচীর পথে যদি যুব আন্দোলন সমাজবাদী মানুষ গড়ার সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, তবেই বলিষ্ঠ যুব আন্দোলনের পথে আগামী দিনের বলিষ্ঠ জাতীয় জীবন রচনা করা সম্ভব। চির-উদ্দামধর্মী যৌবনশক্তিকে যাঁরা কারণে-অকারণে নিন্দাবাদ করে থাকেন, তাঁরা যদি নেতাজীর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ভারতের যুবমানসের প্রাণধর্মকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেন এবং নূতন সমাজ গঠনের একটি জীবন্ত আদর্শের পটভূমিতে যদি গঠনমূলক কর্মসূচীতে যুব-জীবনকে আত্মগঠনের পথে প্রবাহিত করতে পারেন,—তবেই আজিকার বিচ্যুতি থেকে ছাত্র ও যুবশক্তিকে জীবনব্রতের পথ-

সন্ধানে সার্থক ও সাগ্রহী করে তুলতে পারবেন। জাতীয় জীবনের জীবন্ত আদর্শ ও আত্মগঠনের সুষ্ঠু কর্মপন্থার আমন্ত্রণ পেলে যুবপ্রাণ আলোকের সহস্র-শিখায় সুদীপ্ত হয়ে উঠবে,—নইলে স্বধর্মের তাড়নায় আগুনের স্ফুলিঙ্গ হয়ে জাতীয় জীবনকে বারবার ধ্বংস ও দহনের পথে ঠেলে দেবে।

—যুগান্তর

নওজোয়ানের নেতা নেতাজী

যুবচিত্ত চিরকাল অশান্ত। নিরন্তর সবুজ, চির-ত্যাভাংভঞ্চারধর্মী নওজোয়ান মন। যুবচিত্তে হয় নতুন কোন আদর্শের সন্ধানে বন্যা বইবে, নয়তো বন্ধ্যা আক্রোশে নিজেদের অবক্ষয়েই তারা প্রমত্ত হয়ে উঠবে। তারুণ্যের এই স্বধর্ম অপ্রতিরোধ্য।

তারুণ্য স্বধর্মের এই মৌলিক বৃত্তি ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের মধ্যে সবচেয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে অনুভব করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। তিনি শুধু তরুণ মনের এই চিরচাঞ্চল্যের আবেগটিকেই অনুভব করেননি,—তরুণদেরই একজন হয়ে গড়ে তুলেছিলেন ভারতীয় নওজোয়ান সমাজের যুগধর্মী আদর্শ। নেতাজী ভারতের ছাত্র ও যুব আন্দোলনের স্রষ্টা ও সংগঠক এবং তিনিই তুলে ধরেছিলেন নতুন ভারতের নতুন প্রাণের উপযোগী বৈপ্লবিক জীবনবাদ। নেতাজী যত যুব ও ছাত্র আন্দোলনের সভাপতিত্ব করেছেন,—তিনি তাঁদের জীবনের সামনে নতুন আদর্শবাদের মশাল জ্বেলে দিয়েছেন—তেমন করে আর কোন ভারতীয় নেতাই নওজোয়ান মনের এমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী দিশারী হতে পারেননি।

নেতাজী বারবার বলেছেন যে, নওজোয়ান মন হল চির অশান্ত, চির দুর্মদ,—চিরকালের বিদ্রোহের ধারা তাদের প্রতি রক্তকণায়। তারা সুশীল সুবোধ বালকের মত গতানুগতিকতার কঙ্কাল বন্ধনে

আবদ্ধ হয়ে স্থবির হয়ে থাকতে চায় না। অত্যাচার, উৎপীড়ন, শোষণ, নিপীড়ন ও জরাজীর্ণ সমাজবন্ধনের গণ্ডী ভেঙ্গে তারা চায় নতুন জীবনের সন্ধান। এই সন্ধানের দীপাবলী যদি নওজোয়ান মনের সামনে জ্বালিয়ে দেওয়া যায়, তা'হলেই যুবমন হবে প্রবল সৃজনধর্মী। স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব ভারতীয় যুব সমাজের সামনে সেই নতুন জীবনের দিগ্‌দর্শনের জীবনবাণী তুলে ধরতে পারেনি বলেই ভারতীয় নওজোয়ান মন আজ বিভ্রান্ত ও আত্মবিনাশকামী।

নেতাজী ভারতীয় যুবমনকে সব চেয়ে আগে আকর্ষিত করতে চেয়েছেন ভারতের জাতীয়তাবাদের মর্মবাণীর প্রতি। নেতাজী বারবার একথা বলেছেন "আমাকে কেউ অন্ধ স্বাদেশিক বলতে পারেন, শ্যাভেনিক আখ্যা দিতে পারেন কিন্তু তবুও আমি বলবো ভারতের একটি বাণী আছে,—ইণ্ডিয়া হ্যাজ এ মিশন টু ফুলফিল। বিশ্বের কৃষ্টি ও সভ্যতায় ভারতের মৌলিক কিছু দেবার আছে।" বিশ্ব ইতিহাসের গতি বিশ্লেষণ করে নেতাজী তাই ভারতীয় নওজোয়ানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, "মিশর বা ব্যাবিলন, ফোয়েনিশিয়া বা গ্রীসের মত প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি মরে যায়নি। অতীতকাল থেকে আজও ভারতবাসীর জীবনে একই ইতিহাস ও একই সংস্কৃতির ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত রয়েছে। এরূপ মৌলিকতা ইতিহাসের এক বিশিষ্ট নিদর্শন। অনেক সময়ে নতুন প্রভাব, নতুন আদর্শ ও নতুন সংস্কৃতিকে ভারতের জাতীয় জীবন ধীরে ধীরে আপন করে নিয়েছে। কালের গতির সঙ্গে ভারতেরও পরিবর্তন হয়েছে, ভারতেও প্রগতি এসেছে।" নেতাজী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এই মৌলিকতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে ভারতের গ্রহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা, ভারতের প্রগতিবাদ, পুরাতনের সঙ্গে নতুনের সমন্বয়ের সাধনা, ঐহিক প্রয়োজনের সঙ্গে আত্মিক প্রমূল্যের মৈত্রী বন্ধন,—এই

সৃজনশীল সমন্বয়ধর্মেই ভারতীয় জীবনবাদের, ভারতের জাতীয়তাবাদের মর্মবাণী। নেতাজী তাই ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে চাননি, আবার নতুনের আমন্ত্রণকে অস্বীকার করেননি। নেতাজীর মতে বিগত ও নবাগত প্রমূল্যের সমন্বয় সাধনই হলো এযুগের ভারতীয় জীবনবাদের মূল ধর্ম।

যারা ভারতীয়তাবাদের নামে প্রাচীন ভারতকে আঁকড়ে ধরে স্থবির হয়ে পড়ে থাকতে চায় এবং ব্যক্তিবাদের গহ্বরে বন্দী হয়ে ভারতীয়তাবাদের নামে যারা ব্যক্তিক পরমার্থের সন্ধানী তাদের তীব্র তিরস্কার করে নেতাজী বলেছেন, "শত শত মহাপুরুষ এদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁদের আবির্ভাব সত্ত্বেও আমাদের জাতি আজ কিরূপ শোচনীয় দুরবস্থায় পড়ে রয়েছে। জাতিকে বাঁচাতে হলে আমাদের সাধনার ধারা পরিবর্তন করতে হবে। জাতিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিত্বের সার্থকতার মূল্য নেই। আজ আমাদের প্রায়োজন সম্মিলিত সাধনা,—কালেকটিভ সাধনা।"

ভারতের যুবমনকে শুধু ব্যক্তিবাদকে বর্জন করার আহ্বানই নেতাজী জানাননি। তিনি প্রগতিহীন প্রাচীনতা ও সংস্কারবাদ পরিহার করে নতুন জীবনবাদ রচনার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছেন, "আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে একান্ত দৃষ্টি দেওয়ায় বিজ্ঞানের প্রগতি উপেক্ষিত হয়েছে, দৈহিক ও পার্থিব জীবনে আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি। ভারতের ইতিহাসে সেই দিনই ছিল গৌরবময় যুগ যেদিনে জড় ও চেতন, দেহ ও আত্মার দ্বয়ী দাবীর সুবর্ণ সমন্বয় রচনা করা সম্ভব হয়েছিল। আজকের ভারত দেহের লাঞ্ছনাতেই ভুগছে না, আত্মার ক্ষীণতায়ও জীর্ণ হয়ে পড়েছে। আজ তাই আমাদের দু-দিক দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে।"

নেতাজী প্রাচীনপন্থী সংস্কারবাদ ও শান্তিবাদের আবর্ত সম্বন্ধেও ভারতীয় যুবমনকে সতর্ক করে বলেছেন, 'যে জাতি মন্ত্র-তন্ত্র ও অতিপ্রকৃতিতে বিশ্বাসী তার রাজনৈতিক মুক্তির আশা হলো সুস্থ

যুক্তিবাদ ও বৈষয়িক জীবনের আধুনিক রূপান্তর সাধন।" অহিংসা ও শক্তিবাদের নামে ভারতের জনমনে যে নিষ্ক্রিয়তা এবং কৈবল্য-ধর্মী ভাগ্যবাদের প্রসার লাভ করেছিল তার কঠোর সমালোচনা করে নেতাজী বলেছেন, "বৈষয়িক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের পতন ঘটলো কেন? ভাগ্যবাদ ও অতিপ্রকৃতিবাদের অন্ধ বিশ্বাস, অহিংসাতত্ত্বের প্রভাবে উদ্ভূত চরম শান্তিবাদই তার কারণ।" নেতাজী তাই ভারতীয় তরুণ সমাজকে প্রগতি ও বিজ্ঞানবাদী শক্তিবাদের আহ্বান জানিয়েছেন বিবেকানন্দের জীবনবাদের অনুসরণে।

নেতাজী নতুন ভারতের জীবন ধর্মরূপে ভারতীয় নওজোয়ানদের সামনে তুলে ধরেছেন ভারতীয় সমাজবাদের আদর্শ। তিনি বলেছেন, "আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে ভারতের মুক্তি তথা বিশ্বের মুক্তি নির্ভর করছে সমাজবাদের উপরে।" কিন্তু সেই সঙ্গে যুবসমাজকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেছেন, "এই ভারতীয় সমাজবাদ কার্ল মার্কসের পুঁথির পাতায় জন্মলাভ করেনি, করেছে ভারতের মনীষায়।" কিভাবে একটি দেশের জাতীয় আদর্শ গড়ে ওঠে তার সঙ্কেত করে তিনি আরও বলেছেন, "একটি দেশের জাতীয় আদর্শ গড়ে ওঠে তার ইতিহাস, প্রয়োজন ও পরিবেশের প্রভাবে।" ভরতের জীবনবাদের জন্য যারা লণ্ডন-ওয়াশিংটন বা মস্কো-পিকিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে তাদের লক্ষ্য করে নেতাজী বলেছেন, "বাইরের আলো ও অনুপ্রেরণা গ্রহণ করার সময়ে আমাদের ভুললে চলবে না যে আমরা কোন দেশকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে পারি না। অন্য দেশের শিক্ষা গ্রহণ করে তাকে অনুধাবন করার পরে আমাদের জাতীয় প্রয়োজনের অনুপাতে তাকে প্রয়োগ করতে হবে। ভারতকে তার নিজস্ব ধারায় নিজের সমাজবাদের নিজস্ব রূপ ও পদ্ধতি রচনা করতে হবে। এমনও হতে পারে এই ভারতীয় সমাজবাদে এমন নতুনত্ব ও মৌলিকতা থাকবে যাতে বিশ্বের পক্ষেও কল্যাণ হবে।"

যারা কম্যুনিজমকে চরম ও চূড়ান্ত ধর্মজদর্শনরূপে নির্দিষ্ট করতে চান তাঁদের অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করে নেতাজী বলেছেন, "আমরা যদি বিবর্তনের শেষ প্রান্তে এসে না থাকি অথবা বিবর্তনবাদকেই মূলতঃ অস্বীকার না করি তা'হলে আমাদের কোন একটি মতবাদকে অখণ্ড সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে তার কোন অর্থ নেই।...কোন অবস্থাই মানব প্রগতির অন্তিম পর্যায় হতে পারে না। মানব প্রগতির বিরাম নেই। অতীতের অভিজ্ঞতায় চিরকাল আমাদের নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।"

ভারতীয় নওজোয়ান মনকে যদি নতুন আদর্শের সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করে সৃজনশীল করে তুলতে হয় তা'হলে ভারতের জাতীয় জীবনে এই ভারতীয় সমাজবাদের আদর্শকে জীবন্ত করে তুলতে হবে। যদি এমন একটি আদর্শ সম্বন্ধে ভারতীয় নওজোয়ান মনকে সচেতন, সক্রিয় ও আগ্রহী করে তোলা সম্ভব হয় তা'হলে আজকের যুব-বিক্ষোভ এক বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের প্রাণধারায় প্রবলভাবে বেগবান হয়ে উঠবে।

আরও একটি মৌলিক কথা বলেছেন নেতাজী। তিনি বলেছেন যে মানুষ গড়া সম্ভব না হলে নিছক রাজনৈতিক আদর্শবাদের বুলি আউড়ে কোন বড় কাজ করা বা জাতীয় জীবনকে প্রাণবন্ত করে তোলা সম্ভব নয়। যুবমনকে তাই তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "এক একটি ইজমের গোঁড়া ভক্তরা মনে করে যে সেই মতের প্রতিষ্ঠা হলেই বুঝি বিশ্বের সকল দুঃখ দূর হবে। আজকাল দেশে তাই ইজমের লড়াই ঘনিয়ে উঠেছে। আমার নিজের বিশ্বাস যে কোন ইজম দ্বারা মানব জাতির মুক্তি হতে পারে না যদি সবার আগে আমরা চরিত্রবল লাভ করতে না পারি। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন 'ম্যান মেকিং ইজ মাই মিশন'। জাতি গঠন ও ইজম প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হলো এই খাঁটি মানুষ।"

তরুণ মন চায় বীর্য-সুন্দর আইডিয়েল, তারা চায় একটি

বৈপ্লবিক জীবন ও জীবনবাদের প্রতিচ্ছবি। নেতাজী শুধু বীর ও বিপ্লবী নন, মাইথোলজিক্যাল তথা মহাকাব্যের কল্পিত জীবনের চেয়েও অনেক বেশি উজ্জ্বল নেতাজীর জীবনগাথা এবং তাঁর জীবনবাদ। ভারতীয় নওজোয়ান মনের কাছে নেতাজীর জীবন ও বাণী যদি কার্যকরীভাবে তুলে ধরা যায়,—যদি তাদের কাছে এই সত্য বাস্তব করে তোলা যায় যে নেতাজীর পথই ভারতের পথ তা'হলে ভারতের বর্তমান বিক্ষোভবাদী নওজোয়ান মন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বৈপ্লবিক আহ্বানে সৃজনধর্মী হয়ে উঠবে, উদ্দেশ্যময় হয়ে সার্থক হয়ে উঠবে। ভারতের নওজোয়ান মনের কাছে নেতাজীর চেয়ে শ্রেষ্ঠতম সাগ্নেয় প্রতীক আধুনিককালের ভারতীয় ইতিহাসে আর নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্য এদেশের যে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র নায়কেরা নেতাজীর 'ইমেজ' তাঁর ভারত-প্রাণ অগ্নিহোত্রী প্রতিচ্ছবি ভারতের যুব সমাজের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেনি।

—বসুমতী

নব ভারতের পরিকল্পনা

বিশ্বকে শোনাবার মত একটি বাণী আছে ভারতবর্ষের,—এই বিশ্বাস নেতাজীর জীবনব্রতে এনে দিয়েছে এক অমৃতের স্পর্শ। যে ভারতবর্ষ প্রমূর্ত হয়ে উঠবে একটি যুগধর্মী প্রতীকরূপে সেই মহাভারতের কল্পনায় নেতাজী গ্রহণ করেছেন এক সুচারু ভাস্করের ভূমিকা।

নেতাজীর ভাষণ ও লিখনের সংখ্যা কম নয়। প্রতিটি সুযোগে তাঁর মানস-পটে ভেসে উঠেছে নূতন ভারতের এক সুদৃপ্ত প্রতিমা। কোন্ আদর্শে গড়ে তোলা হবে স্বাধীন ভারতবর্ষকে 'ভারত সংগ্রাম' বইটিতে এবং অন্যান্য বহু ভাষণে তিনি ইংগিত দিয়েছেন সে কল্পনার। হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণেও তিনি নবভারত রচনার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরেছেন। তাঁর নব-ভারতের কল্পনা সুস্পষ্টভাবে রেখায়িত হয়েছে ১৯৪৪ সালের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষণে।

নেতাজী বিপ্লব চেয়েছেন জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য। বিপ্লবের পরে স্বতঃস্ফূর্ত আশা ও উদ্যমে একটি জাতির উন্নয়ন পরিকল্পনাকে যত দ্রুত এগিয়ে নেওয়া যায়, পরবর্তী দীর্ঘায়ত অধ্যায়ে তা সম্ভব হয় না। নেতাজী বার বার বলেছেন যে বিপ্লবের ঠিক পরের অধ্যায়ে পাঁচবছরে পঁচিশ বছরের কাজ করা যায় যদি জাতির নায়কত্বে এবং গণ-মানসে থাকে প্রাণবন্ত বৈপ্লবিক আদর্শ ও উদ্যম এবং জাতীয় পরিকল্পনার সুস্পষ্ট লক্ষ্য।

যে নতুন ভারতবর্ষ নেতাজী গড়ে তুলতে চেয়েছেন, যে ভারতের কল্পনা তাঁর জীবনে এনেছে নতুন স্বপ্নের আমন্ত্রণ 'নেতাজীর নব-ভারত' এবং 'ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং' রচনা দুটিতে নেতাজীর সেই ভারত-পুনর্গঠন পরিকল্পনার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা।

নেতাজীর নব-ভারত

'ভারতের একটি মিশন আছে,—এই বিশ্বাস নেতাজীর কর্ম ও জীবনকে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। "অনেক মৃত্যু ও জাগরণের ভিতর দিয়ে ভারতীয় জাতি এগিয়ে চলেছে, কারণ ভারতীয় সভ্যতার একটা উদ্দেশ্য আছে যা' আজো সফল হয়নি",—নেতাজী বহুবার এই বিশ্বাসটি তাঁর বহু লেখা ও ভাষণে প্রকাশ করেছেন। সাধারণ-ভাবে বিচার করতে গেলে মনে হবে নেতাজীর এরূপ ভাবাত্মক উক্তি জাতীয়তাবাদের সাময়িক ও অতি-উগ্র অভিব্যক্তি মাত্র। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য তিনি যে জাতীয় সংগ্রাম করেছেন তার ঐতিহাসিক প্রভাবেই কি নেতাজীর মনে এরূপ ভৌগোলিক ভারতপ্রীতি জন্মলাভ করেছিল? কিন্তু বাস্তবিক তা' নয়। মানব সভ্যতার সমগ্র ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি অনুধাবন করেই নেতাজীর মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে সমগ্র বিশ্ব ও মানব সভ্যতার কল্যাণ সাধনের জন্যই ভারতের এই 'মিশন'কে সার্থক করে তুলতে হবে।

ভারতীয় ইতিহাসের শিক্ষা : সর্বজনীনতা ও সমন্বয়

শুধু বেঁচেথাকবার জন্যই বেঁচে থাকার মধ্যে কোন জাতির নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষার সার্থকতা আছে বলে নেতাজী মনে করেন না।

নেতাজীর মতে "কোন জাতি যদি নিজের বলিষ্ঠতা, জীবনীশক্তি ও সৃজন-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তা'হলে সে জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করবার কোন অধিকার নেই"। (টোকিও বক্তৃতা)। ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় বহু উত্থান-পতনের বন্ধুর পথ অতিক্রম করে ভারতের জাতীয় সত্তা এগিয়ে চলেছে এবং তার সৃজন-ক্ষমতাও অব্যাহত রয়েছে। ভারতীয় ইতিহাসের বহু শতাব্দীর ধারা বিশ্লেষণ করে নেতাজী সিদ্ধান্ত করেছেন, "মিশর বা ব্যাবিলন, ফোয়েনিশিয়া বা গ্রীসের মত ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতা মরে যায়নি। আমাদের দু' বা তিন হাজার বছর আগেকার পূর্বপুরুষের মত আজও আমাদের জীবনে মূলত একই জীবনের আদর্শ এবং একই ভাবানুভূতির প্রভাব রয়েছে। অন্য কথায় অতীতকাল থেকে আজকের দিনেও ভারতবাসীর জীবনে ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারা অবিচ্ছিন্ন রয়েছে। এরূপ ধারাবাহিকতা ইতিহাসের এক বিশেষ পরিলক্ষ্যের বিষয়। গত তিন হাজার বছরে নূতন আদর্শও অনেক সময় নূতন সংস্কৃতি নিয়ে বাইরে থেকে বহু লোক এসেছে। এই সমস্ত নূতন প্রভাব, নূতন আদর্শ ও নূতন সংস্কৃতিকে ভারতের জাতীয় জীবন ধীরে ধীরে আপন করে নিয়েছে। যদিও আমাদের কয়েক হাজার বৎসরের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে, তথাপি সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে আমাদের পরিবর্তনও হয়েছে, আমরা প্রগতিও করেছি।" (টোকিও বক্তৃতা)। ভারতীয় ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি কোন্ অন্তর্নিহিত শক্তি ও নীতির প্রভাবে আপনার বিশিষ্ট ধারা আজো অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে? কত সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রইল কি করে? নেতাজী ভারতীয় ইতিহাসের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন: "প্রথমত, অতীতকাল থেকে ভারতীয় মনীষা ও সংস্কৃতি বিশিষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করেছে সর্বজনীনতায় (Universalism) (টোকিও বক্তৃতা)। দ্বিতীয়ত,

ভারতীয় সভ্যতার রূপায়ণ হয়েছে সমন্বয় বা সাম্যবাদে (ভারতীয় সংগ্রাম) ; মানব জাতির সংস্কৃতি—সভ্যতার প্রকৃতিকে ভারত জাতীয় সংকীর্ণতায় আবদ্ধ রাখতে চায়নি। সংস্কৃতির অবদান সর্বজনীন এবং এর প্রয়োজন ও মূল্য সর্বমানবের জন্য। এই সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্বাসে ভারতীয় সভ্যতা কোনদিন আত্মসর্বস্ব হয়নি। যুগে যুগে ভারত নূতন নূতন সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রভাবকে সাদরে গ্রহণ করেছে এবং নিজের জীবনধারার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিয়ে দিয়ে নূতনভাবে সমৃদ্ধিশালী হয়েছে। নূতনকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু পুরাতনকেও হারায়নি। নূতন ও পুরাতনের সংযোগে যুগে যুগে সৃষ্টি করেছে নব সমন্বয় (Synthesis)। এই সর্বজনীন মনোভাব ও সমন্বয়ের ধর্ম ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃতিকে উদারতা, মানবতাবোধ এবং গ্রহণশীলতা ও সহনশীল বৃত্তির জন্ম দিয়েছে। বিশ্বমানবতার দিকে দৃষ্টি রেখেই ভারত নিজের প্রগতিসাধনে উন্মুখ হয়েছে। বাইরে-থেকে-আসা অন্য কোন সভ্যতাকে সংকীর্ণ মনে বর্জন করেনি,—যতটুকু নেবার সাদরে গ্রহণ করে আপনার জীবন-স্রোতে অবিচ্ছিন্ন করে মিলিয়ে নিয়েছে। ভারত আত্ম-গর্বে অন্য কোন সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল্যকে তুচ্ছ করে ধ্বংস করতে চায়নি। শুধু চেয়েছে নূতন অভিব্যক্তিতে বলিষ্ঠ রূপায়ণ এবং নূতন সমন্বয়। ভারতীয় ইতিহাসের এই সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী ও সমন্বয়ী ধর্মের শিক্ষা গ্রহণ করেই আজকের ভারত নূতন জীবন গড়ে তুলবার সঙ্কল্প গ্রহণ করবে ?

নব-ভারত-সৃজনের দৃষ্টি

নব-ভারত সৃজনের যে স্বপ্নে নেতাজীর দুর্বার স্বদেশপ্রেম কর্মমুখর হয়েছে, ভারতীয় ইতিহাসের এই সর্বজনীনতা ও সমন্বয়ের আদর্শেই হয়েছে তার রূপায়ণ। তিনি স্বাধীন ভারতের জাতীয় পরিকল্পনা রচনায় এই সর্বজনীন ও সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গীকে কার্যকরী করার অভিপ্রায়ে বলেছেন যে বিশ্বমানবতার দিকে মুখ রেখে ভারত

গ্রহণ করবে জাতীয় পরিকল্পনা, 'কিন্তু নিজেকে গড়ে তুলতে হবে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিতে।' একান্তভাবে বর্জনও নয়, আবার কোন আদর্শকে অন্ধভাবে গ্রহণও নয়,—ভারতের ইতিহাস, পরিবেশ ও প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখেই রচনা করতে হবে ভারতের জাতীয় পরিকল্পনা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ বহু মতবাদ প্রচলিত হয়েছে, বহু বিধান বিভিন্ন জাতীয় সীমানায় গড়ে উঠেছে। ভারতকে এই বহুমুখী বিধান ও ব্যবস্থার প্রকৃতি অনুধাবন করতে হবে। ভারতীয় ইতিহাসের বিশিষ্ট ধারা, তার প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং তার জাতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে এইসব মতবাদ ও আদর্শ থেকে যতটুকু প্রয়োজন গ্রহণ এবং যেটুকু অপ্রয়োজনীয় তা বর্জন করতে হবে। এক দেশের মতবাদ আরেক দেশের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার একান্ত বিপক্ষে নেতাজী। ভারতের কথা ভুলে গিয়ে অনেকে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছেন এবং ভারতকে রাতারাতি রুশ বা মার্কিণে রূপান্তরের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। নেতাজী দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন, "বাইরে থেকে আলো ও উৎসাহ নেবার সময় আমরা যেন একথা ভুলে না যাই যে আমরা অন্ধভাবে অন্য কোন জাতিকে অনুসরণ করবো না।" কিন্তু তাই বলে, "আগে থেকেই একটা বিরুদ্ধভাব বা অভিমত পোষণ করে যদি কোন আন্দোলন বা পরীক্ষাকে আমরা উপেক্ষা করি, তা'হলে আমরা নির্বুদ্ধিতার দোষে দোষী হব। ইউরোপ ও আমেরিকায় যে আন্দোলন ও পরীক্ষা চলছে আমাদের বিচারশীল সহানুভূতির সঙ্গে তা' অনুধাবন করতে হবে ("নওজোয়ান কংগ্রেস ও ভিয়েনা বিবৃতি) এবং "ভারতের ঐতিহাসিক ধারা, পরিবেশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেই ভারতের জাতীয় পরিকল্পনার আদর্শ ও নীতি গ্রহণ করতে হবে। ভারত, রুশ বা মার্কিণের দ্বিতীয় এডিশন হবে না। ভারতকে ভারতের মত করেই তার জাতীয় পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে।" (ভারতীয় সংগ্রাম)

নব-ভারত রচনার মূল নিয়ামক হবে সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী। জীবনের বিভিন্ন 'মূল্য' এবং পৃথিবীর আধুনিক চিন্তাধারার কল্যাণকর দিক-গুলির সমন্বয় সাধন করে নেতাজী গড়ে তুলতে চেয়েছেন ভারতের নয়া সমাজ-দর্শন। ১৯৪৪ সালে টোকিও বক্তৃতায় নেতাজী বলেছেন "আমাদের রাজনৈতিক দর্শন কি হবে দশ বৎসর আগে 'ভারতীয় সংগ্রাম' নামে আমি যে বই লিখেছি তারমধ্যে আমার অভিমত লিখেছি। সে বইটিতে আমি বলেছি যে, ভারতকে এমনি একটি বিধান গড়ে তুলতে হবে যা হবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রচলিত ব্যবস্থার সমন্বয়।" এই সমন্বয়ের অর্থ বিভিন্ন মতবাদের সংযোগ বা সমষ্টিকরণ নয়, বিভিন্ন মতবাদের "প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর দিকগুলির সমন্বয় সাধন।"

(ভিয়েনা বিবৃতি)

সমগ্র পৃথিবী আজ এক চরম সংকটের মুখে। চারিদিকে বিভিন্ন মতবাদের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ। বিভিন্ন দেশের জাতীয় মতবাদ ও বিধান-গুলি একান্তবাদী ও আত্মসর্বস্বতাকামী। পৃথিবীর বিভিন্ন মতবাদ বা ইজমের কোনটিকেই অখণ্ড সত্য বলে স্বীকার করেননি নেতাজী। সব মতবাদেই কিছু কিছু সারবত্তা আছে। কিন্তু বিশ্বমানবতাবোধ ও গ্রহিষ্ণু মনোভাবের অভাবে এই প্রয়োজনীয় দিকগুলির সারবত্তা এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে গ্রহণ করতে রাজী নয়। নেতাজীর অভিমতে আজকে মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এই সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গীর গ্রহণ। নেতাজী এই সমন্বয়ের নীতি গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতে নূতন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব সাধন করে মানব সভ্যতাকে নূতন যুগে এগিয়ে নেবার আশায় এবং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির সামনে নূতন আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে একান্ত বিশ্বাসে বলেছেন, "ভারতকে বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের ধারায় পরবর্তী অধ্যায়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।"

(টোকিও বক্তৃতা)

ভারতে সমন্বয়ের প্রয়োগ

সমন্বয়ের অর্থ সংযোগ বা বিভিন্ন মতবাদের সমষ্টিকরণ নয়,—সমন্বয়ের অর্থ নবপর্যায়ের রূপান্তর। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নিয়ে জলকণা গড়ে ওঠে। কিন্তু জল নিজস্ব প্রকৃতিতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বিভিন্ন প্রকৃতির সংযোগ নয়,—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন রূপান্তরিত হয় জলকণার এক মৌলিক প্রকৃতিতে। তেমনি নেতাজী বিভিন্ন মতবাদ ও মূল্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে একটি সমন্বয়ী জীবন-দর্শন রচনা করতে চেয়েছেন। নেতাজীর মতে যুগে যুগে এবং আংশিকভাবে দেশে দেশে পরিবর্তনশীল সমন্বয়ী জীবন-দর্শন রচনার মধ্যেই মানব-মনীষা নিজের স্বতন্ত্র সত্তার সার্থকতা খুঁজে পাবে। এই সমন্বয় সাধনের সন্ধানেই নিহিত থাকবে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃজনশীলতার প্রেরণা।

নেতাজী ভারতের জন্য যে নববিধান রচনা করতে চেয়েছেন তা' শুধু দেহসর্বস্ব বা বৈষয়িক হবে না,—জড়ের সঙ্গে চেতন বা দেহের সঙ্গে আত্মার দাবীর মমন্বয় সাধন করতে হবে। তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষ সভ্যতার দিকে দৃষ্টি দেয়নি, দিয়েছে সংস্কৃতির দিকে—পাথিব জীবনের দিকে দেয়নি, দিয়েছে মনন ও অধ্যাত্মচিন্তার দিকে। মন ও অধ্যাত্মজীবনের দিকে একান্ত দৃষ্টি দেওয়ায় বিজ্ঞানের প্রগতি উপেক্ষিত হয়েছে এবং দৈহিক ও পার্থিব জীবনের দিকে আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি। ভারতের ইতিহাসে সেই দিনই ছিল গৌরবময়, যখন জড় ও চেতন, দেহ ও আত্মার দাবীর সুবর্ণ সামঞ্জস্য বিধান হয়েছিল এবং দু'দিকেই প্রগতি সম্ভব হয়েছিল। দেহ ও আত্মার গভীর সম্বন্ধের ফলে দেহের উপেক্ষা শুধু জাতির দেহকেই দুর্বল করে না, কালস্রোতে জাতির আত্মাকেও অক্ষম করে দেয়। আজকের ভারতবর্ষ দেহের লাঞ্ছনাতেই ভুগছে না, আত্মার ক্ষীণতায়ও ভুগছে। আমাদের যদি পুনঃসংস্থান করতে হয় আজ তা'হলে দুদিকেই এগিয়ে যেতে হবে।"

(পিরামিড সম্বন্ধে লিখা—১৯৩৭)। তিনি অতীত ও বর্তমান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় সাধনের আহ্বান জানিয়ে ভারতের জাগ্রত জনতাকে আরো বলেছেন, "আমাদের আজকের দিনে বাঁচতে হবে এবং আধুনিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। কিন্তু অতীতের বুকে আমাদের দাঁড়াতে হবে। ভারতের নিজের যে সংস্কৃতি আছে তা' নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেই গড়ে তুলতে হবে। এক কথায় আমাদের সমন্বয় সাধন করতে হবে। একদিকে যেমন বেদের যুগে ফিরে যাওয়ার ধ্বনি প্রতিরোধ করতে হবে, আরেক দিকে তেমনি আধুনিক ইউরোপের ফ্যাসান ও পরিবর্তনশীলতার অর্থহীন লালসা রোধ করতে হবে। আমাদের অতীত সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিত্তিতে আমরা নূতন ও আধুনিক জাতি গড়ে তুলবার প্রয়াসী।" (কলকাতা যুব-কংগ্রেসের ভাষণ ও টোকিও বক্তৃতা)। ভারতের রাষ্ট্র, অর্থ ও সমাজ পরিকল্পনা রচনায়ও নেতাজী এই সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগের কথা বলেছেন। নেতাজী বলেছেন, "আমাদের সমগ্র জনগণের সামাজিক প্রয়োজন এবং জাতীয় ভাবাবেগের বুনিয়াদে ভারতে একটি প্রগতিশীল বিধান গড়ে তুলতে হবে। অন্য কথায় এই বিধান হবে জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের সমন্বয়।" (টোকিও বক্তৃতা)।

নেতাজী সমাজবাদে একান্ত বিশ্বাসী। তিনি লাহোর কংগ্রেসের সময় থেকে সমাজবাদ ও সমাজবাদী কর্মপন্থার কথা প্রচার করেছেন। তিনি হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে স্পষ্ট করে বলেছেন, "রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। আমাদের সমগ্র কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থায় সমাজবাদী নীতি প্রয়োগের জন্য রাষ্ট্রকে উৎপাদন ও বণ্টন,—উভয় ক্ষেত্রেই বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। দারিদ্র্য, ব্যাধি ও অশিক্ষা মোচন এবং উৎপাদন ও বণ্টনের বৈজ্ঞানিক নীতি গ্রহণের জাতীয় সমস্যা সমাজবাদী নীতিতে সমাধান করতে হবে।" টোকিও বক্তৃতায় তিনি আরও বলেছেন, "ভারতের আর্থিক পুনঃসংস্থাপনের পরিকল্পনায়

দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব যদি বেসরকারী ব্যক্তির উদ্যোগের উপর আমরা ছেড়ে দি' তা'হলে কয়েক শতাব্দীতেও এই সমস্যার সমাধান হবে না। ভারতের জনতা সমাজবাদী ব্যবস্থা চায়। দেশের শিল্পায়ন ও কৃষির আধুনিকীকরণের দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। অন্য দেশের পরীক্ষাগুলি আমাদের অনুধাবন করতে হবে বটে, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, ভারতীয় জনতার প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সে ব্যবস্থা হবে ভারতীয়।" কিন্তু সমাজবাদ বা সোস্যালিজমের প্রকৃতি সম্বন্ধে নেতাজী সুস্পষ্ট করে বলেছেন, "ভারতকে তার সমাজবাদ ও প্রয়োগপন্থা নিজেই গড়ে তুলতে হবে। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, শুধু ভারত নয়,—পৃথিবীর জনগণের মুক্তি নির্ভর করছে সমাজবাদের উপর। ভারতে সমাজবাদের যে আদর্শ গড়ে উঠবে তার মধ্যে কিছু নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য থাকবে এবং বিশ্বও তার দ্বারা উপকৃত হবে।"

(টি. ইউ. সি. বক্তৃতা, ১৯৩১)

ভারতীয় রাষ্ট্র সম্বন্ধে নেতাজী টোকিও বক্তৃতায় বলেছেন, "আমরা যদি সমাজবাদী বিধানসঙ্গত অর্থব্যবস্থা চাই তা'হলে রাষ্ট্র ব্যবস্থাও এমনই হওয়া প্রয়োজন যাতে সেই আর্থিক পরিকল্পনাকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করে তোলা যায়।...কোন কুচক্রী বা ধনিক শ্রেণীর জন্য নয়,—রাষ্ট্রকে জনগণের সেবক বা মুখপাত্ররূপে কাজ করতে হবে। ১৯৩১ সালে নওজোয়ান কংগ্রেসে নেতাজী ভাবী স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার নামকরণ করেছিলেন "সোস্যালিস্ট রিপাবলিক অব ইণ্ডিয়া।" নব-ভারতের সমাজজীবনের রূপায়ণে নেতাজীর অভিমত হলো: "মুক্তি যদি হয় আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য—আমাদের সমস্ত কাজের 'এলান ভাইটাল'—ভাবী সমাজের ভিত্তিও তা'হলে হবে এই সর্ব-মুক্তির আদর্শে।" (অমরাবতী ভাষণ)। অর্থাৎ নেতাজী কোন মতবাদ বা দর্শনের নামে সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে একটি কোন বিশিষ্ট খাতে পরিচালিত

করার বিরুদ্ধে। তিনি ধর্ম ও সংস্কৃতি জীবনে জনসমাজকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতাদানে বিশ্বাসী। কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপরে কোন মতবাদের রাষ্ট্রীয় ষ্টীমরোলার চালনার অর্থ মানুষের সৃজনশীল বৃত্তিকে ক্ষুণ্ণ করা। নেতাজী তাই সমাজ-জীবনের সর্বশ্রেণীর জনতাকে সাংস্কৃতিক বিকাশের স্বাধীনতা ও সমান সুযোগ দানের অভিমত প্রকাশ করেছেন।

নবভারতকে নেতাজী জাতীয়তাবাদের ভাবাবেগের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, কিন্তু আক্রমণশীল বা আত্মকেন্দ্রিক হবার কোন আহ্বান জানাননি। নেতাজী স্পষ্ট করে বলেছেন 'ভারত সর্বদিকে আত্মপূর্ণতা লাভের দিকে প্রবল আশা ব্যক্ত করুক্, কিন্তু অন্য জাতির বিনিময়ে নয়—পররাজ্যলোলুপ আক্রমণ প্রণবতা ও সাম্রাজ্যবাদের রক্তাক্ত পথে নয়।" (মডার্ণ রিভিউ—১৯৩৭)

নেতাজী আরও বলেছেন যে স্বাধীন ভারতকে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বিশ্বমানবতার সমন্বয় সাধন করতে যেয়ে একথা মনে রাখতে হবে যে, "শুধু নিজের সঙ্কীর্ণ জাতীয় স্বার্থসিদ্ধিই যদি হয় কোন জাতির অভিপ্রায়, তা'হলে সে জাতির বাঁচার অধিকার নেই। একটি জাত বড় হবার আকাঙ্ক্ষা করবে মানবতাকে মহত্তর করে তুলবার জন্যে,—যেন এই পৃথিবী একদিন সুন্দর ও কল্যাণময় আবাসস্থলে রূপান্তরিত হতে পারে।" (অমরাবতী ভাষণ)

এক কথায়, নেতাজী স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন একটি সোস্যালিস্ট রিপাব্লিকরূপে এবং আর্থিক ব্যবস্থার রচনা করতে চেয়েছেন সমাজবাদের পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগে। কিন্তু সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আদর্শ। রাষ্ট্র ও অর্থনীতির পরিকল্পনায় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেতাজী স্বীকার করেন, কিন্তু মননলোকে তিনি নিরন্তর মুক্তির প্রয়াসী। মনের মুক্তি ছাড়া মানব সভ্যতার প্রগতি সম্ভব নয়। নেতাজী তাই কম্যুনিজমের সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণবাদের ঘোর

বিরোধী। নেতাজী বারবার বলেছেন—'স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজবাদ'—ভারতীয় জীবনাদর্শের এই হবে ত্রয়ী স্তম্ভ। তাই স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজবাদী আদর্শের সমন্বয়ে নব-ভারত রচনার আহ্বান তিনি জানিয়েছেন তাঁর স্বদেশবাসীদের।

নেতাজী জাতীয়তাবাদী হয়েও বিশ্ব-মানবতায় বিশ্বাসী বলেই তিনি সমন্বয়ী জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে নূতন ভারত গড়ে তুলতে চেয়েছেন। নেতাজীর বিশ্বাস ভারতের এই সমন্বয়ী জীবনাদর্শ বিশ্বমানব সমাজেরও প্রভূত কল্যাণসাধন করবে।

—আনন্দবাজার

নেতাজী ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং

ভারত আজ পর পর চতুর্থ পরিকল্পনায় পদক্ষেপ করেছে। কিন্তু প্রারম্ভের প্রথম দিনে যাঁর প্রেরণা ও উদ্যমে পরিকল্পনার পদক্ষেপ সুরু হয়েছে পরিকল্পনার কর্তৃপক্ষকে একবারও সেই মহান নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা বা শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে দেখা যায়নি বস্তুত, ভারতের ন্যাশন্যাল প্ল্যানিংয়ের প্রথম উদ্গাতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র। ওয়ার্ধা স্কুল অব ইকনমিকসের বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও নেতাজীই প্রথম জাতীয় পরিকল্পনার ভূমিকা রচনা করেন। নেতাজী ত্রিশ দশকেই একথা উপলব্ধি করেন যে ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন এবং দরিদ্র ভারতবর্ষের দ্রুত জীবন-মান উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত অর্থনীতি এবং সেজন্য মূল নীতি ও পরিকল্পনা রচনা এবং তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি হয়েই নেতাজী এই উদ্দেশ্যে ১৮৩৮ সালের অক্টোবর মাসে কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করে একটি প্ল্যানিং কমিশন গঠন করেন। ন্যাশন্যাল প্ল্যানিংয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি এবং প্ল্যানিং কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য ও উদ্যমে নেতাজীকে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেন ডঃ ভি. ভি. গিরি, ডঃ মেঘনাদ সাহা ও ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।

নেতাজী প্রথম প্ল্যানিং কমিশন গঠন করেন ১০ জন সদস্য নিয়ে। পরে এই কমিশনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। প্রথম কমিটিতে

ছিলেন জওহরলাল নেহরু (সভাপতি) বিশ্বেশ্বরায়া, পুরুষোত্তমদাস ত্রিকমদাস, মেঘনাদ সাহা, এ. ডি. শ্রফ, কে. সি. সাহা, নাজির আহমেদ, আম্বালাল সরাভাই, এ. কে. সাহা ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। এই কমিটির সম্পাদক মনোনীত হন হরিবিষ্ণু কামাথ। শিল্প, অর্থ, কৃষি, গ্রামীণ শিল্প, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, রসায়ন শিল্প, পাবলিক ফিনান্স, ইন্সিওরেন্স, যানবাহন, সেচ, টেকনিক্যাল শিক্ষা, উন্নয়ন পরিকল্পনা, পরিকল্পনায় নারীর স্থান ইত্যাদি ২৯টি বিষয়ে বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ দ্বারা সাব কমিটি গঠিত হয়। যে যে বিষয়ে সাব কমিটি গঠিত হয় তার মূল খসড়া রচনা করেন নেতাজী। এই সাব কমিটিগুলির প্রধান কাজ হয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা। প্রতিটি সাব কমিটিতে সুযোগ্য এবং সুপরিচিত বিশেষজ্ঞদের গ্রহণ করা হয়। এই সাব কমিটিগুলি দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে যে তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে তারই স্ট্যাটিসটিকস্ ও সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে রচিত হয় স্বাধীন ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। তথাপি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর পর চারটি রিপোর্টের কোথাও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিংয়ের প্রথম উদ্গাতা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নাম বা অবদান সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই।

জাতীয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে নেতাজীর দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল ? যে-সম্বন্ধে তিনি ভারতীয় সংগ্রাম বইটি, করাচীর নওজোয়ান সভার ভাষণ, হরিপুরা কংগ্রেস সভাপতির ভাষণ, ১৯৩৫ সালের লণ্ডনে প্রদত্ত ভাষণ, ১৯৪২ সালে জার্মানীতে প্রদত্ত 'স্বাধীন ভারত ও তার সমস্যা' নামক বক্তৃতা এবং ১৯৪৪ সালে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষণে উল্লেখ করেছেন। টোকিও ভাষণে স্বাধীন ভারতের তিনটি সমস্যার গুরুত্ব নির্ণয় করে নেতাজী বলেন, "স্বাধীন ভারতের মূল সমস্যা হবে জাতীয় সুরক্ষা বা ন্যাশন্যাল ডিফেন্স, জনগণের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান এবং জনশিক্ষার ব্যবস্থা করা।" তিনি বলেন, "আমাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে সুগঠিত

করতে হবে। বৃহদায়তনে শিল্প ব্যবসার মাধ্যমে আত্মরক্ষার জন্য আমাদের অস্ত্রশস্ত্র আমাদেরই তৈরী করতে হবে। দেশরক্ষার সুব্যবস্থা করে দারিদ্র্য ও বেকারী সমস্যা সমাধানের কাজে তৎপর হতে হবে। কি ভাবে ভারতের কোটি কোটি বেকারকে কাজ দেওয়া যায়, কোন্ উপায়ে তাদের শোচনীয় দারিদ্র্য দূর করা যায় সেটি হবে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ভারতের তৃতীয় সমস্যা হবে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে শিক্ষা সমস্যার সমাধান করে জনগণকে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা।" জাতীয় পরিকল্পনার মূল বিষয়গুলির গুরুত্ব ও ক্রমনির্ণয়ে নেতাজীর নির্দেশগুলির মূল্য আজ প্রতিটি ভারতবাসী অনুভব করবে। বিপন্ন সীমান্তের দিকে চেয়ে আজ একথা মনে হবে দেশরক্ষার দায়িত্বকে প্রাধান্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই নেতাজী ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার ন্যায় স্বাধীন ভারতকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

ভারতের জাতীয় পরিকল্পনার মূল নীতি কি হওয়া উচিত তারও নির্দেশ করে নেতাজী হরিপুরা ভাষণে বলেন, "দারিদ্র্য দূর করা, অশিক্ষা দূর করা এবং ব্যাধি দূর করার জন্য উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাকে সমাজবাদী পদ্ধতিতে পরিচালিত করতে হবে।" একথাটি অতি সুস্পষ্ট যে, শুধু উৎপাদন নয়, বণ্টন ব্যবস্থাতেও সমাজবাদী নীতি অনুসরণ করতে হবে। তাই নেতাজী পরিকল্পনাকারীদের সতর্ক করে দিয়ে বলছেন যে, "আর্থিক সমস্যার প্রতিটি বিষয় জনগণ,—যাদের অধিকাংশ দরিদ্র তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে সমাধান করতে হবে।" নেতাজীর দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধি ও জনগণের আয় বৃদ্ধির দ্বয়ী লক্ষ্যের সামঞ্জস্য বিধান করে পরিকল্পনার কার্যক্রম রচনা করতে হবে। নেতাজী আপস-রফা নীতির তীব্র সমালোচনা করে কংগ্রেসের দুর্বলতার প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলেন, "এই প্রতিষ্ঠানটির নীতি ও কর্মসূচীর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো যে এই কার্যক্রম প্রগতিবাদ বা র‍্যাডিক্যালিজমের উপরে

প্রতিষ্ঠিত নয়, জমিদার ও প্রজা, মালিক ও মজুর এবং তথাকথিত উঁচু ও অবনত শ্রেণীর স্বার্থের মধ্যে আপস-রফায় নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত।" নেতাজী ভাবী ভারতের পরিকল্পনার মূল নীতি নির্দেশ করে ভারতীয় সংগ্রাম বইটিতে আরও লিখেছেন যে ভারতের জাতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হবে, "জনগণ তথা কিষাণ, মজুর প্রভৃতির স্বার্থ রক্ষা করা,—স্থিতস্বার্থবাদী ভূস্বামী, পুঁজিপতি বা লগ্নী কারবারীদের স্বার্থ রক্ষা করা নয়।" নেতাজীর পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য শুধু উৎপাদন নয়,—বণ্টনও; অর্থাৎ পুঁজি বৃদ্ধি করে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করাই পরিকল্পনার একমাত্র লক্ষ্য হবে না,—উৎপাদন পদ্ধতিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে জাতীয় আয়ের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের আয়ও বৃদ্ধি হয় সমহারে। এজন্য শুধু উৎপাদনের উপরে গুরুত্ব দিলেই চলবে না, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনতার আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যের সামঞ্জস্যের জন্য সমাজবাদী বণ্টন প্রথার প্রয়োগ করতে হবে। নেতাজী মনে করেন সমাজবাদী বণ্টন প্রথা ব্যতীত জনগণের জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব নয়।

নেতাজী দ্রুত শিল্পায়নের কথা বলেছেন, কিন্তু এরূপ শিল্পায়নের বিকৃতি কিভাবে দূর করা যায় সে সম্বন্ধেও সতর্ক করে দিয়েছেন হরিপুরা ভাষণে। তাই শিল্পের কতগুলি ক্ষেত্রে তিনি বিকেন্দ্রিত নীতি প্রয়োগের কার্যক্রমের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি ভারী শিল্প, কুটীর ও গ্রামীণ শিল্পের ক্ষেত্র ভাগ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার নির্দেশও করেছেন। উৎপাদন বৃদ্ধিই পরিকল্পনার একমাত্র উদ্দেশ্য নয় বলে,—উৎপাদন ব্যবস্থায় যাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় সেজন্য বিকেন্দ্রিত কুটির ও গ্রাম শিল্পগুলিকেও ভারী শিল্পের পরিপূরকরূপে গুরুত্ব দানের নির্দেশ করেছেন।

জাতীয় পরিকল্পনার ব্যবস্থায় মালিকানার প্রশ্নটি সম্বন্ধে নেতাজী টোকিও ভাষণে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করে বলেছেন, ভারতের

আর্থিক অবস্থা পুনঃ সংস্থাপনের পরিকল্পনায় দরিদ্র ও বেকার সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব যদি আমরা বেসরকারী ব্যক্তিদের উদ্যমের উপরে ছেড়ে দি তা'হলে কয়েক শতাব্দীতেও এসমস্যার সমাধান হবে না। সুতরাং ভারতের জনতা চায় একটি সোস্যালিস্ট ব্যবস্থা। বেসরকারী ব্যক্তিদের উপরে অর্থিক ব্যবস্থার কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব ছেড়ে দিলে চলবে না,—আর্থিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিতে হবে রাষ্ট্রকে। দেশের শিল্পায়ন বা কৃষির আধুনিককরণের দায়িত্ব রাষ্ট্রেকেই নিতে হবে। ভারতের জনতা যেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।" নেতাজী তাই আরেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, যথার্থ জনগণের জাতীয় পরিকল্পনার জন্য "উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় চাই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব" (Social ownership and control of both production and distribution)। নেতাজী অনেক রচনাবলীতে একদিকে রাষ্ট্রীয়করণ তথা ন্যাশন্যা-লাইজেশনের কথা বলেছেন এবং সেই সঙ্গে সামাজিক মালিকানা তথা 'সোস্যাল ওনারশীপের' কথাও বলেছেন। বর্তমানে সমাজবাদী উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতিতে সামাজিক কর্তৃত্ব ও বিকেন্দ্রায়ণের তথ্য সোস্যালাইজেশন ও ডিসেণ্ট্রালাইজেশনের দৃষ্টিভঙ্গীর যে প্রশ্ন উঠেছে নেতাজীর পরিকল্পনরে মূলনীতির মধ্যে তার কয়েকটি মৌলিক ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে।

নেতাজী সমাজবাদের মূল ভিত্তিতে জাতীয় পরিকল্পনার নীতি ও পদ্ধতি রচনার স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি যে সোস্যালিস্ট উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার কথা বলেছেন তা' অন্য কোন দেশের অন্ধ অনুসারী হবে না। সোস্যালিজম বলতে যাঁরা একমাত্র কম্যুনিজমকে বোঝেন নেতাজী তাঁদের লক্ষ্য করে বলেছেন যে, "ভারত কখনো সোভিয়েট রাশিয়ার দ্বিতীয় সংস্করণ হবে না।" তিনি আরও বলেছেন যে,

"ইয়োরোপ ও অ্যামেরিকার পরীক্ষাগুলি বিমুক্ত ও স্বাধীন মন নিয়ে আমরা পর্যালোচনা করব কিন্তু ভারতকে তার নিজস্ব সমাজবাদ ভারতীয় জনতার প্রয়োজন এবং জাতীয় পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গড়ে তুলতে হবে,—যা হবে একান্তভাবে ভারতীয়।"

ভারত আজ চতুর্থ পরিকল্পনার পথে পদক্ষেপ করেছে। এই পরিকল্পনার মূল নীতি ও পদ্ধতির সঙ্গে নেতাজীর জাতীয় পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গীর কতকখানি সামঞ্জস্য রয়েছে? পরিকল্পনার মূল নীতির দিক দিয়ে নেতাজী চেয়েছেন উৎপাদন ও বণ্টন তথা উভয় দিকে সোস্যালিস্টিক পদ্ধতি এবং জাতীয় আয়ের সঙ্গে জনগণের আয়ের সমহারে বৃদ্ধি। পরিকল্পনার কার্যক্রম তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন দেশরক্ষার সহযোগী ভারী শিল্প ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন, বেকার সমস্যার সমাধানে ক্ষেত্র ভাগ করে শিল্প ও কৃষির ত্বরান্বিত প্রগতিসাধন এবং জনগণের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন। শিল্পায়ন ও শিল্পপ্রথার আধুনিককরণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় আয়ের হার বৃদ্ধিই, নেতাজী মতে, জাতীয় পরিকল্পনা তথা সমাজবাদী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হতে পারে না। নেতাজী তাই পুঁজি বৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে কর্মবৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় সাধনের নীতির প্রতি মৌলিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু ভারতের বর্তমান পরিকল্পনা কি এই দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণ করেছে? তা' করেনি বলেই বেকার সমস্যা আজ ভারতের জাতীয় জীবনে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

—যুগান্তর

যুগোত্তম বিপ্লবী মহানায়ক

যে বীর্য-সুন্দর অমিত বিপ্লবীর পরিচয় ভারতের জীবন-গাথায় অগ্নি-স্বাক্ষরা ভাস্বরবিভায় অনাগত কালের আদর্শব্রতীদের জানাবে দুঃসাহসী জীবন-ব্রতের সাগ্নিক আহ্বান 'নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা' প্রবন্ধটি তারই এক সশ্রদ্ধ মূল্য-নিরীক্ষণ। কী অপূর্ব সম্ভাবনায় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম অধ্যায়! নেতাজীর নির্দেশিত বিপ্লবের পথে অগ্রসর না হয়ে দানপত্রের মাধ্যমে অর্জিত হওয়ার ফলে যে কুটিল আবর্তে ভারতে স্বাধীনতা আজ বহু পরিমাণে বিড়ম্বিত তার আরও আলোচনা করা হয়েছে এই প্রসঙ্গে।

একদিকে নেতাজী অগ্রসর হয়েছেন বিপ্লবের রক্ত-চিহ্নিত পথে, অন্যদিকে রক্তচরণ-পথ-সঞ্চরণের তালে তালে তিনি কল্পনা করেছেন নূতন ভারতের স্বর্ণ-রঞ্জিত এক পরম জীবনময়ী প্রতিমা। ভাঙ্গার নির্মমতায় তাঁর রুদ্র-সাধনা, আবার গড়ার আমন্ত্রণে তিনি সুদক্ষ শিল্পী। এজন্যই দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র ভারত-ইতিহাসের কাছে সম্ভাষিত হয়েছেন বিপ্লবী মহানায়ক 'নেতাজী'রূপে। 'নেতাজী'র ভূমিকায় সুভাষচন্দ্রের স্থান ভারতীয় ইতিহাসে অনন্য।

স্বাধীনতার অর্থ কি, গণতন্ত্রী ভারতবর্ষে সমাজ-বাদের কোন্ সৌধ গড়া হবে, রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থ-নীতির পরিকল্পনা রচনা করা হবে কোন্ মৌলিক নীতির উপরে ভিত্তি করে, ভারতীয় সমাজবাদের প্রেরণা হবে কোন্ সমাজ-দর্শনের আবেদনে—নতুন আঙ্গিকে তারই পুনরুল্লেখ করা হয়েছে এই প্রবন্ধ-টীতে। বস্তুতঃ, এই প্রবন্ধটি বহুলাংশে নেতাজীর কর্ম ও জীবন পর্যালোচনার একটি সংক্ষিপ্তসার।

নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা

ভারত-ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় দিন তেইশে জানুয়ারী! এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র,—এ যুগের শ্রেষ্ঠতম বীর ও বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র। তিনি আজ আর শুধু দেশগৌরব নন, দেশনায়ক নন,—নেতৃত্বের কোন সীমিত পরিচয়েই এই মহাজীবনের পূর্ণ পরিচয় আর দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি আজ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সশ্রদ্ধ সম্ভাষণে অভিষিক্ত যুগোত্তম মহানায়ক। তিনি আজ নেতাজী সুভাষচন্দ্র!

মহাবিপ্লবী, মহানায়ক

নেতাজী আজ অজানার অন্তরালে। যে মহাপথিক স্বাধীনতার দুর্বার স্বপ্নে বিভোর হয়ে একদিন গৃহত্যাগ করেছিলেন—স্নেহময়ী জননী, প্রিয়তম জন্মভূমি সব কিছুকে পিছনে ফেলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন দুর্যোগের অন্ধকারে,—দেশের পর মহাদেশের দুস্তর সীমানাপার হয়ে, সাগরের পর মহাসাগরের তরঙ্গ-বিক্ষোভ উত্তীর্ণ হয়ে—দুর্ধর্ষ অভিযানের দুর্জয় সাধনায় গড়ে তুলেছিলেন আজাদ-হিন্দের মৃত্যুঞ্জয়ী বাহিনী—তিনি আর ফিরে আসবেন কিনা জানে না সেকথা ভারতবাসী। তবু পরম আশায়,—অন্তহীন অসীম প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন প্রত্যাশী হয়ে রয়েছেন তাঁর স্বদেশবাসী।

স্বাধীনতার উদ্বেল আবেগে অস্থির হয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যুগসন্ধিক্ষণে সুভাষচন্দ্র ভারতবাসীকে যেদিন ডাক দিয়েছিলেন জাতীয় সংগ্রামের। ভারতবাসী সেদিন তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি,—কংগ্রেসী নেতারা সেদিনে সুভাষচন্দ্রের সংগ্রামী আহ্বানের বৈপ্লবিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। জাতীয় নেতাদের কাছ থেকে সুভাষচন্দ্র পেয়েছিলেন চরম বিরোধিতা,—নির্মম বিদ্রূপ। মহাবিপ্লবীর দুর্জয় আত্মবিশ্বাসের অগ্নিব্রত তবু নিষ্প্রভ হয়নি। একা, সম্পূর্ণ একা,—জীবন-মৃত্যুর সহস্র সংকটের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে তিনি গড়ে তুলেছিলেন আজাদ হিন্দ্ বিপ্লবের সংগ্রামী বাহিনী। শৌর্যে, বীর্যে, সংগ্রামে, সাধনায়, ঐক্যে ও আশায় মহাবিপ্লবীর এমন অমর কাহিনী পৃথিবীর কোন দেশে কোন কালেও রচিত হয়নি।

মহাবিপ্লবের অমর আহ্বান

সেদিনে ভারতবাসী শুনতে পায়নি সেই মহাবিপ্লবীর আহ্বান। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর পবিত্র রক্তে ভারতের পূর্ব সীমান্ত সেদিন সিক্ত হয়ে উঠেছিল। অমর-মরণ-রক্ত-চরণের দুর্বার দুন্দুভি উঠেছিল গর্জে,—আর গর্জে উঠেছিল সেই সঙ্গে জাতীয় জাগৃতির অমর মন্ত্র —জয় হিন্দ্!

কিন্তু হায়! ভীরুতার কী কালনিদ্রাতেই না তন্দ্রামগ্ন ছিল সেদিন ভারতবাসী! বিদেশী সরকার শুনতে দেয়নি মহানায়কের সেই বিপ্লবের আহ্বান। আর,—এদেশেই নাকি যাদের জন্ম তেমনি এক পরভৃত্তিক রাজনীতিকের দল সেদিন সাম্রাজ্যবাদীর দোসর হয়ে রুদ্ধ করেছিল মহাবিপ্লবীর যাত্রাপথকে। মহাবিপ্লবীকে বলেছিল 'জাপানের দালাল', সাম্রাজ্যবাদীর নিরাপদ পক্ষপুটচ্ছায়ে আশ্রয় নিয়ে ক্লীবকণ্ঠে উচ্চারণ করে এই দেশদ্রোহীর দল বলেছিল যে "বুলেটের মালা দিয়ে নেতাজীকে বরণ করবে তারা"। মহাবিপ্লবীর কুশপুত্তলিকাও এরা দাহ করেছিল,—তাঁর চিত্র টাঙ্গিয়ে দিয়েছিল

কুকুরের গলায়। আঃ! আজ স্মরণ করা যায় না সেদিনের কথা! চরম দেশদ্রোহিতা ও ক্লীবত্বের কী চরম কলুষে সেদিনে দুঃসাহস হয়েছিল এই পরাশ্রয়-জীবিদের কলঙ্ক-নৃত্য করার!

সেদিনে ভারতবাসী শুনতে পায়নি মহানায়কের আহ্বান। আজ তারই জন্য তাদের দুঃখবেদনার অন্ত নেই, আক্ষেপের শেষ নেই। আজ ভারতবাসী চায় সেদিনের সেই ব্যর্থতা, সে অপরাধ সর্বভাবে ক্ষালন করতে। তাই নেতাজীর নামে জনগণের এতো উচ্ছ্বাস। তাঁর জন্মদিনের আয়োজনে ও সমারোহে প্রতিবছর এরূপ বিপুল সমাবেশ। শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের পরিপূর্ণ অঞ্জলি দিয়ে ভারতের জনতা বার বার জানাতে চায় তাঁকে,—ভুলিনি, ভুলিনি তোমায় হে রুদ্র পথিক! ভারতের প্রাণ-প্রিয় হে বিপ্লবী মহানায়ক সুভাষচন্দ্র!

অমর ঐতিহ্যের প্রতি সরকারী উপেক্ষা

নেতাজীর জন্মদিনে একদিকে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসের কী অপূর্ব প্লাবন। আর এক দিকে—রাষ্ট্রের দিকে—কী হীনতা, কী দীনতা! রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান মন্ত্রীর কণ্ঠ থেকে যেখানে সেখানে অগণিত জাতীয় উৎসবের নামে বাক্যোচ্ছ্বাসের অন্ত নেই, কিন্তু তেইশে জানুয়ারীতে বেতার নীরব, সরকারী প্রবক্তাদের ভাষণ অস্ফুট। যাঁর দুর্জয় সংগ্রামের অবদানে লাল কেল্লায় উঠেছে জাতীয় পতাকা, যাঁর দুর্ধর্ষ বৈপ্লবিক অভিযানে ভারত পেয়েছে তার জাতীয় গৌরব,—যাঁর আজাদ হিন্দের আঘাতে ইংরেজের সাম্রাজ্য হয়েছে সমূলে উৎপাটিত—তাঁর ঐতিহ্য স্মরণের উপেক্ষায়, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের কুণ্ঠায় স্বাধীনতা-উত্তর রাষ্ট্রকর্তাদের চিত্ত-দৈন্যের কী ক্লেদময় অভিব্যক্তি!

স্বাধীনতালাভের বিশ বছর পরে আজ সরকারী কর্তৃপক্ষের মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের কত

নেতার নাম বিস্মৃতির গর্ভে মিলিয়ে যাচ্ছে কিন্তু নেতাজীর প্রতি ভারতীয় জনতার শ্রদ্ধা দিন দিন বেড়েই চলছে। নেতাজীকে উপেক্ষা করা সরকারের পক্ষে আজ তাই আর সম্ভব নয়।

বীর্য-সুন্দর বিপ্লব

নেতাজী বীর, নেতাজী বিপ্লবী। শুধু তাই নয়, তিনি বর্তমান-কালে সর্বোত্তম বিপ্লবী। সংগ্রামে, শৌর্যে, বীর্যবত্তায় এবং আত্ম-ত্যাগের অপূর্ব ইতিহাসে তিনি বিপ্লবী জীবনের যে ঐতিহ্য রচনা করেছেন তাঁর কোন তুলনা নেই। বিপ্লবী জীবনের দুঃসাহসিক অভিযানে তিনি মহানায়কের যে বাস্তব ঐতিহ্য রচনা করেছেন, মহা-কাব্যের রচয়িতারা কল্পনার তুলি দিয়েও রুদ্র-সাধনার এমন অপূর্ব বীর্য-সুন্দর মহাজীবনের চিত্র আঁকতে পারেননি। তাই নেতাজী শুধু একালের নন, এ যুগের নন—তিনি সর্বকালের, সর্বযুগের—তিনি সারা বিশ্বের বিপ্লবী জীবনাদর্শের এক অনির্বাণ জ্যোতিষ্ক।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সিংহনাদে

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর অবদান কি? আজিকার রাষ্ট্রনায়কেরা স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর অবদানের পূর্ণ গুরুত্ব স্বীকার করতে রাজী নন। কিন্তু শ্রীদিলীপ রায়ের ভাষায় বলা যায়, "স্বদেশী যুগে শ্রীঅরবিন্দ-তিলক-বারীন্দ্রের নেতৃত্বে যে দুর্জয় আন্দোলনের উপক্রমণিকা, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে তার পরিণতি,—সুভাষের দেশপ্রাণতায় ও অভীমন্ত্রে তার সমাপ্তি।"

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভূমিকা রচিত হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনের অবদানে এবং প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বিপ্লবীদের কর্ম-প্রচেষ্টায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামী পর্বে। দ্বিতীয় মহান অবদান মহাত্মা গান্ধীর। মহাত্মা গান্ধীই জাতীয় চেতনা, জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় আন্দোলনে বিরাট গণ-সংগ্রাম গড়ে

তোলেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্বে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের তৃতীয় যুগ সুরু হয় আগস্ট বিপ্লবে এবং এই বিপ্লবের পরিণতি ঘটে আজাদ হিন্দের পথে ১৯৪৫-৪৬ সালে বৃটিশ-ভারতীয় ফৌজের স্থল-জল-বিমান বাহিনীর বিদ্রোহে এবং ব্যাপক গণ-উত্থানে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই তৃতীয় যুগ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অবদান। নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ বিপ্লবের ফলেই ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পরে সর্বপ্রথম বৃটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে এবং সেই আগুনে জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ভয়েই নিরুপায় হয়ে বৃটিশ সরকার আপসের ব্যবস্থা করে ভারত ত্যাগে বাধ্য হয়।

নেতাজীর আজাদ হিন্দের ঐতিহ্য আরও অনেক দিক দিয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ। আজাদ হিন্দের আগে হিন্দু-মুসলীম-শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যিকার সংগ্রামী ঐক্য কোনদিন গড়ে ওঠেনি। শুধু সংগ্রামের ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্যই নয়,—ধর্ম ও সামাজিক জীবনেও সমন্বয় সাধন করে নেতাজীই আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করে দেখাতে সক্ষম হন যে, ইংরেজের ভেদ-নীতি দূর করা সম্ভব হলে স্বতঃ-স্ফূর্ত আবেগে এক জীবন্ত জাতীয় ঐক্য গঠন করা সম্ভব। আজাদ হিন্দ্ সরকারের মাধ্যমে নেতাজীই প্রথম স্বাধীন ভারতের স্বাধীন সরকার গঠন করেন,—যে সরকারের অধীনে ছিল স্বাধীন আন্দামান-চট্টগ্রাম ও কোহিমা-ইম্ফলের ভারতভূমি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ভারতের সত্যিকার স্বাধীনতা দিবস তাই ২১শে অক্টোবর,—১৫ই আগস্ট নয়। নেতাজীই প্রথম গড়ে তোলেন স্বাধীন সৈন্যবাহিনী এবং আজাদ হিন্দ্ বিপ্লবের অপূর্ব সংগ্রামকাহিনী। আজিকার সংকীর্ণ-চিত্ত রাষ্ট্রনায়কেরা নেতাজীর অবদানকে যতই অস্বীকার করার চেষ্টা করুন না কেন, নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে যতই পরাঙ্মুখ এবং কোহিমা-ইম্ফলের শহীদতীর্থে স্মৃতিস্তম্ভ রচনায় যতই বিমুখ হোন না কেন—ভারতের নিরপেক্ষ ভাবী ঐতিহাসিকেরা এ কথা সমস্বরে

স্বীকার করবেন যে, নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ বিপ্লবের জন্যই অন্তিম-পর্যায়ে ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব হয়েছে।

নেতাজীর স্বাধীনতার স্বপ্ন আজও সম্পূর্ণ হয়নি। তিনি দেশভাগ চাননি, কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্তিও নেতাজীর কাম্য নয়। তিনি চেয়েছেন অখণ্ড ভারতে অখণ্ড জাতীয় জীবন। দেশভাগের তীব্র বিরোধিতা করে রেঙ্গুন থেকে বেতার ভাষণে দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি বলেন, "ভারত বিভক্ত হলে অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের মাতৃভূমিকে খণ্ড করার আমি তীব্র বিরোধী।"

স্বাধীনতার সার্থকতা

নেতাজী শুধু বীর ও বিপ্লবী নন,—তিনি ভারতীয় সমাজ-বিপ্লবেরও অন্যতম উদ্‌গাতা। ১৯২৮ সালে মান্দালয় জেল থেকে মুক্তিলাভের পরে তিনি স্বাধীনতার আদর্শকে সমাজবাদের আদর্শে রূপান্তরিত করার চেষ্টায় অগ্রণী হন। সে সময়ে তিনি অগণিত ছাত্র ও যুব সম্মেলনের মাধ্যমে ভারতের যুবজনকে স্বাধীনতাব নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে এক উদাত্ত আহ্বান জানান। স্বাধীনতার স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি অগণিত যুব সমাবেশে বলেন, "স্বাধীনতার যে কল্পনা আমাদের সমস্ত জীবনে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাবে তার অর্থ আমি বুঝি সর্বাঙ্গীণ জাতীয় মুক্তি,—ব্যক্তি ও সমাজের মুক্তি, দরিদ্র ও ধনীর মুক্তি, সমস্ত ব্যক্তি ও সমস্ত শ্রেণীর মুক্তি। স্বাধীনতার অর্থ শুধু রাজনৈতিক বন্ধন মুক্তি নয়,—সম্পদের সমবণ্টন, বর্ণপ্রথা ও সামাজিক অসাম্যের বিলোপ সাধন, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার উন্মুলন। আমরা চাই ভারতের রূপান্তর, চাই নবজন্ম এবং স্বাধীনতার এক নব-পরিকল্পনার উদ্বোধন। প্রতিটি ব্যক্তির জন্য আমরা চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। রাজনৈতিক, আর্থিক বা সামাজিক —যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন—স্বাধীনতার তাৎপর্য প্রতি

ক্ষেত্রে সমভাগে প্রয়োগ করতে হবে।…স্বাধীনতা যদি হয় আমাদের সকল কাজের প্রাণ-সঞ্জীবনী, তা'হলে স্বাধীনতার অর্থ সমাজবিপ্লব ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। সমগ্র সমাজের স্বাধীনতার তাৎপর্য হল,—নর ও নারীর সমান স্বাধীনতা,—শুধু উচ্চবর্ণের নয়,—নিম্নশ্রেণীরও স্বাধীনতা। এক কথায় স্বাধীনতার অর্থ হল সমস্ত শ্রেণীর, সমস্ত সংখ্যালঘুর, সমস্ত ব্যক্তির স্বাধীনতা। তাই স্বাধীনতার অর্থ সাম্য এবং সাম্যের অর্থ সৌভ্রাত্র। স্বাধীন সমাজে আইনের চোখে ও সামাজিক মর্যাদায় নারীকে পুরুষের সমান স্থান দিতে হবে। জন্মের জন্য দায়ী করে কোন বর্ণকে নিম্নতর স্থান দেওয়ার রীতি নির্মূল করতে হবে। সম্পদের অসাম্য সামাজিক উন্নয়নের পথে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাকে দূর করতে হবে, সবাইকে শিক্ষা ও উন্নতি সাধনের সমান সুযোগ দিয়ে সামাজিক পুনর্গঠন ও দেশ-শাসনের ব্যাপারে সম-অংশীদার করে গড়ে তুলতে হবে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে সবাইকার হবে সমমর্যাদা ও সম-স্বাধীনতা, সকলের জন্য সম-সুযোগ, সম্পদের সম-বণ্টন, সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিলোপ সাধন, বর্ণ-বৈষম্যের অপসারণ—এই হবে স্বাধীন ভারতের নতুন সমাজ গঠনের কয়েকটি মৌলিক সূত্র।"

সমাজবাদের স্বপ্ন

নেতাজী ভারতের অন্যতম সমাজবাদী ও অগ্রনায়ক। ১৯২৮ সালের পরে তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে সমাজবাদী আদর্শ প্রচার করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম গঠনমূলক কর্মপন্থার সঙ্গে 'সমাজবাদী কর্মপন্থা' গ্রহণের জন্য লাহোর কংগ্রেসকে আহ্বান জানান এবং কৃষক, শ্রমিক, নারী, যুবক ও অবনত শ্রেণীকে তাদের বিশিষ্ট দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে জাতীয় সংগ্রামের মঞ্চে সঙ্ঘবদ্ধ করার কর্মসূচী রচনা করেন। করাচী-ভারত নওজোয়ান সভায় ১৯৩১ সালে তিনি

সুস্পষ্টভাবে বলেন, "আমি চাই ভারতে একটি সমাজবাদী লোকতন্ত্র তথা একটি সোস্যালিস্ট রিপাব্লিক গঠন করতে। যার প্রথম লক্ষ্য হবে বৃটিশ-নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন। দ্বিতীয় লক্ষ্য হবে পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তি সাধন যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি কাজ করার এবং বেতন অর্জনের সমান অধিকার লাভ করতে পারবে। আমাদের সমাজে স্থিতস্বার্থ বা অপরিমিত আয়ের কোন স্থান থাকবে না। জাতীয় সম্পদের বণ্টন হবে ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে। এজন্য রাষ্ট্রকে ধন-সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনের দায়িত্ব নিতে হবে। তৃতীয়ত, আমরা চাই সম্পূর্ণ সামাজিক সাম্য,—কোন বর্ণ বা শ্রেণীর বিশেষ প্রভুত্ব রাখা চলবে না। সকলের স্থান ও অধিকার হবে সমান।"

১৯৩১ সালে নিখিল ভারত শ্রমিক সম্মেলনে সমাজবাদী আদর্শ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে ভারতবাসীকে নেতাজী আবার স্মরণ করিয়ে দেন, "আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে, ভারত ও বিশ্বের মুক্তি নির্ভর করছে সমাজবাদের উপরে।" ১৯৩৩ সালে লণ্ডন সম্মেলনেও তিনি ভাবী স্বাধীন ভারতকে লক্ষ্য করে বলেন, "পিগো বা মার্শেলের অর্থনীতি দ্বারা ভারতের কোন কল্যাণ হবে না। স্বাধীন ভারত পুঁজিপতি জমিদার ও বর্ণপ্রথার দেশ হবে না। স্বাধীন ভারত হবে সমাজবাদী ও রাজনৈতিক গণতন্ত্র বা সোস্যাল ও পলিটিক্যাল ডিমোক্র্যাসী। আচার্য নরেন দেব, ইয়ুসুফ মেহের আলী ও জয়প্রকাশের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে সোস্যালিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার সময় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃবর্গ এরূপ সোস্যালিস্ট সংগঠনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু নেতাজী হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে সুস্পষ্টভাবে বলেন, "আমি শুরু থেকেই এই সোস্যালিস্ট দলের মূলনীতি ও আদর্শের সঙ্গে একমত। আমি মনে করি সমাজবাদীদের এরূপ একটি দলে সংগঠিত হওয়া উচিত।" রামগড় সম্মেলনে তিনি আহ্বান জানান: 'জনগণের হাতে ক্ষমতা

দাও!—'অল পাওয়ার টু দি ইণ্ডিয়ান পিপল'! স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যরূপে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন তিনি তিনটি আদর্শ—'স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজবাদ—ফ্রীডম, ডিমোক্র্যাসী ও সোস্যালিজম।

সমাজবাদের অর্থ কম্যুনিজম নয়

নেতাজী যে সমাজবাদের কথা বলেন, সেই সমাজবাদের অর্থ কি? নেতাজীর সমাজবাদ কম্যুনিজম নয়। তিনি তাঁর অনেক প্রবন্ধ ও রচনাবলীতে সুস্পষ্ট করে বলেছেন, "সমাজবাদ সম্বন্ধে আলোকের জন্য রাশিয়ার দিকে চেয়ে থাকা নির্বুদ্ধিতা হবে।...এই ভবিষ্যৎবাণী সুনিশ্চিতভাবে করা যায় যে ভারত কখনো সোভিয়েট রাশিয়ার একটি নূতন সংস্করণ হবে না। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমি অন্য দেশের অন্ধ অনুকরণের বিরোধী। আমাদের নিজস্ব আদর্শ ও প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা আমরাই গঠন করব। ভারতীয় সমাজবাদ কার্ল মার্কসের পুঁথির পাতায় জন্ম নেয়নি,—এর জন্ম হয়েছে ভারতেরই চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির মধ্যে।"

কেন ভারত কম্যুনিজম গ্রহণ করবে না—নেতাজী তার কারণ বর্ণনা করে বলেছেন, "প্রথমত, কম্যুনিজম জাতীয়তাবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। দ্বিতীয়ত, রাশিয়ার রাষ্ট্র ও গীর্জায় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে রাশিয়াতে কম্যুনিজম ধর্মবিরোধী ও জড়বাদী-রূপে গড়ে উঠেছে, পক্ষান্তরে ভারতে রাষ্ট্র ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই বলে এখানে ধর্মবিরোধী মনোভাবও নেই। তৃতীয়ত, রাশিয়া এখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত বলে রাশিয়ার বিশ্ব-বিপ্লবের আগ্রহ এখন খুবই কম। চতুর্থত, কম্যুনিস্ট আদর্শের মূল কথা জড়বাদী ঐতিহাসিক দর্শন। কিন্তু ভারতে এই দর্শন গৃহীত হবে না। পঞ্চমত, অর্থনীতিতে কম্যুনিজমের মূল্যবান অবদান থাকলেও মুদ্রাতত্ত্বে কম্যুনিজম খুব দুর্বল।" ১৯৪৪ সালে টোকিও ভাষণে

কম্যুনিজমের একই সমালোচনা করে তিনি বলেন, "কম্যুনিজম মানব জীবনের আর্থিক দিকের প্রতি মাত্রাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। আর্থিক প্রভাবকে আমরা স্বীকার করি, কিন্তু একে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই।"

কম্যুনিজমকে মানবসমাজের সর্বোত্তম আদর্শ বলে নেতাজী কোন সময়েই বিশ্বাস করেননি। ত্রিশ দশকে প্রথমে ইয়োরোপে হিটলার ও মুসোলিনীর প্রভাব বাড়তে আরম্ভ করেছিল এবং ফ্যাসীজম ও কম্যুনিজমের রাজনৈতিক দর্শনের আদর্শ তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল ইয়োরোপের রাজনৈতিক মঞ্চে। সেই সময়ে ফ্যাসিজম ও কম্যুনিজমের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে ১৯৩৪ সালে শ্রীনেহরু কম্যুনিজমের জড়বাদী দর্শন সমর্থন করে একটি বিবৃতি দেন। ফ্যাসীজম বা কম্যুনিজম,—এরূপ যে কোন একটি মতবাদকে চূড়ান্ত-ভাবে গ্রহণ করতে হবে শ্রীনেহরুর এরূপ একবাদী সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিবাদ করে নেতাজী বলেন, "মানব-প্রগতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। আমরা যদি বিবর্তনের শেষ সীমায় না এসে থাকি অথবা বিবর্তনকেই যদি অস্বীকার না করি তা'হলে একথা বলা নির্বুদ্ধিতা হবে যে, কোন একটি সমাজ-ব্যবস্থায় এসে মানব-প্রগতি শেষ হয়ে গেল। মানব-প্রগতি কোনদিন থামবে না!"

নেতাজীর ভারতীয় সমাজবাদ

নেতাজী চেয়েছেন ভারতবর্ষ তার নিজের ইতিহাস, পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজস্ব সমাজবাদ গড়ে তুলবে। তিনি বলেছেন যে, ভারতের একটি নিজস্ব কৃষ্টি আছে, ভারত নিজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই নিজের সমাজবাদ গড়ে তুলবে। ভারতের একটি রাজ-নৈতিক দল এতদিন সোস্যালিজমের নামে রাশিয়ার মুখাপেক্ষী ও আজ্ঞাবহ ছিল। এখন সেই দলের একটি বড় অংশ চীনের অন্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছে। ভারতের সমাজবাদ রাশিয়া বা চীন,—এরূপ

কোন দেশের অনুকরণে বা নিয়ন্ত্রণে গড়ে উঠবে না। ভারত নিজের সমাজবাদ নিজস্ব মনীষা, সৃজনপ্রতিভা ও জাতীয় সংকল্পের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতিতে গড়ে তুলবে,—নেতাজী এই সমাজবাদী আদর্শেই গড়ে তুলতে চেয়েছেন স্বাধীন ভারতবর্ষকে। তিনি ১৯৩১ সালে তাই বলেছেন, "আমি চাই পরিপূর্ণ সমাজবাদ কিন্তু ভারতকে তার সমাজবাদী কাঠামো ও পদ্ধতি নিজেকেই উদ্ভাবিত করতে হবে। অন্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে ভারত শিক্ষা গ্রহণ করবে কিন্তু নিজের প্রয়োজন ও পরিবেশ অনুযায়ী একটি নিজস্ব পদ্ধতি রচনা করতে সক্ষম হবে। আমি মনে করি ভারত সমাজবাদের একটি কাঠামোও নিজস্বভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। ভারতে যে সমাজবাদ গড়ে উঠবে তা' অনেক দিক দিয়ে হবে মৌলিক ও নূতন এবং সারা বিশ্ব এই সমাজবাদী আদর্শে উপকৃত হবে।"

সমাজবাদী রাষ্ট্র পরিকল্পনা

জাতীয় পরিকল্পনার সর্বপ্রথম উদ্গাতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র। নেতাজীর উদ্যোগেই পরাধীন ভারতে প্রথম পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। সে সময়ে গান্ধীজী এরূপ পরিকল্পনা কমিশনের প্রস্তাব সমর্থন করেননি। গান্ধীজীর সম্মতি না-পাওয়া সত্ত্বেও নেতাজী একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। সেই কমিশন ভারতের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্, বিজ্ঞানী, শিল্পপতি এবং রাজনীতিবিদের সহযোগিতায় বহু প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে এবং পরিকল্পনার একটি কাঠামোও রচনা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পরিকল্পনা সম্বন্ধে অজস্র প্রচার সত্ত্বেও বর্তমান রাষ্ট্র-কর্ণধাররা সেই পরিকল্পনা-প্রসঙ্গে একবারও নেতাজীর নাম উচ্চারণ করেন না। এই কমিশন কিভাবে এবং কোন্ নীতিতে সমাজবাদী আদর্শে ভারতের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে নেতাজী ১৯৩৮ সালে হরিপুরা ভাষণে তার বর্ণনা দিয়ে বলেন, "আমার মনে একটুও সন্দেহ নেই যে, ভারতের দারিদ্র্য, ব্যাধি ও নিরক্ষরতার অবসান এবং উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সমস্যা সমাধান করতে হবে

সমাজবাদী পন্থায়। জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে আমাদের প্রধান সমস্যা হবে ভারতের সমাজ-জীবন থেকে দারিদ্র্য উৎপাটন করা। তার জন্য জমিদারী বিলোপসহ ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে হবে। কৃষকদের ঋণমুক্ত করে গ্রাম্য জনতাকে সহজলভ্য ঋণদানের ব্যবস্থা করতে হবে। জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াবার জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির উন্নয়ন করতে হবে। আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য শুধু কৃষির উন্নয়নই যথেষ্ট হবে না। রাষ্ট্রের আয়ত্তে ও নিয়ন্ত্রণে শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা অপরিহার্য হবে। পরিকল্পনা কমিশনকে স্থির করতে হবে কোন্ কোন্ কুটীর-শিল্প বাঁচিয়ে তোলা হবে এবং কোন্ বৃহৎ শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া হবে। আমাদের শিল্পায়নের ব্যবস্থাও করতে হবে, সেই সঙ্গে শিল্পের অপ-ক্রিয়ারও নিরোধ করতে হবে এবং ভারতে কি কি কুটীর-শিল্প বাঁচিয়ে তোলা হবে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। কৃষির সঙ্গে চরখা ও তাঁতের ন্যায় বহু কুটীর-শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু অন্তিম পর্যায়ে আমাদের সমগ্র কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থাকে পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শে সমাজীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।”

এই কথাটিই তিনি ১৯৪১ সালে কাবুল থেকে লেখা চিঠিতে পুনরুচ্চারিত করে বলেন, “আমাদের উদ্দেশ্য একটি আধুনিক ও সমাজবাদী রাষ্ট্র গঠন এবং উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সমাজবাদী নিয়ন্ত্রণ এবং নয়া সমাজ প্রতিষ্ঠায় সামাজিক সাম্য ও ঐক্যের আদর্শ প্রবর্তন।” ১৯৪৪ সালে টোকিও থেকে আরও সুস্পষ্ট কণ্ঠে নেতাজী ভাবী ভারতকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, “ভারতের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব যদি আমরা বে-সরকারী ব্যক্তিত্বের উদ্যমের উপর ছেড়ে দেই, তা'হলে কয়েক শতাব্দীতেও এ-সমস্যার সমাধান হবে না। ভারতের জনগণ চায় একটি সমাজবাদী ব্যবস্থা যাতে বে-সরকারী ব্যক্তির হাতে আর্থিক উন্নয়নের ভার ছেড়ে দেওয়া হবে না,—রাষ্ট্রকেই আর্থিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিতে হবে।”

আগামী দিনের নয়া সমাজ

নেতাজী বার বার বলেছেন, এ-যুগের সর্বশেষ সমাজবিপ্লব হবে ভারতবর্ষে। মানব-সমাজ আজ বিভিন্ন সমাজ-বিপ্লবের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে নয়া সমাজ প্রতিষ্ঠার নতুন অধ্যায়ে। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের ধারায় বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করে নেতাজী বলেছেন, "সতের শতাব্দীতে ইংলণ্ড বিশ্বকে গণতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের চিন্তাধারা উপহার দিয়েছে। আঠার শতাব্দীতে ফ্রান্স বিশ্বকে দিয়েছে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ। উনিশ শতাব্দীতে জার্মানী বিশ্বকে দিয়েছে মার্কসীয় দর্শন। বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া প্রোলেটারিয়ান রাষ্ট্র গঠন করে বিশ্বসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে। ভারত যখন স্বাধীন হবে তখন ভারতকে নূতন ও মৌলিক পরীক্ষা করতে হবে। এযুগে বিশ্বের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশে ভারতকে তুলে ধরতে হবে পরবর্তী অবদান।" ভারতীয় সমাজবাদ সমাজ-বিপ্লবের নতুন আদর্শে সারা বিশ্বকে নতুন কিছু দেবে,—এই স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৪৪ সালে নেতাজী আবার স্বাধীন ভারতকে লক্ষ্য করে বলেন, "বিশ্বের রাজনীতি ও সমাজ বিবর্তনের ধারায় ভারতকে এগিয়ে যেতে হবে পরবর্তী অধ্যায়ে।"

ভারত আজ স্বাধীন। কিন্তু এই বিখণ্ডিত ভারত নেতাজীর কাম্য ছিল না। যে স্বাধীনতা ভারত আজ লাভ করেছে তা'ও নেতাজীর স্বপ্ন-সাধনার পূর্ণ-কল্প স্বাধীনতা নয়,—আজিকার ভারতে নেতাজীর স্বপ্নময়ী প্রাণ-গঙ্গা প্রাবাহিত হয়নি। ভারতীয় জাতীয় জীবন আজ জরাজীর্ণ, মুমূর্ষু ও পঙ্গু। কিন্তু এই সমস্যা-সংকুল জীবন একদিন পরিপূর্ণ সম্ভাবনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠবেই। আজ ভারতের সামনে একদিকে ক্যাপিটালিজম এবং অন্যদিকে কম্যুনিজমের চ্যালেঞ্জ। চীন আজ কম্যুনিজমের নামে গণতান্ত্রিক এশিয়ার সামনে এক গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছে। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে সমগ্র এশিয়ায় কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা চীনের অভিপ্রায়। পক্ষান্তরে ক্যাপিটালিজম ও ফিউডা-

লিজমের প্রভাবে এশিয়ায় গণতন্ত্রের সমাজবাদী রূপায়ণের কার্যক্রম এখনও সার্থক হয়ে ওঠেনি। কম্যুনিজমের নামে ব্যক্তি-সাধীনতা ও গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে পার্টিতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা নয়,—গণতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয়ে এক নতুন সমাজবাদী রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের আদর্শই নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনার অন্তিম লক্ষ্য। নেতাজীর দুর্বার আদর্শ ও আশাবাদের প্রদীপ্ত মশালে ভারতের স্তিমিত চিত্তে জ্বালিয়ে তুলতে হবে নতুন জীবনায়নের এক প্রাণস্পর্শী সঙ্কল্প।

—লোকসেবক

গান্ধী-সুভাষের জীবন-দর্শন

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের স্থান সর্বোত্তম। ভারতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ নায়কদ্বয়ের আদর্শ একান্তভাবেই পরস্পরের বিরোধী, —একথাই ইতিহাসের বাহ্যিক স্বাক্ষর। বিশ ও ত্রিশ দশকের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস সাধারণভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন গান্ধী-বিরোধের এক সুতীব্র সংকেত। তবুও এই গান্ধী-বিরোধী সুভাষই গান্ধীজীকে সর্বপ্রথম সম্ভাষিত করেছেন 'জাতির পিতা' নামে। গান্ধীজীর প্রতি বিদ্রোহী সুভাষের এরূপ অপূর্ব মহিমান্বিত শ্রদ্ধাঞ্জলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি?

গান্ধী অহিংসাবাদী, সুভাষ সহিংস বিপ্লববাদী; গান্ধী সংস্কারপন্থী, সুভাষ আমূল পরিবর্তনকামী; গান্ধী শান্তিবাদী, সুভাষ শক্তিবাদী, গান্ধী চরখায় বিশ্বাসী, সুভাষ শিল্পে বিশ্বাসী,—আপাতদৃষ্টিতে গান্ধী-সুভাষের জীবন-ধর্মের এই হলো পরস্পরবিরোধী বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এই বিরোধিতার মূলে যে গান্ধী-সুভাষের জীবন-দর্শনে একটি গভীর ঐক্য রয়েছে তার স্বরূপ সন্ধানের প্রয়াস 'মহাত্মাজী ও নেতাজীর জীবন-দর্শন' নামের এই প্রবন্ধটি। গান্ধী-সুভাষ উভয়েরই জীবন-দর্শনের মূল উৎস ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ,—উভয়েই গভীরভাবে প্রেমধর্মী, মানবতাবাদী,—উভয়েরই বিশ্বাস এযুগের বিশ্বকে শুনাবার মত ভারতের একটি বাণী আছে, —উভয়েই রাজনীতিকে গ্রহণ করেছেন কর্মযোগী অধ্যাত্মবাদীর সুগভীর আবেদনে। গান্ধী-সুভাষের পার্থক্য মূলত দর্শনে নয়,—পদ্ধতির রূপায়ণে। এই প্রবন্ধটি বস্তুত দুই মহামানবের জীবনধর্মের দার্শনিক তুল্যাংকের একটি মৌলিক পর্যালোচনা।

মহাত্মাজী ও নেতাজীর জীবন-দর্শন

পরাধীন ভারতের জাতীয় জীবনে অনেক নেতা জনমনের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি পেয়েছেন ; কিন্তু একান্তরূপে ভারতের সমগ্র জনমনকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করেছেন দু'জন মহোত্তম মানব। তাঁরা দু'জন হলেন—মহাত্মাজী ও নেতাজী। দু'জনেই ভারতের জনমনে একান্ত আপন, পরম প্রিয়। এমনি আপন করে ভারতের জনমন আর কোন নেতাকেই গ্রহণ করতে পারেনি। ভারতের জাগ্রত জনমনের সমগ্র অনুভূতিতে রয়েছে গান্ধীজীর মহত্ত্ব। পক্ষান্তরে ভারতীয় জনতার চোখে ফুটে উঠেছে নেতাজীর নবজীবনের স্বপ্ন। গান্ধীজীর আসন ভারতের হৃদয়ে। আগামী দিনের পরিকল্পনায় নেতাজী এই গান্ধী-হৃদয় ভারতের স্বপ্নকামী মনটিকে নিয়েছেন জয় করে।

ভারতীয় জন-জীবনের হৃদয়ে ও মনে গান্ধীজী ও নেতাজী পেয়েছেন একান্ত আপনজনের পরম আসন। কিন্তু একই আসনে গান্ধী-সুভাষের সমন্বয় করতে যেয়ে ভারতের জাতীয় জীবনে বারবার হৃদয় ও মনের ঝড় উঠেছে। বারবার হৃদয় ও মনের তাড়নায় বিভ্রান্ত হয়ে জনচিত্তে প্রশ্ন উঠেছে,—গান্ধী ? না, সুভাষ ? জনচিত্ত এমনি প্রশ্ন করেও গান্ধী-সুভাষকে আলাদা করে দেখতে চায়নি, কিন্তু সম্পূর্ণ এক করেও নিতে পারেনি। দ্বিধাদ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ অন্তরে জনতা বিস্মিত হয়ে ভেবেছে,—মহাত্মাজী ও নেতাজীর কর্মজীবন ও

আদর্শে কি কোন মিল নেই ? বাপুজীকে গ্রহণ করতে হলে কি নেতাজীকে বর্জন করতে হবে ? নেতাজীর দৃষ্টি দিয়ে ভাবী-সমাজের স্বপ্ন রচনা করতে হলে কি মহাত্মাজীর প্রেম ও মৈত্রীর আমন্ত্রণকে অস্বীকার করতে হবে ?

কেউ কেউ বলেন—হয় গান্ধী, নয় সুভাষ। তেলেজলে যেমন মিশ খায় না, গান্ধী ও সুভাষের জীবনাদর্শেও তেমনি মিল হয় না। গান্ধীজী সংস্কারপন্থী, সুভাষ বিপ্লববাদী। গান্ধীজী শান্তিবাদী, সুভাষ শক্তিবাদী। গান্ধীজী চেয়েছেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাষ্ট্র-ক্ষমতার হস্তান্তর (peaceful transference of power), সুভাষের কার্যক্রম ছিল বিপ্লবের পথে রাষ্ট্র-ক্ষমতার অধিকার (revolutionary seizure of power)। অহিংসা গান্ধীজীর জীবনাদর্শের মর্মবাণী (creed), পক্ষান্তরে সুভাষের বিপ্লববাদে অহিংসা একটি কার্যকরী নীতি (policy) মাত্র। গান্ধীজী জাতিকে গঠনমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করতে বলেছেন। সুভাষ গঠনমূলক কর্মপন্থার সঙ্গে যোগ দিতে চেয়েছেন সমাজবাদী কর্মসূচী ("Socialist Programme")। সুতরাং গান্ধী ও সুভাষের কর্ম ও জীবন-দর্শনে মিল কোথায় ?

বিদ্রোহী সুভাষ

ইতিহাসের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে গেলে এমনিতর অনেক অমিলের সন্ধান পাওয়া যাবে গান্ধী-সুভাষের যুগ্মজীবনে। স্বাধীনতা যুগের জাতীয় কংগ্রেসের প্রাণসঞ্চার করেছেন গান্ধীজী। ভারতের সেদিনকার জাতীয় কংগ্রেস গান্ধীজীর আদর্শ এবং কর্ম-বাণীতে গড়া। নিজের আদর্শ ও পরিকল্পনা দিয়ে কংগ্রেসকে গড়তে যেয়ে গান্ধীজী বাধা পেয়েছেন অনেকের কাছে। কিন্তু একমাত্র দেশবন্ধু ব্যতীত সে বাধার কার্যকারিতা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। যাঁরা গান্ধীজীকে বাধা দিয়েছেন একে একে পরাজিত হয়ে জাতীয় আন্দোলনের মঞ্চ থেকে তাঁরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন, অথবা

গান্ধীজীর কাছে আত্মসমর্পণ করে গান্ধীজীর কর্মপন্থা ও নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে কংগ্রেসের সকল নেতাই গান্ধীজীর অতি-মানবত্বের সামনে মাথা নত করেছেন,—বিনা তর্কে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের পথকে গ্রহণ করেছেন। তবুও গান্ধীজীর আদর্শ ও কর্মপন্থা নিয়ে কংগ্রেসসেবীদের হৃদয় ও মনে বারবার সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে, কিন্তু মহাত্মার মহত্ত্ব ও ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর কর্মপন্থার অভিনবত্ব কংগ্রেসসেবীদের হৃদয় জয় করে নিয়েছে প্রতিবারেই। সত্যাগ্রহের পরীক্ষায় গান্ধীজী কার্যকরীভাবে বাধা পেয়েছেন প্রথমবারে দেশবন্ধুর কাছে এবং দ্বিতীয়বারে নেতাজীর আপসবিরোধী কর্মপন্থায়। কংগ্রেসে এমন একজন নেতাও নেই যিনি গান্ধীজীর দুর্জ্জেয় ব্যক্তিত্বের সামনে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হয়ে যাননি। কিন্তু যুক্তি ও বুদ্ধিকে অকুণ্ঠ অঞ্জলি দিয়ে একমাত্র সুভাষই বিনা দ্বিধায় গান্ধীজীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেছেন। সুভাষ গান্ধাজীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন কিন্তু বিচার করে। গান্ধীজীর অসহযোগ আইন অমান্যকে নিরস্ত্র ভারতের শ্রেষ্ঠ অস্ত্ররূপে স্বীকার করেছেন কিন্তু সুভাষ সত্যাগ্রহের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। সত্যাগ্রহের প্রতি সুভাষের মনোভাব ভক্তির নয়,—যুক্তির। গান্ধীজীর আহ্বানে সুভাষ বিপুল বিক্রমে প্রতিবার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছেন কিন্তু জাতীয় সংগ্রামের প্রতি পর্যায়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন গান্ধীজীর অহিংস-কেন্দ্রিক আপস-প্রবণতার দিকে।

নেতাজীর দৃষ্টিতে গান্ধীজী

ভারতের জাতীয় সংগ্রামে গান্ধীজীর অবদানের গুরুত্ব বিচারে সুভাষ কোনদিন ভুল করেননি। মুমূর্ষু ভারতের জাতীয় জীবনে নবজন্মের প্রাণ-স্পন্দন সৃষ্টি করেছেন গান্ধীজী। ঐক্য ও রাষ্ট্র-সচেতন আজকের জাতীয় ভারত গান্ধীজীরই সৃষ্টি। আজাদ হিন্দ

অভিযানের পূর্বাহ্নে নেতাজী গান্ধীজীর আশীর্বাণী প্রার্থনা করে তাই বলেছিলেন—"জাতির পিতা! তোমার আশীর্বাদ চাই!" সুভাষ গান্ধীজীকে যেন নতুন করে পরিচয়ের এক পরম শ্রদ্ধায় তুলে ধরেছেন ভারতের সামনে। গান্ধীজী শুধু ভারতের রাষ্ট্রগুরু নন, শুধু মহাত্মা নন,—তিনি জাতির পিতা! আজ ভারতবাসীর মুখে মুখে নেতাজীর এই পরম শ্রদ্ধার সম্ভাষণ গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। অমর বাণী 'জয় হিন্দ'-এর মত 'জাতির পিতা—মহাত্মা গান্ধী' অমর হয়ে থাকবে ভারতের ইতিহাসে এবং একথাও স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরদিন যে গান্ধীবাদী কংগ্রেসের বিদ্রোহী সুভাষই নিজের অন্তরের অনুপম শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে গান্ধীজীর জন্য এই পরম রাষ্ট্রীয় আসন স্থাপন করেছেন ভারতের ইতিহাসে।

জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনার নীতি সম্পর্কে সুভাষ গান্ধীজীকে বারবার প্রশ্ন করেছেন—গান্ধীজীর অহিংস প্রবণতার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে গান্ধীজীর আপস-আলোচনার ঝোঁককে কোন সময়েই সহৃদয় চিত্তে সুভাষ গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি তর্ক করেছেন এবং প্রয়োজন হলে বিদ্রোহও করেছেন গান্ধীজীর নীতি ও কর্মপন্থার বিরুদ্ধে, কিন্তু গান্ধীজী যে ভারতের রাষ্ট্রনেতা একথা সুভাষ অস্বীকার করেননি কোনদিন।

গান্ধী-সুভাষ জীবনাদর্শের মৌলিক ঐক্য

ইতিহাসের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে মহাত্মাজীর সঙ্গে নেতাজীর অনৈক্য দেখা যাবে অনেক ঘটনায়। কিন্তু দর্শনের অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে এরূপ বাইরের ঘটনাবলীর অন্তঃস্থলে ডুবে গেলে শোনা যাবে গান্ধী-সুভাষ জীবনদর্শনের একটি গভীর ঐকতান। সাময়িকের চৌমুখী যাত্রা-পথ গান্ধী-সুভাষকে একেবারে মেলাতে পারেনি কিন্তু চিরন্তনের ফল্‌গুধারায় ঘটেছে তাঁর জীবনাদর্শের সঙ্গম।

ভারতীয় ইতিহাসের যে মর্মবাণী আজো চিরন্তন হয়ে রয়েছে—যুগ যুগ ধরে ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্তর্লোকে অনুরণিত হয়ে ভারতীয় ইতিহাসের গতিকে আজো অবিচ্ছিন্ন রেখেছে—সেই বাণীই গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে গান্ধী-সুভাষের যুগ্ম জীবনাদর্শে। গান্ধী-সুভাষ একই আলোকের দ্বয়ী দীপশিখা। জীবনের আনন্দ ও আস্বাদে গান্ধী-সুভাষের অমিল নেই। একই উদ্দেশ্যে, একই অভিপ্রায়ে, একই স্বপ্নের অন্তিম মূল্যে গান্ধী-সুভাষের জীবনকে কর্মশীল ও উদ্দেশ্যময় করেছে। একই উৎসের অবদানে গান্ধী-সুভাষের জীবন জ্যোতির্ময় ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে ভারতের জাতীয় জীবনে। ভারতীয় ইতিহাসের চিরন্তন উৎস থেকে মহাত্মাজী ও নেতাজী লাভ করেছেন জীবন-দর্শনের একই মূল্য-পরিকল্পনা। ভারতের যে চিরন্তন মর্মবাণী গান্ধী-সুভাষের জীবনাদর্শে মূর্তিমন্ত হয়ে উঠেছে, তাঁর পরিচয় হল,—মানুষের জীবন ও সভ্যতার আত্মিক মূল্য (a spiritual value of life) এবং এ-মূল্যের সমন্বয়ী (Synthetic) বিকাশ। গান্ধীজী ও নেতাজী সমভাবেই বিশ্বাস করেছেন যে জীবনের আত্মিক প্রমূল্যের স্বীকৃতি এবং এই প্রমূল্যের সমন্বয়ী প্রয়োগ,—এরূপ আদর্শবাদ দ্বারাই উচ্চতর মানুষ ও সমাজ-জীবন রচনা করা সম্ভব ও প্রয়োজন। ভারতীয় ইতিহাসের এই দ্বয়ী প্রমূল্যের চিরন্তনতার আলোতে গান্ধী-সুভাষ জীবন ও সভ্যতার মূল্য পরিকল্পনা করেছেন। এই আত্মিক মূল্য এবং সমন্বয়ী বিকাশের দৃষ্টি ভারতীয় ইতিহাসের অবদান হলেও এই মূল্যদ্বয়ের আবেদন বিশ্বজনীন। ভারতীয় ইতিহাসের এই মর্মবাণী গান্ধী-সুভাষের জীবনকে উদ্দেশ্যময় করে তুলেছে—নবজীবন ও সভ্যতার পূর্ণ সংগঠনে তাঁদের কর্মপ্রেরণাকে স্পন্দিত করে তুলেছে। গান্ধী-সুভাষ একথা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করেছেন যে ভারতের এই বাণী শুধু ভারতের জাতীয় জীবনের পুনঃসংস্কারের জন্যই নয়, বর্তমান পৃথিবীর সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংকটমোচন করবার জন্যও আজকের দিনে

এই বাণীর কার্যকরী রূপায়ণ একান্ত প্রয়োজন। নব জীবনাদর্শের পরিকল্পনায় গান্ধী-সুভাষ শুধু তাই সংকীর্ণ ভারতীয় নন,—একান্ত ভাবে বিশ্বজনীন।

রাজনীতির দৃষ্টি ঃ জনসেবা

বিশ্বের কাছে মহাত্মাজী ও নেতাজীর পরিচয় রাজনৈতিক নেতারূপে। কিন্তু বিশ্বের প্রচলিত অর্থে গান্ধী-সুভাষের রাজনৈতিক জীবন গড়ে ওঠেনি। গান্ধী-সুভাষের কাছে রাজনীতি বৃত্তি নয়, পেশাও (Profession) নয়। পাশ্চাত্য জীবনের ধারণায় জীবনের আর দশটা পেশার মত রাজনীতিও একটা পেশা। তাই ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই রাজনৈতিক পেশার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু গান্ধী-সুভাষের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নয়,—জীবনের এক গভীর আদর্শ সাধনার জন্যই রাজনীতি। রাজনীতি তাই গান্ধী-সুভাষের কাছে অধ্যাত্ম সাধনার পথে কর্মযোগের একটি বিশিষ্ট পথ। গান্ধীজীর কাছে রাজনীতি ধর্মের অঙ্গ ('religion') এবং সুভাষ রাজনীতির নাম দিয়েছেন "সম্মিলিত সাধনা" ("Collective Sadhana")। চিরন্তন যে জিজ্ঞাসা মানুষের অন্তর্মানবকে সদা আকুল করে তোলে সেই জিজ্ঞাসার সমাধানে একটি উপায়-রূপেই গান্ধী-সুভাষের রাজনৈতিক জীবন গ্রহণ। রাজনীতি গান্ধী-সুভাষের কাছে জন-সেবাব্রতের এক মহান্ আবেদন। মানবতাকে সেবা করবার এক পবিত্র উপায় হল এই রাজনীতি। গান্ধীজী অনুভব করেছেন, "সেবার ভিতর দিয়েই ভগবানকে পাওয়া যায়। আমার কাছে এই সেবাই ভারতের সেবা।" সুভাষও তেমনি অকপট চিত্তে বলেছেন, "স্বদেশ সেবা বা রাজনৈতিক পর্যালোচনা আমি সাময়িক বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিনি।……স্বরাজ লাভের পুণ্য প্রচেষ্টাই আমার জীবনের জপ তপ ও স্বধ্যায়, আমার সাধনা ও মুক্তির সোপান।" গান্ধী-সুভাষ উভয়েই এক আত্মিক সন্ধানের

উপায়রূপে গ্রহণ করেছেন রাজনৈতিক সেবাব্রত। রাজনৈতিক জীবনের দার্শনিক দৃষ্টিতে উভয়েই আদর্শবাদী—গান্ধীজী হলেন কার্য-নিপুণ দ্রষ্টা, আর সুভাষ স্বপ্নাচারী বাস্তববাদী।

গান্ধী-সুভাষের মৌলিক প্রমূল্য—প্রেম

গান্ধীজীর আত্মিক প্রমূল্যের কার্যকরী রূপায়ণ হয়েছে প্রেমে (love)। প্রেমই আধ্যাত্মিক মূল্যের সারমর্ম। প্রেমের আবেদনই গান্ধীজীর আধ্যাত্মিক সাধনা। জীবনের আদর্শ ও মানবতার সেবা মূর্তিমন্ত হয়ে উঠেছে এবং সার্থক ও সফল হয়ে উঠেছে এই প্রেমের অনুভূতিতে। গান্ধীজীর মতে জীবন ও বিশ্বের অন্তিম অনুভূতি হল প্রেমে। প্রেমেই,—গান্ধীজীর কাছে,—জীবনের ধর্ম ও বিশ্বের প্রকৃতি-পরিচয়। সমগ্র জীবনে ও বিশ্বব্যাপী গান্ধীজীর এই প্রেমের অনন্ত লীলা দেখতে পেয়েছেন।

সুভাষের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী কি? সুভাষও নিজের বিশ্বাসের কথা নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "আমার মতে প্রকৃতির অন্তিম পরিচয় হল প্রেমে। প্রেমই বিশ্বলোকের সারমর্ম এবং জীবনের অন্তিম আদর্শ।······যে মৌলিক আদর্শের উপরে জীবনকে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য আমি প্রেমের একান্ত প্রয়োজন বোধ করি।" [The essential nature of reality is Love. Love is the essence of universe and the principle of human life.······I feel...I need love as the basic principle on which to reconstruct life······"]

গান্ধী-সুভাষের জীবনে আধ্যাত্মিক মূল্যের বাস্তব রূপায়ণ হয়েছে প্রেমের অনুভূতিতে। গান্ধী-সুভাষের স্বপ্ন ও আদর্শ,—তাঁদের কর্ম ও প্রেরণা এই প্রেমের মাধুর্য-স্পর্শেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে এবং তাঁদের জীবন-পরিকল্পনাকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করে তুলেছে। যে অধ্যাত্মবোধ গান্ধী-সুভাষের রাজনৈতিক জীবনকে উদ্বুদ্ধ করেছে সে অধ্যাত্মবোধই

গান্ধী-সুভাষের অন্তরে দিয়েছে পরম স্নিগ্ধ প্রেমানুভূতি। প্রেমানুভূতির এই মণিস্পর্শেই মহাত্মাজী এবং নেতাজী নিজেদের জীবনকে মানবতার সেবায় উৎসর্গ করার জন্য পেয়েছেন এক দুর্নিবার ও পরম আমন্ত্রণ।

প্রেমের রূপায়ণ—একমাত্র অহিংসায় ?

গান্ধী-সুভাষ দুজনেই বলেছেন যে প্রেমই বিশ্বজীবনের সারমর্ম এবং আধ্যাত্মিক মূল্যের মর্মবাণীও হল এই বিশ্বজনীন প্রেম। কিন্তু বিশ্বলোকে জীবনের যে অভিব্যক্তি তার প্রকৃতিতে প্রেমের বাস্তব রূপায়ণ হয় কি ভাবে ? বিশ্বের জীবনচ্ছন্দে কিরূপে ঘটে প্রেমের প্রকাশ ? কোন্ মাধুর্যে প্রেম প্রতিদিনকার জীবনে আপন পরিচয়ের স্পর্শ দিয়ে যায় ?

গান্ধীজী বলেন যে একমাত্র সত্য এবং অহিংসাই প্রেমের আন্তরিক প্রকৃতি। সত্য এবং অহিংসা ব্যতীত প্রেমের সত্যিকার রূপায়ণ সম্ভব নয় এবং প্রেমের অনুভূতিও এই দ্বয়ী গুণের বিকাশ ছাড়া অসম্ভব। গান্ধীজীর স্থির বিশ্বাস, "মানব জাতির মৌলিক বিধান হল অহিংসা...প্রেমের দেবতায় যাদের জীবন্ত বিশ্বাস নেই তারা এই বিধানের স্বরূপ বুঝতে পারে না।" ["Non-violence is the law of human race. ···It does not avail to those who do not possess a living faith in the God of love."] অহিংসাকে গান্ধীজী বিশ্ববিধানের অন্তিম মর্যাদা দিয়ে অহিংসার প্রয়োগকে সর্বময় করে তোলবার দাবী করেছেন। গান্ধীজীর সর্বকাজের বিধানে অহিংসাই একমাত্র মূলমন্ত্র। অহিংসা গান্ধীজীর কাছে কাজের প্রয়োজনে ব্যবহার করবার মত একটি নীতি মাত্র (policy) নয়,—অহিংসা গান্ধীজীর জীবনাদর্শে একটি অখণ্ড আদর্শ (creed)। এই বিশ্বাসেই গান্ধীজী বলেছেন: "অহিংসাকে যদি জীবনের বিধানরূপে গ্রহণ করা হয়, তা'হলে জীবনে অহিংসার

রূপায়ণ হবে সর্বময়,—শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন কাজেই অহিংসা সীমাবদ্ধ থাকবে না।…একথা ভাবা খুবই ভুল যে এই বিধান ব্যক্তি-জীবনের পক্ষে কল্যাণকর হলেও বিশ্ব-জনতার পক্ষে নয়।" ("When non-violence is accepted as the law of life, it must pervade the whole being and not be applied to isolated acts. ...It is a profound error to suppose that while the law is good enough for individuals, it is not for masses of mankind.") বিশ্ব-জীবনের মৌলিক বিধানরূপে অহিংসার উপরে গান্ধীজীর এই প্রগাঢ় বিশ্বাস গান্ধীজীকে সর্বকাজে এবং সর্ব-মতবাদে অহিংসধর্মী করে তুলেছে। গান্ধীজীর ধারণা, অহিংসার মূলমন্ত্র গ্রহণ-করা ব্যতীত মানুষের জীবন ও সভ্যতাকে সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই গান্ধীজীর সামাজিক জীবনবাদ তথা রাজনৈতিক ও আর্থিক জীবনাদর্শ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পরিকল্পনা এবং নীতি ও নৈতিকতার মূল্য নিরূপণ প্রচেষ্টায় রয়েছে অহিংসার সর্বময় দাবী। কার্যকরীভাবে গান্ধীজীর জীবনবাদ তাই বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে অহিংসার এই অখণ্ড ও সর্বময় প্রয়োগ বিধানে।

বিশ্বজীবনের অভিব্যক্তিতে অহিংসাই একমাত্র অন্তিম বিধান, সুভাষ অহিংসার এই সর্বময় ও অখণ্ড দাবী স্বীকার করেন না। সুভাষ বলেন,—অহিংসা বিশ্বজীবনের একটি গ্রহণীয় বিধান হতে পারে কিন্তু অহিংসাই যে একমাত্র অন্তিম বিধান এরূপ মন্তব্যের যৌক্তিকতা কোথায়? প্রেমের বিকাশ ও বিভূতি কি একমাত্র অহিংসার বিধানেই সন্নিহিত? বিশ্ববিবর্তনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সুভাষ লক্ষ্য করেছেন, "বাস্তবের অবলম্বন আত্মায়, এবং এই আত্মার মর্মবাণী হল প্রেম। এই প্রেম চিরন্তন সংঘর্ষ ও সমাধানের পথে অবিরাম আত্মপ্রকাশ করে চলেছে।" ("Reality ...is spirit, the essence of which is love, gradually unfolding in an eternal play of conflicting forces and

their solutions"). জীব-জগতে এমন অসংখ্য ঘটনার সাক্ষ্য মেলে যার ফলে অহিংসার সর্বময় বিধানকে সমর্থন করা যায় না। সুভাষের মতে দর্শন বা নৈতিকতার দৃষ্টিতে হিংসা এবং অহিংসার মাঝখানে কোন সূক্ষ্ম সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। কোন্ কাজ হিংসা, কোন্ কাজ অহিংসা তা' বিচার করবার কোন চিরন্তন মাপকাঠি নেই। বিশ্বজীবনের বিধানে এমন অজস্র ঘটনা ঘটে যাদের ললাটে হিংসার অমর্যাদা এঁটে দিলে জীব-প্রগতির বিধানই কলঙ্কময় হয়ে পড়ে। সুভাষের মতে, তাই, হিংসা ও অহিংসার কল্যাণময়তার মূল্য নির্ণয় হবে,—কোন বিশিষ্ট পরিচয়ের আতিশয্যে নয়,—বিশ্বজীবনের ধর্ম ও বিকাশের দাবীতে। অহিংসাতেই প্রেমের একমাত্র সার্থক প্রকাশ,—সুভাষ গান্ধীজীর এই বিশ্বাস গ্রহণ করতে রাজী হননি। সুভাষ তাই ভারতের অভ্যন্তরে জাতীয় জীবনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে অহিংসাকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন বটে কিন্তু আদর্শ হিসাবে স্বীকার করতে পারেননি।

সমন্বয়ী সমাজ-দর্শন

ভারতের চিরন্তন মর্মবাণী গান্ধী-সুভাষকে আধ্যাত্মিক মূল্যের প্রেরণা দিয়েছে। সমাজ-দর্শনের মূল আদর্শও তাঁরা লাভ করেছেন ভারতীয় ইতিহাসের শিক্ষা থেকে। সমাজ-জীবন সংগঠনে ভারতীয় ইতিহাস শিক্ষা দিয়েছে এক সর্বময় সমন্বয়ের আদর্শ (synthesis)। ভারতের ইতিহাস যুগ থেকে যুগে আবর্তিত হয়েছে; কত নূতন জাতি, ভাব, ভাষা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা ভারতের জাতীয় জীবনে বারবার ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করেছে, কিন্তু ভারতের জাতীয় মনীষা এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যে বারবার নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব ও বৈচিত্র্যের মধ্যে এক অভিনব সমন্বয়ের সেতু রচনা করতে সক্ষম হয়েছে। গ্রহণ ও সমন্বয়ের পথে ভারতীয় ইতিহাসের ধারা আজো অব্যাহত রয়েছে এবং এ-ধারার মৌলিক বৈশিষ্ট্যও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ভারতের ইতিহাস

সমন্বয়ের যে আদর্শ গড়ে তুলেছে,— গান্ধীজী ও নেতাজী উভয়েই সে আদর্শকে তাঁদের সমাজ পুনর্গঠন পরিকল্পনার বনিয়াদরূপে গ্রহণ করেছেন। নেতাজী শুধু রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শকেই এই সমন্বয়ের আদর্শে গড়ে তোলেননি, তাঁর সমগ্র জীবন-দর্শনের মূলেও রয়েছে এই সমন্বয় বা সাম্যবাদের আবেদন। গান্ধী-সুভাষ উভয়েই মনে করেন যে বর্তমান মানব সংস্কৃতি ও সভ্যতায় বৈচিত্র্য ও বিরোধিতার সংঘাতে এক চরম সংকট ঘনিয়ে এসেছে। এই সংকট মানুষের জীবনে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে তার অপঘাতে মানুষের সমাজ-জীবনের মূল্য পরিকল্পনায় ঘটেছে গ্লানিময় বিকৃতি। গান্ধী-সুভাষ মনে করেন যে ভারতীয় ইতিহাসের শিক্ষা-থেকে-পাওয়া সমন্বয়ের আদর্শই বিশ্বের সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুনঃসংস্থাপন করতে পারে এবং মানুষের জীবনাদর্শকে অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

সমন্বয়ের প্রয়োগ

সমন্বয়ের মৌলিক আদর্শে গান্ধী-সুভাষের সমাজ পরিকল্পনায় ঐক্য রয়েছে কিন্তু তাঁদের সমন্বয়ী আদর্শের রূপায়ণ এক পথ বেয়ে চলেনি। অহিংসার প্রতি গান্ধীজীর একান্ত নির্ভরতা গান্ধী-সুভাষের যাত্রাপথে বারবার পার্থক্য ঘটিয়েছে। জীবনাদর্শের মৌলিক পরিকল্পনায় গান্ধী-সুভাষ অভিন্ন হলেও এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে তাঁদের ঐক্য রক্ষা হয়নি। অহিংসার প্রতি অখণ্ড ও সর্বময় গুরুত্ব আরোপ করে গান্ধীজী উপায় ও অন্তিমের (means and end) একটি সরল ও সহজ সম্বন্ধ খুঁজে পেয়েছেন। গান্ধীজীর মতে, "উপায়ের সন্ধানই যথেষ্ট—কারণ, আমার জীবনদর্শনে উপায় ও অন্তিমের সমান অর্থ। উপায় সম্বন্ধে সচেতন থাকলে অন্তিম নিজেই নিজের সম্বন্ধে সতর্ক হবে।" ("It is enough to know means. Means and ends are convertible terms in my philosophy of life... If one take care of means, the end will take care of

itself." গান্ধীজী তাই কর্মের পথ বা জীবনাদর্শ সাধনের উপায় সম্বন্ধে সদা সতর্ক। তিনি মনে করেন কর্ম-সাধনের উপায়রূপে অহিংসার পথ থেকে এক তিল বিচ্যুত হওয়ার অর্থ আদর্শের অন্তিম লক্ষ্যকে ক্ষুণ্ণ করা। উপায় ও অন্তিমের সম্বন্ধে এই সরল-রেখার পরিকল্পনা গান্ধীজীকে ঐকান্তিক শান্তিবাদের দিকে এগিয়ে দিয়েছে এবং হৃদয় পরিবর্তনের পথে ("way of conversion") আপসপন্থী করে তুলেছে। গান্ধীজীর রাজনৈতিক এবং আর্থিক জীবনের আদর্শে আপসরফা ও শান্তিবাদ তাঁর উপায় ও অন্তিমের অহিংস-কেন্দ্রিক পরিকল্পনার অনিবার্য পরিণতি। এই পরিণতির কথা অকপটে স্বীকার করতে গান্ধীজী বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করেননি।

গান্ধীজীর দৃষ্টি দিয়ে নেতাজী অহিংসার মূল্য-বিচার করেননি। তিনি তাই সমাজ-জীবনের পরিকল্পনায় এবং কর্মজীবনের সাধনায় উপায় ও অন্তিমকে গান্ধীজীর মত একটি সহজ ও সরল রেখার সেতু দিয়ে যোগ করতে পারেননি। নেতাজীর মতে উপায়ের মান নির্ণয়ের ভিত্তি নির্ভর করে উপযোগিতার গুরুত্বে। আদর্শের অন্তিম লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য সাধনের কাজে ঐতিহাসিক পরিবেশ স্থির করবে উপায়ের প্রকৃতি। নেতাজী মনে করেন যে প্রতি যুগের এবং সর্বদেশের জন্য উপায় ও অন্তিমের কোন চিরন্তন ও বাঁধাধরা রাজপথ তৈরী করা সম্ভব নয়। নেতাজীর মতে,—উপায় ও অন্তিমের সম্বন্ধ জটিল এবং এই জটিলতার প্রকৃতি-পরিচয় হয় আদর্শের অন্তিম লক্ষ্য ও সাময়িক পরিবেশ এবং ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে।

উপায় ও অন্তিমের সম্বন্ধ রচনায় গান্ধীজী ও নেতাজীর জীবনে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ঘটেছে তার পরিণতিরূপে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধী-সুভাষের মত ও পথে অনেকবার অনৈক্য দেখা দিয়েছে। পথ বা উপায়ের অসামঞ্জস্যের জন্যই গান্ধীজীর মধ্য-পন্থা ("Path of golden means") বা আপসবাদকে সুভাষ গ্রহণ করতে পারেননি। নেতাজীর কাছে সমন্বয়ের অর্থ সামঞ্জস্য বিধান

বা বোঝাপড়া নয়,—পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের সঙ্গে বোঝাপড়াতে সমন্বয়ের তাৎপর্য নিহিত নয়। মূল্য-অমূল্যের বিচিত্র ভিড় থেকে যথার্থ মূল্য বাছাই করে সেই মূল্যের সৃজনশীল পূর্ণসংহতি গঠনের অর্থই সমন্বয়। সমন্বয়ের এই দৃষ্টিকোণই নেতাজীকে আপসবিরোধী ও বিপ্লবপন্থী করেছে। কারণ, তিনি মনে করেছেন যে প্রয়োজনবোধে অস্ত্র প্রয়োগের নীতি গ্রহণ করা সমন্বয়-ধর্মের বিরোধী নয়।

মত ও পথের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্যই গান্ধীজীর চরখা বা খাদি অর্থনীতি তথা যন্ত্রশিল্প বর্জন ও কুটিরশিল্প গ্রহণ এবং ধন ও মজুরীর সম্বন্ধ নির্ণয়ে অছিবাদের (trusteeship) যৌক্তিকতা সম্পূর্ণরূপে নেতাজী স্বীকার করতে পারেন নাই। নেতাজী খাদি ও কুটিরশিল্পের অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন না, কিন্তু বিশ্ব সভ্যতার বর্তমান পরিবেশ এবং বিজ্ঞানের মূলে মানব-মনীষার যে চিরন্তন সৃজনশীলতার আবেদন রয়েছে তার গুরুত্বকে উপেক্ষা করতে পারেননি। তিনি তাই ভারতের সমাজ-জীবন পূর্ণসংগঠনে আধুনিকতা ও শিল্পায়ণের ("modernism and industrialisation") পক্ষপাতী। গান্ধীজী যন্ত্রশিল্পের বর্জনকামী,—কারণ যন্ত্রশিল্পের জঠরে হিংসা ও শোষণ এবং পুঁজিবাদী শ্রেণীর হাতে জনগণের ধন জমা হবার বীজ নিহিত রয়েছে। তাই গান্ধীজীর মতে যন্ত্রশিল্প অর্থাৎ মূলকে বর্জন না করলে মানব-সমাজকে হিংসা, শোষণ ও ধনতন্ত্রবাদের নিপীড়ন থেকে মুক্তি দেওয়া যাবে না। কিন্তু নেতাজী বলেন, যন্ত্রশিল্পজাত সামাজিক ও আর্থিক বিকৃতির জন্য শিল্প দায়ী নয়। শিল্পব্যবস্থায় যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, বিচারশীল বণ্টন এবং ন্যায়সংগত কর্তৃত্ব স্থাপন করা সম্ভব হলে শিল্পায়ণকে মানব-সভ্যতার কল্যাণের কাজে নিয়োগ করা সম্ভব। নেতাজী তাই কুটিরশিল্প ও যন্ত্রশিল্পের সমন্বয়ে ভারতের ভাবী অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তুলবার পক্ষপাতী। যে যন্ত্রে শোষণ ও পুঁজিবাদের সুযোগ নাই গান্ধীজী সেরূপ যন্ত্রশিল্পের সমর্থক। গান্ধীজীর ন্যায় নেতাজীও ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো গ্রাম পঞ্চায়েতের

ভিত্তিতে গড়ে তুলবার পক্ষপাতী। শিল্পে বিকেন্দ্রায়নের নীতি সম্বন্ধে নেতাজীর মত গান্ধীজীর স্থায় সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বে নিহিত না হলেও বাস্তব কার্যকারিতার দৃষ্টিভঙ্গীতে নেতাজীও বহুলাংশে শিল্পে বিকেন্দ্রায়নের পক্ষপাতী।

গান্ধী ও সুভাষ : ঐক্য ও অনৈক্য

ভারতের জাতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে একমাত্র নেতাজীই কি গান্ধীজীর অখণ্ড মত ও পথ গ্রহণে অক্ষমতা দেখিয়েছেন? বস্তুত কংগ্রেস নেতৃবর্গের অধিকাংশই গান্ধীজীর মত ও পথ একান্তরূপে গ্রহণ করতে পারেননি। গান্ধীজী মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তাই আক্ষেপ করে বলেছেন, "আজো কংগ্রেসের কাছে অহিংসা নীতি মাত্র,—আদর্শ নয়।" কংগ্রেসের নেতৃবর্গ গান্ধীজীর অতিমানবীয় মহত্ত্ব ও অপূর্ব নেতৃত্বের সামনে আনুগত্য জ্ঞাপন করেছেন, কিন্তু অনেকেই অকুণ্ঠচিত্তে গান্ধীবাদের জীবন-দর্শন গ্রহণ করতে পারেননি। নেহরুও অকপট চিত্তে নিজের আত্মজীবনীতে বলেছেন যে তাঁর হৃদয় গান্ধীজীর কাছে পরমাগ্রহে আত্মসমর্পণ করেছে কিন্তু মন গান্ধীবাদকে গ্রহণ করতে পারেনি। দীর্ঘদিন একান্তভাবে গান্ধীজীর অনুগমনের পরেও সর্দার প্যাটেল জানিয়েছেন যে তিনি নীতিসম্মত হিংসায় (" qualified voilence") বিশ্বাস করেন।

ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে এসেছে। কিন্তু গান্ধীজীর রাষ্ট্র, অর্থ ও সমাজ পরিকল্পনা গ্রহণে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের কাজে তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। অহিংসা-নীতি গ্রহণ ও রাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনী গঠনে হিংসানীতি বর্জন, রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতার পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে ব্যাপক শিল্পায়ণ পরিহার,—গান্ধীবাদের এই আদর্শগুলির একটি আদর্শও কংগ্রেস-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রে স্থান পায়নি। কার্যক্ষেত্রে কংগ্রেস কর্তৃক গান্ধীবাদী সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতিকে গ্রহণ না করার অর্থ কি?

শুধু সুভাষ নয়, কংগ্রেসের বহু নেতাই স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনায় গান্ধীজীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন কিন্তু সাগ্রহে গান্ধীজীর অখণ্ড জীবন-দর্শন মেনে নেননি। অন্যান্য নেতৃবর্গ নীরবে গান্ধীজীকে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু সুভাষ প্রয়োজনবোধে বহু সময়ে গান্ধীজীর মতবাদগুলি অখণ্ডভাবে গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

জীবন-দর্শনের কার্যকরী রূপায়ণে গান্ধী-সুভাষের মত ও পথে বহুবার পার্থক্য ঘটেছে কিন্তু জীবন-দর্শনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর গভীরতায় গান্ধী-সুভাষের জীবনে রয়েছে এক অবিচ্ছিন্ন ঐক্য। জীবনের আধ্যাত্মিক মূল্য এবং এই মূল্যের সমন্বয়ী রূপায়ণের আদর্শে ভারতের যে মর্মবাণী পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সে বাণীর গভীর স্পন্দনই গান্ধী-সুভাষের জীবনদর্শন-পরিকল্পনায় জ্বেলে দিয়েছে এক অনির্বাণ দৃষ্টি-দীপ। জীবনাদর্শের রূপায়ণে গান্ধী-সুভাষের যাত্রাপথে অনেকবার মতানৈক্য ঘটেছে কিন্তু এই মতানৈক্যের মূল্য সাময়িক। আগামী দিনের ইতিহাসে এই মতানৈক্য নয়, গান্ধী-সুভাষের জীবন-দর্শনের মৌলিক ঐক্য এবং কর্মজীবনের সাধনায় তাঁদের মানবতার দৃষ্টিভঙ্গীর কাহিনীই জ্যোতির্ময় স্বাক্ষর রেখে যাবে অনাগত যুগের অগণিত জনগণের সশ্রদ্ধ স্মরণে।

—মাসিক জয়শ্রী

অজানার অন্ধকারে

সত্যি কি তাইহোকোর সেই কথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর ভাস্বর জীবনের অবসান হয়েছে? এই প্রশ্নের তাথ্যিক উত্তর আজো মেলেনি। কিন্তু এই প্রশ্নটির যথার্থ সন্ধানে কী উপেক্ষা, কী অবহেলা ভারত সরকারের! ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম পর্যায়ের ইতিহাস যাঁর কীর্তি-গাথায় দীপ্তিমান, যাঁর বৈপ্লবিক প্রয়াসের অবদানে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ভারত-ত্যাগে বাধ্য হয়েছে তাঁর প্রতি জাতীয় অবহেলার এই নিদর্শন চিরদিনের এক জাতীয় কলঙ্কের সাক্ষী হয়ে থাকবে ভারতের রাষ্ট্র-জীবনের ইতিহাসে।

নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ সম্বন্ধে যে কত অসঙ্গতি রয়েছে, এখনও যে কত প্রশ্নের উত্তর মিলেনি— দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণকালে লেখক সে সম্বন্ধে যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে 'একটি অসম্পূর্ণ অনুসন্ধান' নামের প্রবন্ধে।

যে বিমানের দুর্ঘটনায় নেতাজীর জীবন-সূর্য অস্তমিত হয়েছে বলে কথিত সেই বিমানের এক সহযাত্রী লেফ্‌টেনেণ্ট আরাই বিমান দুর্ঘটনা সম্বন্ধে যে অসংলগ্ন বিবৃতি দিয়েছেন লেখকের কাঁছে, 'তাইহোকোর সেই বিমানে' প্রবন্ধটি তারই একটি তাথ্যিক বিবরণ। [সম্প্রতি ভারত সরকার নেতাজীর সম্বন্ধে নতুন তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন]।

একটি অসম্পূর্ণ অনুসন্ধান

রাত তখন প্রায় তিনটা। বিমান নামলো এসে ফরমোজার বন্দরে। শুনলাম, এটাই যুদ্ধকালীন তাইহোকো বিমান-বন্দর। চমকে উঠলাম নামটা শুনে। এটিই না সেই বিমান-বন্দর যেখানে নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় পড়েছিল ?

জ্যোৎস্না রাত। বিরাট বিমানবন্দরটি চারিদিকে প্রায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এই বন্দরে সত্যি বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল কি না, সত্যি এই দুর্ঘটনায় নেতাজীর দেহান্ত হয়েছে কি না,— আজো তা' স্পষ্ট হয়নি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যেখানে গিয়েছি সর্বত্র এই বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করেছি। রেঙ্গুণে জিজ্ঞেস করেছি ডাঃ বা মোকে। ডাঃ বা মো ছিলেন সেই সময়ে টোকিওতে। মালয়ে, সিঙ্গাপুরে, ব্যাঙ্ককে, সাইগনে—যেখানেই আজাদ হিন্দ্ নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে সেখানেই নেতাজীর সেই পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি। টোকিওতে সুযোগ হয়েছিল যুদ্ধকালীন কয়েকজন বিশিষ্ট জাপ নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার, বিশেষ করে, টোকিও এবং 'কি-ইয়ু' বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিকেল ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের অধ্যাপক লেফটেনাণ্ট কেইকিচি আরাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের। নেতাজীর সঙ্গে সেই একই বিধ্বস্ত বিমানে ছিলেন বলে তিনি দাবী করেন। ম্যানিলায় সন্ধান করেছি নেতাজীর ঘনিষ্ঠ

সহযোগী ফিলিপিনসের প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট ডঃ জোসেফ লরেলের কাছে।

মালয়ের রাজধানী কুয়ালালামপুরে দেখা হয়েছিল স্বামী সত্যানন্দের সঙ্গে। স্বামী সত্যানন্দ যুদ্ধের সময়ে ছিলেন সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী,—নেতাজীর নন-অফিসিয়েল সহযোগী-গোষ্ঠীর একজন অন্তরঙ্গ সহকর্মী। জাপানের আত্মসমর্পণ এবং নেতাজীর শেষ পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামী সত্যানন্দ আমাকে বলেন: ১৯৪৫ সালের ১৩ই আগস্ট জাপানের আত্ম-সমর্পণের সংবাদ নেতাজী শুনতে পান। ১৪ই আগস্ট পাকা অফিসিয়াল সংবাদ আসে আত্মসমর্পণের। নেতাজী স্বামীজীকে ডেকে পাঠান পেনাং থেকে। মেজর জেনারেল স্বামী রাঘবন ও অন্যান্য নেতাদেরও ডেকে পাঠান। স্বামীজী আলাদাভাবে কথা বলবার সুযোগ পান নেতাজীর সঙ্গে। জাপ-আত্মসমর্পণের পর আজাদ হিন্দ্ বাহিনী কি করবে, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত কর্তব্য নির্দেশ করেন নেতাজী। তারপরে আলোচনা হয় নেতাজীর নিজের করণীয় সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব আলোচিত হয়।

প্রথম প্রস্তাবে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে নেতাজী বলেন যে, তিনি আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সঙ্গে মালয়েই থাকবেন এবং শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করবেন ইংরেজের বিরুদ্ধে। সবাই হয়তো নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু আজাদ হিন্দ্-এর আত্মত্যাগের কাহিনী ভারতবর্ষকে আবার স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবে। কিন্তু নেতাজীর আত্ম-দানের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন সবাই। সবাই বলেন যে ভারতের অন্তিম স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নেতাজীর নিরাপত্তা একান্ত প্রয়োজন। তাই নেতাজীর প্রথম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়।

নেতাজীর দ্বিতীয় প্রস্তাবে সবাই সম্মত হন। স্থির হয় নেতাজী সাবমেরিণে ভারতে যাবেন। ভারতে গেলে নেতাজী সম্বন্ধে গান্ধীজী, শ্রীনেহরু, মৌলানা আজাদ, রাজাজী এঁদের কি মনোভাব

হবে, সে বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। কিন্তু সবাই এই মত প্রকাশ করেন যে নেতাজী একবার ভারতে গিয়ে পৌঁছতে পারলে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জাপানী সামরিক বিভাগ জানায় যে আত্মসমর্পণের পরে নেতাজীকে ভারতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কোন সাবমেরিণ দেওয়া এখন আর তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

টোকিওতে আশ্রয় নেওয়ার তৃতীয় প্রস্তাব নেতাজী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন যে, আত্মসমর্পণের ফলে জাপান হতাশ ও বিভ্রান্ত। এই অবস্থায় জাপানে আশ্রয় নেওয়ার প্রস্তাব করা অত্যন্ত মর্যাদাবিরোধী কাজ।

ইন্দোনেশিয়া বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন অঞ্চলে আত্মগোপন করার চতুর্থ প্রস্তাবও আলোচনাকালে অকার্যকর বলে পরিত্যক্ত হয়। কারণ, নেতাজীর পক্ষে এ-সব অঞ্চলে আত্মগোপন করা সম্ভব নয়।

সাবমেরিণে ভারতে যাওয়ার সুযোগ না পাওয়ায় ডাইরেন ও মুকডেন হয়ে সাইবেরিয়া যাওয়ার পরিকল্পনাই সবচেয়ে কার্যকর বলে গৃহীত হয়।

সাইবেরিয়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা সম্বন্ধে স্বামী সত্যানন্দ বলেন যে, ১৯৪৪ সালে সাইপ্রাস দ্বীপটির পতনের পরেই নেতাজী বুঝতে পারেন যে, জাপানের পরাজয় সময়সাপেক্ষ মাত্র। নেতাজীর স্বাধীনতা সংগ্রামের নীতি ছিল 'Resistance within India, armed struggle without and diplomacy in the international field।' এজন্যই তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি এবং ১৯৪৪ সাল থেকেই রাশিয়ার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেন। টোকিওস্থিত রুশ রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্র স্থাপনের সুযোগ দিতে জাপান রাজী হয়নি তবুও নেতাজী পরোক্ষভাবে বিপ্লবী বীরেন চ্যাটার্জির সঙ্গে

যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন এবং টোকিয়োর তদানীন্তন রুশ রাষ্ট্রদূত জ্যাকব মালিকের মাধ্যমে মস্কোতে একটি চিঠি পাঠাতেও সক্ষম হন। কিন্তু নেতাজী সম্বন্ধে রাশিয়া কি নীতি গ্রহণ করবে সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ নেতাজীর পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি, তবুও তিনি মাঞ্চুরিয়ার পথে সাইবেরিয়া যাওয়াই স্থির করেন।

নেতাজীর সঙ্গে এক প্লেনে যিনি ভ্রমণ করেছেন সেই লেঃ আরাইও একথা বলেছেন আমাকে এবং বিশেষ করে নেতাজীর এই পরিকল্পনার কথা স্বীকার করেছেন জেনারেল ইয়া কুরু। জেনারেল ইয়া কুরু ছিলেন জাপ সরকার ও আজাদ হিন্দ্ সরকারের মধ্যে উর্ধ্বতন সংযোগকর্তা। কিন্তু প্রশ্ন, সেই মুকডেনগামী বিমানের কি সত্যি দুর্ঘটনা ঘটলো তাইহোকো বন্দরে ?

টোকিও শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত রেংকোজী মন্দির থেকে সুরু করেছিলাম আমি সেই অনুসন্ধান। মন্দিরে রক্ষিত ভস্মাধারটি দর্শন করে জাপানী পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলাম: কে এবং কখন এই ভস্মাধার দিয়ে গেল আপনাকে ? তিনি বললেন: আত্মসমর্পণের মাস দুই পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা রিক্সা করে তিন-চার-জন ব্যক্তি এই ভস্মাধারটি দিয়ে যান আমাকে। তার মধ্যে এক-জনের নাম 'নারাইনা'। তিনি ভারতীয়। অপরজনের নাম 'হায়াশী'। মিঃ হায়াশী জাপানী।

নারায়ণ নামে একজন ভারতীয় কর্মচারী ছিলেন ভারতীয় দূতাবাসে কিন্তু এখন বদলী হয়েছেন অন্যত্র। মিঃ হায়াশীরও সন্ধান পাওয়া গেল। যুদ্ধের সময় আজাদ হিন্দ্ ও জাপ প্রতিনিধির মধ্যে দো-ভাষীর কাজ করতেন। কিন্তু মিঃ হায়াশী আমাকে জানান যে তিনি ভস্মাধার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। সে সময়ে তিনি ছিলেন জেলে। কিন্তু হায়াশী আমাকে নেতাজী সম্বন্ধে জানবার ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করলেন। তিনি সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন মিসেস এমোরীর সঙ্গে। মিসেস এমোরী জাপানের

এক সুপ্রসিদ্ধ শিল্পপতির স্ত্রী। নেতাজীর প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীলা এবং জাপান নেতাজী কমিটির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। মিসেস এমোরীর বিশ্বাস 'চন্দর বোস' বেঁচে নেই এবং তিনি জানালেন যে, জেনারেল কোয়াবে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে একটি বইও লিখেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জেনারেল কোয়াবে ছিলেন বার্মা সীমান্তের অধিনায়ক। তিনি আরও জানালেন যে, মিঃ কেইকিচি আরাই যিনি 'চন্দর বোসে'র সঙ্গে একই প্লেনে ছিলেন তিনিও মিসেস এমোরীকে বলেছেন যে, নেতাজী তাইহোকোর বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের সুযোগ এলো মিসেস এমোরীর গৃহে। জেনাবেল কোয়াবে, জেনারেল ইয়াকুরু, লেঃ আরাই, মিঃ হায়াশী এবং দো-ভাষী হিরোতা,—সবাই উপস্থিত ছিলেন। সবার সঙ্গে পরিচয় শেষ করেই জিজ্ঞেস করলাম জেনারেল কোয়াবেকে: নেতাজী সম্বন্ধে কি কোন অনুসন্ধান করেছেন আপনি? জেনারেল কোয়াবে একটু বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন: 'আমি তো কোন অনুসন্ধান করিনি। সে সময়ে আমি জেলে ছিলাম। জেলে বসে চন্দর বোস সম্বন্ধে আমার 'ইমপ্রেশন' এবং তাঁর কার্যাবলী সম্বন্ধে একটি বই লিখেছি আমি।' আমাকে নেতাজী সম্বন্ধে লেখা সেই বইটি দিলেন জেনারেল কোয়াবে।

এবার সুরু হলো লেঃ আরাইয়ের সঙ্গে কথা। লেঃ আরাই একটি বিবৃতি দেখালেন আমাকে। শা'নওয়াজ কমিটির কাছে তিনি এই বিবৃতিটি দিয়েছেন। লেঃ আরাই আরও বললেন যে, তিনিই তাইহোকো বিমান দুর্ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী।

লেঃ আরাইয়ের বিবৃতিটি এইরূপ: সাইগন থেকে প্লেন ছাড়ার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে দু'জন ব্যক্তি দৌড়োতে দৌড়োতে এসে উঠলো প্লেনে এবং তারই সামনের সীটে এসে বসলো। প্লেনে ওঠার পরে তিনি জানতে পেলেন যে যাত্রী দু'জনের একজন ভারতীয় নেতা

'চন্দর বোস' এবং অপরজন তাঁর সহযোগী হবিবুর রহমান। তাঁদের কথাবার্তা থেকে তিনি শুনতে পেলেন যে, চন্দর বোস ডাইরেনের পথে মাঞ্চুরিয়া যাবেন। চন্দর বোস হবিবুর রহমানকে আরও বলেন যে, 'এই যুদ্ধে মিত্র শক্তির জয় হলেও অবিলম্বে ভারতবর্ষ এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি যে স্বাধীনতা অর্জন করবে এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।'

বিবৃতির বাকী অংশে লেঃ আরাই বলেছেন : প্লেনটি যাওয়ার কথা ছিল টোকিওতে কিন্তু মুকডেন ঘুরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় বলে বিমানে খুব বেশী করে তেল ভরা হয়। তারই ফলে প্রোপেলার খুলে পড়ে যায় এবং বিমানে দুর্ঘটনা ঘটে। চন্দর বসুর জামা কাপড়ে আগুন লেগে যায় এবং তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁকে স্ট্রেচারে করে তাইহোকোর মিলিটারী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত্রি প্রায় নয়টার সময় একজন নার্স তাঁকে বলে যে, চন্দর বোস মারা গেছেন। সেই বিমান দুর্ঘটনায় লেঃ আরাইও আহত হয়েছিলেন এবং প্রায় এক মাস ছিলেন তাইহোকোর সামরিক হাসপাতালে।

তাইহোকোর বিমান দুর্ঘটনার সংবাদটি সম্বন্ধে এখনও অনেক প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অল্পকালের জন্য ভ্রমণের সময়ে এমন অনেক অবকাশ সন্ধানের সুযোগ হয়েছে আমার। কারা এবং কখন রেংকোজী মন্দিরে ভস্মাধারটি দিয়ে গেল, তার আগে ভস্মাধারটি কোথায় ছিল এবং কার কাছে ছিল—তার পারস্পরিক সূত্র সন্ধানের প্রয়াস আজও হয়নি। যে ক্যাডেটরা প্রথম ভস্মাধারটি পাহারা দেয় তাদের সন্ধান করাও অসম্ভব নয়। কোন্ কোন্ সিনিয়ার অফিসার তাইহোকোর বিমান দুর্ঘটনার পরে বেঁচে আছেন, বিমানযাত্রীর তালিকা সন্ধান করে তাঁদের খোঁজ করাও অসম্ভব নয়। কাইসো সিবু কাওয়া এবং জেঃ ওসীমার সন্ধান করাও সম্ভব। নেতাজীর সঙ্গে অনেক সোনা

ও রত্নপাথর ছিল। আরাই তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন যে, বিমান দুর্ঘটনার ফলে সেগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি টিনে করে সেগুলি সংগ্রহ করে রাখা হয়। নেতাজীর সেই সোনা ও রত্নপাথরগুলিই বা কোথায় গেল? যে হাসপাতালে আহত নেতাজীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে বলা হয় ফরমোজার সেই তাইহোকো অঞ্চলের হাসপাতালে সেদিনের ডাক্তার, নার্স ইত্যাদির অনুসন্ধান করাও অসম্ভব নয়। কিন্তু তদন্ত কমিটি এ সব কিছুই করেনি।

যে মহান্ বিপ্লবীর জীবনগাথা শুধু ভারতবর্ষের নয়, বিশ্বের মানুষের কাছে বীর্যবত্তা ও বৈপ্লবিক আদর্শের এক অমর কাহিনী হয়ে থাকবে তাঁর প্রতি উপেক্ষার জন্য ভাবীকালের ইতিহাস কি আমাদের ক্ষমা করবে?

—যুগান্তর

তাইহোকোর সেই বিমানে

পনরই অক্টোবর উনিশ'শ উনষাট সাল।

টোকিও শহর। সান্ধ্য ভোজনে নিমন্ত্রণ করেছিলেন মিসেস এমোরী। অন্যেরাও এসেছেন। জেনারেল কোয়াবে, জেনারেল ইয়াকুরু, লেফটেনান্ট আরাই, মিঃ হায়াশী এবং হিরোতা। জেনারেল কোয়াবে ছিলেন জাপ-অধিকৃত বার্মার অধিনায়ক এবং জেনারেল ইয়াকুরু হিকারী কিকানের অধিকর্তা। আজাদ হিন্দ্ ও জাপ সরকারের মধ্যে সংযোগ রক্ষার কাজ ছিল হিকারী কিকানের। হায়াশী ছিলেন তারই একজন হিন্দী দো-ভাষী।

মিসেস এমোরী নেতাজীর প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীলা। জাপান নেতাজী কমিটির তিনি সহ-সভানেত্রী। যুদ্ধের সময় যে পঁয়তাল্লিশ জন ভারতীয় ক্যাডেট্‌কে বিশেষ সামরিক শিক্ষা নেবার জন্য টোকিও পঠিয়েছিলেন নেতাজী, সেই ক্যাডেট্‌দের মিসেস এমোরীই মাতৃ-স্নেহে আশ্রয় দিয়েছিলেন যুদ্ধান্তে।

কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজন আমার মিঃ আরাইকে। মিঃ আরাইরের পুরো নাম লেফটেনান্ট কেইকিচি আরাই। বর্তমানে তিনি টোকিও এবং কি-ইয়ু বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিকেল ইঞ্জিনীয়ারিংএর অধ্যাপক। ইনিই নাকি তাইহোকো বিমান দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শক। সাইগন থেকে তিনিও নাকি ছিলেন নেতাজীর সেই বিমানের সহযাত্রী।

দোভাষী হিরোতার মাধ্যমে মিসেস এমোরী পরিচয় করিয়ে দিলেন। আর দেরী না করে সরাসরি প্রশ্ন করলাম লেফটেনেণ্ট আরাইকে : আপনিও ছিলেন নাকি সেই বিমানে ?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে লেঃ আরাই লেফাপার ভিতর থেকে একটি কাগজ বের করে আমার হাতে দিলেন। পৃষ্ঠা তুয়েকের ইংরেজীতে টাইপ করা একটি বিবৃতি। লেঃ আরাই বল্লেন, এই বিবৃতিটি তিনি শা'নওয়াজ কমিটির কাছেও দিয়েছিলেন। ইন্‌কোয়ারী কমিশন আরাইকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিল। সেই প্রশ্ন এবং উত্তরগুলোও লিপিবদ্ধ রয়েছে সেই বিবৃতিটিতে। ইন্‌কোয়ারীতে গৃহীত আরাইয়ের সাক্ষ্যের এটি একটি অনুলিপি।

নিজের অনুভূতিটিকে যতটুকু পারি সুতীক্ষ্ণ করে পড়তে শুরু করলাম বিবৃতিটি। অধ্যাপক আরাই অনেকটা যেন ভারিক্কী সুরে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ইংরেজীতে বলতে লাগলেন : আমার সাক্ষই সবচেয়ে দামী। আর কেউ বিমান তুর্ঘটনার কথা এমন প্রত্যক্ষ ভাবে বলতে পারবে না। আমি স্বচক্ষে দেখেছি কি ভাবে 'চন্দর বোসের' জামা-কাপড়ে আগুন লেগে গেল। জ্বলন্ত পোশাক যখন খুলে ফেলা হল কী সুপুরুষের বক্ষ দেখলাম চন্দর বোসের !

জাপানী মাত্রেই নেতাজীকে জানে চন্দর বোস নামে। আমি আরাইয়ের বিবৃতিটি সতর্কভাবে পড়ছি আর মাঝে মাঝে চোখ তুলে শুনছি আরাইয়ের কথা। আরাই আরো বললে : "চন্দর বোসের সঙ্গে ছিল অনেক দামী পাথর এবং অলংকার। বিমান তুর্ঘটনার পরে ছড়িয়ে পড়ে গেল সেগুলি। বন্দরের অফিসারেরা সেগুলি কুড়িয়ে নিলেন একটি টিনের মধ্যে।"

পড়া শেষ হলো বিবৃতিটি। সারমর্মরূপে বলা যায় যে লেঃ আরাই তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন : বিমানের প্রোপেলার ঘুরতে আরম্ভ করেছে। সাইগন বিমান-বন্দর থেকে বিমানটি উড়বে টোকিয়োর দিকে। দেখি, তু'জন কে ছুটে আসছেন বিমানের দিকে।

উঠলেন এসে তারা বিমানে। শুনলাম এঁরা দু'জন 'চন্দর বোস' ও তাঁর এ্যাডজুটেণ্ট কর্ণেল হবিবুর রহমান। চন্দর বোস আমার পেছনের সীটে পেট্রোল ট্যাংকের পাশে এসে বসলেন। হবিবুর তাঁর পেছনে।

বিবৃতিটিতে বিমানের আসন বণ্টনে একটি নক্শা আঁকা ছিল। আরাই আগ্রহভরে সেই নক্শাটি দেখালেন আমাকে। ওটাকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে বললাম আমিঃ আমার কাছে এ নক্শাটির খুব বেশী দাম নেই। কে কোথায় বসেছিল, দশ বার বছর পরে সে কথাটি মনে রাখার চেষ্টা করার কি মূল্য থাকতে পারে আমি জানি না। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন পরশু হংকং থেকে টোকিও আসবার পথে আপনার পাশে কে বসেছিল আমি বলতে পারব না।

লেঃ আরাইয়ের মুখ দেখে মনে হলো এমনি 'রিমার্ক' তিনি আশা করেননি।

লেঃ আরাইয়ের বিবৃতির বাকী অংশে আছেঃ চন্দর বোস বিমানে হবিবুর রহমানকে বলেন যে তিনি মুকডেনে যেতে চান। যুদ্ধের গতি ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়েও আলাপ হয়েছিল চন্দর বোস ও হবিবুর রহমানের মধ্যে। লেঃ আরাই চন্দর বোসকে বলতে শোনেন, "জাপান যুদ্ধে হেরে গেলেও এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনে অথবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলির আত্মোন্নতির সুযোগ সৃষ্টিতে এই যুদ্ধ বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। জাপানের পরাজয় সত্ত্বেও আমাদের পবিত্র জাতীয় সংগ্রামের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে না। আমি একথা ঘোষণা করতে চাই যে ফরাসী-ইন্দোচীন, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া এবং ভারতবর্ষ অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতা অর্জন করবেই। সেই পথ যে আজ সুনিশ্চিত হয়েছে এবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

বিমান দুর্ঘটনা ঘটলো কেন তার কারণ নির্ণয় করে নিজের এই

বিবৃতিতে লেঃ আরাই বলেছেন : বিমানটি যাওয়ার কথা ছিল টোকিওতে কিন্তু পরে স্থির হয় যে বিমানটি যাবে তৎকালীন মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী মুকডেনে। সেজন্যে তাইহোকো বিমানবন্দরে বেশি করে তেল ভরা হয় এবং অতিমাত্রায় তেল ভরার জন্যই তেলের ট্যাংকার ফেটে গিয়ে বিমানে দুর্ঘটনা ঘটে।

কেউ কোন সন্দেহ যেন না করে যে বিমান দুর্ঘটনার পিছনে কোন চক্রান্ত আছে। তা নিরসন করবার জন্য আরাই নিজের বিবৃতিতে আগেই বলে রেখেছেন যে বিমানে উচ্চপদস্থ যাত্রী ছিলেন বলে সুদক্ষ এক বিমান চালককে বিশেষভাবে নির্বাচন করা হয়েছিল।

আরাইয়ের বিবৃতিটিতে দুর্ঘটনার বিবরণ দেওয়া ছিল এই ভাবে : বিমান উড়লো তাইহোকো বন্দর থেকে। মাত্র অল্প কিছুটা উঠেছে,—এমনি সময়ে একটি বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। বিমানের প্রোপেলার খুলে গেলো। বিমান প্রচণ্ড বেগে গিয়ে থুবড়ে পড়ল মাটিতে। লেঃ আরাই ছিটকে পড়ে গেলেন বিমান থেকে। হাত মুখ পুড়ে গেল আরাইয়ের। আরাই দেখলেন চন্দর বোস বেরিয়ে আসছেন বিমান থেকে। তাঁর জামা কাপড়ে জ্বলন্ত আগুন। শুধু একবার দেখলেন আরাই চন্দর বোসকে। তারপরে আর জানেন না কিছু।

কেন? কারণ, আগুনের তাপে লেঃ আরাইয়ের চোখ ফুলে নাকি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে, হ্যাঁ, তিনি ওই এক মুহূর্তেই দেখে নিয়েছিলেন জেনারেল সিডাইয়ের মুখ চোখ পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল। তিনি আরও দেখলেন যে হবিবুর রহমানও জ্বলন্ত বিমান থেকে নেমে এলো।

বিবৃতির বাকী অংশটুকু এইরূপ : চন্দর বোস ও জেঃ সিদাইকে তাড়াতাড়ি স্ট্রেচারে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। রাত্রি প্রায় দশটার সময় একজন নার্স এসে লেঃ আরাইকে জানালো যে

চন্দর বোস মারা গেছেন। আরাই ও হবিবুর রহমান প্রায় তিন সপ্তাহ ছিলেন হাসপাতালে। এখান থেকে তাঁরা চন্দর বোসের জিনিসপত্র ও দেহাবশেষ নিয়ে উড়ে যান টোকিওতে।

বিবৃতিটি পড়ে একবার লেঃ আরাইয়ের মুখের দিকে তাকালাম। পোড়ার কোন চিহ্ন দেখলাম না। হয় তো এই কয় বছরে মিলে গেছে পোড়া দাগ। কিন্তু অমনি প্রশ্ন হলো মনে,—পোড়ার দাগ কি নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশে যায় কখনো?

বললাম লেঃ আরাইকে: আপনার বিবৃতির একটি অনুলিপি দেবেন আমাকে?

একটু যেন রুক্ষ মেজাজে উত্তর দিলেন আরাই: ভারত সরকারের মাধ্যমে লিখলে দিতে পারি। আরও জানালেন যে জাপ সরকারকেও তিনি এই বিবৃতির অনুলিপি দেননি।

বেশ বোঝা গেল যে এই বিবৃতি প্রসঙ্গে আরাইয়ের একটি বৈষয়িক বুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধি আছে।

বিবৃতিটা হাতে রেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে যতটুকু প্রয়োজন টুকতে টুকতে কয়েকটি প্রশ্ন করলাম লেঃ আরাইকে:

তেলের ট্যাংক ফাটার জন্য বিমানে বিস্ফোরণ ঘটলো কিন্তু তার জন্য প্রোপেলার খুলে পড়ল কেন?

প্রশ্নটির সরাসরি উত্তর না দিয়ে লেঃ আরাই বেশ দাম্ভিক কণ্ঠে আমাকে জানিয়ে দিলেন: আমি একজন মেকানিকেল ইঞ্জিনীয়ার।

হেসে বললাম: আমিও কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্র।

জিজ্ঞেস করলাম: হাসপাতালে নেওয়ার পরে আপনি কি আর দেখেছেন চন্দর বোসকে?

না। নার্স আমায় চন্দর বোসের সংবাদ জানায়। কথাটি বলেই লেঃ আরাই আমাকে জানিয়ে দেন যে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারী সবাইকার সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে ইনকোয়ারী কমিশনে।

বৃটিশ ও আমেরিকার পক্ষ থেকে এই বিমান দুর্ঘটনা সম্বন্ধে যে ইন্‌কোয়ারী করা হয়েছে লেঃ আরাই সে সম্পর্কে কোন সংবাদ জানেন কি না। তিনি বললেন যে এরূপ কোন সংবাদ তাঁর জানা নেই। আরও জানালেন যে তিন সপ্তাহ তাইহোকো হাসপাতালে যখন ছিলেন সে সময়ে বা তার পরে বৃটিশ বা আমেরিকান কর্তৃপক্ষ তাঁকে খোঁজ করে চন্দর বোসের বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করেননি।

এবার বিবৃতির গোড়ার দিকে গেলাম। বললাম: আপনি বলেছেন যে দু'জন লোককে আপনি ছুটতে ছুটতে আসতে দেখলেন সাইগন বিমান-বন্দরে। একথা থেকে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে চন্দর বোস যে এ-বিমানে যাবেন তা কর্তৃপক্ষের জানা ছিল না। তবুও আপনি বলেছেন যে বিমানে বিশেষ যাত্রী ছিল বলে এক্সপার্ট পাইলট নির্বাচিত করা হয়েছিল। এর সামঞ্জস্য কোথায়?

কথাটির উত্তর দিতে দেরী হচ্ছিল। জেঃ ইয়াকুরু আরাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে এসে জবাব দিলেন: জেঃ সিদাইও তো যাচ্ছিলেন এই বিমানে।

লেঃ আরাইকে আবার জিজ্ঞেস করলাম: আপনি চন্দর বোসকে নিশ্চয়ই আগে জানতেন না? তিনি কি খুব জোরে জোরে মুকডেনে যাওয়ার প্ল্যানের কথা বলেছিলেন হবিবুর রহমানকে যে আপনার কানেও এসে পৌঁছুল সেই গোপন কথাটি।

প্রশ্নটির উত্তর দিলেন না লেঃ আরাই। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল আমার প্রশ্নে উষ্ণ ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন। আমার প্রশ্নের মাঝে মাঝে ওঁরা জাপানীতে কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে। আমিও প্রশ্নোত্তরের মাঝে মাঝে যতটুকু প্রয়োজন টুকে নিচ্ছিলাম বিবৃতিটি। লেঃ আরাই যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কোথায় নাকি আরাইয়ের নেমন্তন্ন আছে। বিবৃতিটি বারবার ফেরত চাইতে লাগলেন। আমার ও আরাইয়ের মাঝখানে বসা ছিলেন দোভাষী

হিরোতা ও হায়াশী। দেখছি, সবাই যেন আমার আচরণে বিব্রত বোধ করছেন। মিসেস এমোরী ও হায়াশী অনুরোধ করে হিন্দীতে বললেন: সাব উনকা দোসরা জায়গা জানা হ্যায়। উনকা কাগজ ওয়াপস দে দিজিয়ে উনকো।

বিবৃতি থেকে টুকতে টুকতে মুখ না তুলেই হায়াশীকে হিন্দীতে উত্তর দিলাম: জরা ডিসকার্টেসী হোনে দো ভাই। মেরে লিয়ে ইয়ে বহুত জরুরী হ্যায়।

লেঃ আরাইয়ের অধৈর্য ভাব এবং তাঁর ফিরে যাওয়ার তাগিদ সত্ত্বেও অনুনয়ের কণ্ঠে বললাম: প্লীজ এ ফিউ মোর কোয়েশ্চেনস্। আচ্ছা, বিমানে কতজন যাত্রী ছিল অনুগ্রহ করে বলুন না।

চৌদ্দ কি পনের জন: বললেন আরাই।

এদের নাম নিশ্চয়ই রেকর্ড করা আছে? কারণ ওঠা ও নামার ছু' স্টেশনেই তো বিমানযাত্রীদের নামের তালিকা রাখা হয়?

সরোষে জবাব দিলেন আরাই: মিলিটারী প্লেনের যাত্রীদের নামের তালিকা রাখা হয় না।

উত্তরটা শুনে ফিরে তাকালাম জেঃ কোয়াবে ও জেঃ ইয়াকুরুর দিকে। উত্তরটির সমর্থন পেলাম না তাদের কাছ থেকে।

আবার প্রশ্ন করলাম আরাইকে: বিমান দুর্ঘটনায় কে কে মারা গেলেন?

তপ্তকণ্ঠে আরাই জানালেন: পাইলট, কো-পাইলট, রেডিও ইঞ্জিনীয়ার, জেঃ সিদাই এবং চন্দর বোস।

কথাটি শেষ না হতেই তুলে ধরলাম এই উত্তরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য পরের প্রশ্নটি: এ পাঁচজনেরই তো মুকডেনে যাবার জন্য প্রয়োজন ছিল,—তাই না? আচ্ছা আর যারা বেঁচে রইলেন তাদের কারো নাম-ঠিকানা নিশ্চয়ই আপনি জানেন?

এবার লেঃ আরাইয়ের উষ্ণতা প্রায় টগবগ করে ফুটে উঠবার উপক্রম হলো। সবাই অতিমাত্রায় বিব্রত হয়ে পড়লেন। আতিথ্য-

ধর্ম এবং শালীনতা দুটারই সীমা যেন বড় বেশি লঙ্ঘিত হয়ে যাচ্ছিল। ফেরত দিয়ে দিলাম বিবৃতিটি লেঃ আরাইকে। ধন্যবাদ দিলাম তাঁকে। বিবৃতিটি তার একবাক্যে বিশ্বাস করে নিইনি বলে বেশ বিরক্ত হয়েই বেরিয়ে গেলেন লেঃ আরাই।

কয়েক মিনিট সবাই চুপচাপ করে বসে রইলাম। এদের সবাইকার বিশ্বাস বিমান দুর্ঘটনাটি সত্যি ঘটেছে এবং নেতাজী সেই দুর্ঘটনায় যথার্থই দেহত্যাগ করেছেন। আমার প্রশ্ন ও অবিশ্বাসে এঁরা সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন, বেদনার্তও হয়ে উঠেছেন। এঁরা যথার্থই নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জেঃ ইয়াকুরুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলাম: এটা নিতান্তই একটা বড় বেশি আকস্মিক যোগাযোগ নয় কি যে, যে-পাঁচজনের মুকডেনে যাবার অনিবার্য প্রয়োজন ছিল একমাত্র তাঁরাই মারা গেলেন আর বাকী সবাই বেঁচে গেলেন এবং যারা বেঁচে রইলেন তাদের নামও এখন জানার উপায় নেই? পাইলট, কো-পাইলট, এবং রেডিও ইঞ্জিনীয়ার,—বিমান মুকডেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে তিনজনের অবশ্য প্রয়োজন এবং জেনারেল সিদাই,—যিনি মাঞ্চুরিয়ান এক্সপার্ট বলে পরিচিত ও মাঞ্চুরিয়ায় গতিবিধির জন্য যাঁর সাহচর্য নেতাজীর একান্ত প্রয়োজন,—সেই চারজন যাত্রীসহ নেতাজীর দেহান্ত ঘটল, কিন্তু বিমানের আর সবাই বেঁচে গেলেন এবং যে নয়-দশ জন যাত্রী বেঁচে গেলেন তাঁদের অধিকাংশেরই নাম রইল অজ্ঞাত,—বিমান দুর্ঘটনার এমনি বিবরণ কি অতি-সুসংবদ্ধ বলে মনে হয় না?

ঘটনার এমনি বিশ্লেষণের গুরুত্ব অস্বীকার করলেন না কেউ। তাই এই মুকডেনে যাওয়ার কাহিনীটিকে উড়িয়ে দেবার প্রয়াসে জেঃ ইয়াকুরু বললেন, 'মিঃ আরাই ছিলেন একজন লেফটন্যাণ্ট মাত্র বিমান কোথায় যাবে একথা তাঁর জানা সম্ভব ছিল না। বিমানটির গন্তব্যস্থল ছিল টোকিও,—মুকডেন নয়।

কিন্তু এটা জেঃ ইয়াকুরুর ধারণা মাত্র,—কোন পাকা তথ্য নয়।

মনটা ক্ষোভে ভরে উঠলো শা'নওয়াজ কমিশনের ইন্‌কোয়ারীর ধরন দেখে। লেঃ আরাইয়ের বিবৃতিতে কত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবকাশ ছিল, কিন্তু বিশেষ কোন প্রশ্নই তাঁকে করা হয়নি। অথচ শা'নওয়াজ কমিশনের অন্যতম মূল্যবান সাক্ষী হলেন এই লেঃ আরাই।

শা'নওয়াজ কমিশনের সাক্ষ্য গ্রহণের ও তথ্য সন্ধানের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে বললাম জেঃ কোয়াবে ও জেঃ ইয়াকুরুকে। তাঁরাও স্বীকার করলেন যে নেতাজী-রহস্য সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত, আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং ধারাবাহিক অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু একথাও বললেন তাঁরা যে পনের বছর পরে সব তথ্য ঠিকভাবে স্মরণ রাখা বা পাওয়া কি সম্ভব?

এঁদের বিশ্বাস নেতাজী সত্যিই বেঁচে নেই এবং বললেন: 'রেংকোজী মন্দিরে রক্ষিত ভস্মাধারটি ভারতে নিয়ে যাওয়া উচিত।'

উত্তরে জানালাম: তাইহোকোর বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর যে দেহান্ত হয়েছে তার সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত তো আজও হলো না। শা'নওয়াজ কমিশন যেভাবে ইন্‌কোয়ারী করেছে তা চূড়ান্ত নয়। তাই ও ভস্মাধার নেওয়ার প্রশ্নে তো গোড়াতেই অনেক সংশয় রয়েছে?

আচ্ছা জাপ সরকারের কি উচিত নয় যে নিজেই উদ্যোগী হয়ে নেতাজী সম্বন্ধে একটি ইন্‌কোয়ারী কমিশন গঠন করা এবং নেতাজী সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ও দলিল-পত্র জনসাধারণের পর্যালোচনার জন্য প্রকাশ করা? প্রশ্নটি করে উত্তরের জন্য সাগ্রহে তাকিয়ে রইলাম জেনারেলদের মুখের দিকে। তাঁরা সম্মতি জানালেন আমার বক্তব্যের সঙ্গে। কিন্তু স্মরণ করিয়ে দিলেন: এ-নিয়ে ভারতে যদি প্রবল

জনমত সৃষ্টি না হয় এবং ভারত সরকার যদি দাবী না করেন তবে জাপ সরকার এরূপ প্রচেষ্টায় স্বেচ্ছায় অগ্রণী হবেন না। তার অন্তত একটি কারণ এই যে ভারত সরকারের উদ্যোগেই শা'নওয়াজ কমিশন গঠিত হয়েছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জেঃ কোয়াবে বললেন: চন্দর বোসকে শ্রদ্ধা করতেন তোজো, সিগুমাৎসু ও জেঃ সুগিয়ামা। সিগুমাৎসু ছিলেন যুদ্ধকালীন পররাষ্ট্র সচিব এবং সুগিয়ামা চীফ-অব-দি-স্টাফ। আজ এঁদের কেউ বেঁচে নেই। বেঁচে আছেন কাইসো সিবু সাওয়া এবং জেঃ ওসীমা। এঁরাও চন্দর বোসের অনুরাগী। কিন্তু এঁরা সবকিছু থেকে দূরে সরে একান্তে জীবন যাপন করছেন। এঁদের কোন স্বাক্ষ্য শা'নওয়াজ কমিশন গ্রহণ করেনি, এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে কোন জিজ্ঞাসাবাদও করেনি।

জেঃ কোয়াবে ও জেঃ ইয়াকুরু তুজনেই বললেন এবং প্রগাঢ় আন্তরিকতার সঙ্গেই বললেন: চন্দর বোস যদি সত্যি বেঁচে থাকেন তবে আমরা সবচেয়ে খুশি হবো। কিন্তু বলতে পারেন তিনি যদি বেঁচে থাকেন তবে কেন আত্মপ্রকাশ করছেন না?

এমনি প্রশ্নের, যার একটি মাত্র উত্তর আছে তাই বললাম তাঁদেরকেও: যদি কোন রাষ্ট্র তাঁকে বন্দী করে রেখে থাকে?

কিন্তু তাঁর মত এত বড় ব্যক্তিকে এত বছর ধরে বন্দী করে রাখবে কোন রাষ্ট্র সে সংবাদের কোন সূত্র পাওয়া যাবে না? প্রশ্নের উত্তরে আবার প্রশ্ন করলেন তাঁরা।

কিন্তু কি উত্তর দেব এ প্রশ্নের! এ প্রশ্ন তো আমারও! একটি চাপা ঢেউ যেন গুমরে উঠলো বুকের মধ্যে। বেরিয়ে এলো শুধু একটি অব্যক্ত উত্তর,—একটি শীতল দীর্ঘশ্বাস!

—আনন্দবাজার

বিদেশী রাষ্ট্রনায়কের চোখে নেতাজ সুভাষচন্দ্র

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী ও আজাদ হিন্দের ঐতিহাসিক অবদানের গুরুত্ব ও নেতৃত্বের মূল্য আজও পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। শুধু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমসময়ের নেতৃবর্গই নয়,—আজও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয় নেতৃবর্গ নেতাজীর প্রতি কিরূপ গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল—এরূপ নেতৃবর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় সেকথা জানা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণকালে লেখক এসব দেশের বিভিন্ন জাতীয় নেতার কাছ থেকে নেতাজীর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব সম্বন্ধে অনেক অভিমত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'মহোত্তম দেশপ্রেমিক' প্রবন্ধটি নেতাজী সম্বন্ধে ডঃ লরেলের শ্রদ্ধাঞ্জলির একটি স্মারণিক।

ডঃ লরেল ছিলেন ফিলিপিনের শ্রেষ্ঠতম জাতীয় নেতা এবং নেতাজীর যুদ্ধকালীন সহযোগী। নেতাজী সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা যে কত প্রগাঢ় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণকালে এক সাক্ষাৎকারে ডঃ লরেল জানান সেকথা লেখককে। ডঃ লরেল যে চোখে দেখেছেন নেতাজীকে এবং নেতাজীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তিনি লেখককে তারই একটি আলেখ্য তুলে ধরা হয়েছে এই প্রবন্ধটিতে।

আলোচনার শেষে ডঃ লরেল নেতাজী সম্বন্ধে বলেন: Of all the great men I have ever met Chander Bose was the greatest. নেতাজীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একজন বিদেশী রাষ্ট্রনায়কের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে যে পরম শ্রদ্ধার বাণী দিল্লীর কণ্ঠে কি একবারও তার প্রতিধ্বনি শোনা যাবে?

মহত্তম দেশপ্রেমিক

ম্যানিলা হোটেলে ছিল আপনার চায়ের নেমন্তন? এই হোটেলটি যে আমাদের তীর্থস্থান! ম্যানিলা হোটেলের অডি-টোরিয়ামেই তো নেতাজী দিয়েছিলেন তাঁর ভাষণ।

ফিলিপিন প্রবাসী ভারতীয়দের সভার দিকে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন আমাকে সিন্ধী ব্যবসায়ী, শ্রীভাসোয়ানী,—ফিলিপিন ভারতীয় চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি।

সংবাদটি যেন তড়িৎস্পর্শের মত ঝাঁকি দিয়ে গেল আমাকে। নেতাজী যে ম্যানিলায়ও এসেছিলেন সেকথা আমার জানা ছিল না। শুধু জানতাম ফিলিপিনের প্রবীণ জননেতা ডঃ লরেল ছিলেন নেতাজীর যুদ্ধকালীন বন্ধু। যে হোটেলে কিছুক্ষণ আগেই ফিলিপিনের সিনেটর, আইনজীবী ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকী সভায় চীন-ভারত সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে এলাম, সেখানেই এসেছিলেন নেতাজী? ভাষণও দিয়েছিলেন এখানেই? যদি একটু আগে জানতাম, হয়ত তা'হলে নেতাজীর প্রসঙ্গ নিয়ে ফিলিপিন নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ হত।

মনোরম ম্যানিলা হোটেল। দিগন্তহীন সমুদ্রসৈকতে সুরম্য একটি অট্টালিকা। ম্যানিলার শ্রেষ্ঠ আবাসিকা। এখানেই নেতাজী এসেছিলেন এক জনসভায়। সেই সভার বিবরণ দিতে দিতে

শ্রীভাসোয়ানী বললেন : সে কী ভাষণ ! না, ঠিক ভাষণ নয়, যেন ম্যানিলা সাগরের দুর্দম গর্জন। তিন ঘণ্টারও বেশী বক্তৃতা করলেন নেতাজী। কেন তিনি ভারত থেকে পালিয়ে এলেন, কি তিনি চান, এই যুদ্ধের সুযোগে কিভাবে ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে, জাপানীদের সহায়তা নেওয়ার অর্থ কি,—সব তিনি একে একে নিখুঁত, নির্দিষ্ট, নির্ভীক ভাষায় বলে গেলেন। শেষে তিনি আহ্বান জানালেন ভারতীয়দের কাছে,—'ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য তাজা রক্ত চাই, প্রাণ চাই, চাই সর্বস্ব ত্যাগ।' ব্যবসায়ীদের তিনি বললেন অর্থ দিতে হবে। জানালেন, জাপানের কাছ থেকে তিনি 'সামরিক সাহায্য নেবেন খয়রাতি হিসাবে নয়, অর্থের বিনিময়ে, খরিদ করে। তাই ভারতবাসীদের দিতে হবে আজাদ হিন্দ্ সরকারকে আর্থিক সাহায্য।'

প্রবাসী ভারতীয়দের সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল চীন-তিব্বত সংঘাত এবং ভারতের সীমান্ত-সমস্যা। কিন্তু কিছুক্ষণ কথা বলার পরেই আলোচ্য প্রসঙ্গ যেন সবার অলক্ষ্যেই পালটে গেলো। নেতাজীর দলে এবং নেতাজীর সঙ্গে কাজ করবার সৌভাগ্য হয়েছে শুনে ভারতীয়েরা সুরু করলেন নেতাজীর কথা, বিশেষ করে সে দিনের সেই ভাষণের কথা।

শ্রীভাসোয়ানী বলে চল্লেন : জানেন তো আমরা হলাম ব্যবসায়ী। কয়েক বংশ ধরে আমরা ব্যবসা করছি এখানে। অর্থ উপার্জনের কথা ছাড়া স্বরাজ, স্বাধীনতা, রাজনীতি—এসব কথা কোন দিন আমাদের মনে তেমন করে স্থান পায়নি। কিন্তু সেদিন নেতাজীর যাদুস্পর্শে মন্ত্রমুগ্ধের মত যেন জেগে উঠলাম আমরা, মনে হলো কোন্ দেবদূত যেন এসেছেন আমাদের জাগিয়ে দিতে।

শ্রীভাসোয়ানীর কথা কেড়ে নিয়ে এক প্রৌঢ় ভারতীয় যেন আমার সন্দেহ নিরসনের জন্য সগর্বে বলতে শুরু করলেন : আমরা

ব্যবসায়ী বলে মনে করবেন না যে নেতাজীকে শুধু অর্থ দিয়েই আমরা ক্ষান্ত হয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে প্রায় শতকরা পঞ্চাশ জন নওজোয়ান এগিয়ে এসেছিল আজাদ হিন্দ্ বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য। নেতাজী চেয়েছিলেন নওজোয়ানের খুন। আমাদের ধমনীতেও যে দেয়ার মত খুন আছে সেদিন তার প্রথম সন্ধান পেলাম নেতাজীর আহ্বানে।

সবাই যেন প্রায় সমস্বরে বলে উঠলেন: মরণ-যজ্ঞের এমন আহ্বান কোন দিন শুনিনি আমরা। মরণও যে জীবনেরই আরেক নাম সেই নূতন জীবনের স্বাদ পেলাম আমরা নেতাজীর সংস্পর্শে। যেন নূতন জীবন-চেতনা এলো আমাদের মধ্যে!

ফিরব ভারতীয়দের সভা থেকে। কিন্তু নেতাজী প্রসঙ্গ শেষ হয়েও যেন শেষ হয় না। আলোচনান্তিক নীরবতা ভেদ করে সবাইকার কণ্ঠ যেন উদ্‌গত হয়ে ঝরে পড়লো শ্রীভাসোয়ানীর কণ্ঠে: আঃ! আজ যদি নেতাজী ভারতে থাকতেন! অ্যান ইন্‌স্পায়ার্ড ম্যান! এ প্যাট্রিয়ট অব দি প্যাট্রিয়ট!

বিকেলে যাব ডঃ লরেলের সঙ্গে দেখা করতে। আমার যেন আর সবুর সইছিল না। রেঙ্গুন থেকে ডঃ বা মো আমায় পরিচয়-পত্র দিয়েছিলেন ডঃ লরেলকে। যুদ্ধকালে ডঃ বা মো ছিলেন বর্মার প্রধানমন্ত্রী এবং ডঃ লরেল ছিলেন ফিলিপিনের প্রেসিডেণ্ট। দুজনেই ছিলেন জাপানের মিত্র ও সহযোগী। নেতাজী প্রসঙ্গ উঠলেই ডঃ বা মোর ভাবোচ্ছ্বাস যেন ফেটে পড়ে। নেতাজীর সহযোগী হয়ে কাজ করবার সুযোগ হয়েছে জেনে তিনি পরিচয়-পত্রে পত্রবাহকের পরিচয় দিয়েছিলেন অনেক বাড়িয়ে। তখন আপত্তি করিনি,—আশা ছিল পরিচর-পত্রের প্রভাবে হয়তো পত্রবাহকের সঙ্গে আন্তরিক আলাপ করবেন ডঃ লরেল।

গাড়ী চল্‌ছে আঁকাবাঁকা সুন্দর নাতিবন্ধুর পথ দিয়ে। সুপরিচ্ছন্ন

সমুদ্রসৈকতে ছবির মত সাজান শহর ম্যানিলা। ডঃ লরেল থাকেন শহরের উপকণ্ঠে একটি নিভৃত নিলয়ে। জীবনের প্রান্তসীমায় এসে শান্তি ও নীরবতাই এখন তাঁর কাম্য। যেতে যেতে ভাসোয়ানী জানালেন যে লরেল পরিবার ফিলিপিনের এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রেষ্ঠ পরিবার। তিনপুরুষ ধরে এঁরা ফিলিপিনের জাতীয় আশাআকাঙ্ক্ষার বাহকরূপে অগ্রণী হয়ে আছেন। যুদ্ধের পূর্বে ও যুদ্ধের সময় ডঃ লরেল ছিলেন ফিলিপিনের প্রেসিডেণ্ট। যুদ্ধের আগে রুজভেল্ট, চেম্বারলেন, চার্চিল প্রমুখ মিত্রগোষ্ঠীর নেতৃবর্গের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠতা এবং মিত্রগোষ্ঠীতে সম্মানীয় স্থান। কিন্তু জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য যুদ্ধাপরাধীরূপে তাঁর বিচার হয়। বিচার প্রসঙ্গে তিনি যখন দলিল দস্তাবেজ-সহ জানান যে ফিলিপিনের মার্কিন সেনানায়ক সবার আগে জাপানের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং তারই নির্দেশে তিনি জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা করেন তখন মার্কিন সেনানায়কের কেলেঙ্কারী চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ডঃ লরেলকে মুক্তি দেওয়া হয়। যুদ্ধের পরে ডঃ লরেল রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন, কিন্তু ফিলিপিনো জনতার কাছে তাঁর শ্রদ্ধার আসন কখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি।

অনেক রাস্তা ঘুরে শ্রীভাসোয়ানীর গাড়ী প্রবেশ করলো এসে তরুপুষ্প-আচ্ছাদিত সুপরিসর একটি প্রশান্ত কুটিরে। সুন্দর ও সুপরিচ্ছন্ন রুচিশীল একটি গৃহাঙ্গন। তেমনি গৃহের অনাড়ম্বর কক্ষটি। ডঃ লরেলের সেক্রেটারী নিয়ে গেলেন তাঁর বসবার ঘরে। ভারতবর্ষ থেকে এসেছি, 'চন্দর বোসের' অনুগামী এবং সঙ্গে নিয়ে এসেছি ডঃ বা মোর একটি ব্যক্তিগত পরিচয়-পত্র—সেকথা শুনে তিনি সাগ্রহ উষ্ণতায় টেনে নিলেন আমার হাতটি। করমর্দন করেও আবার করজোড়ে প্রণাম করে জানালাম : আমি এসেছি আপনার কাছে, নেতাজীর ফিলিপিনো সহযোগীকে আমার শ্রদ্ধা জানাতে এবং তাঁর মুখ থেকে নেতাজীর কথা শুনতে।

অতীতের স্মৃতি যেন আলো ঢেলে দিয়ে গেল বৃদ্ধ ডঃ লরেলের বিশীর্ণ স্নিগ্ধ মুখটিতে। তিনি যেন এক উদ্‌গত আবেগে সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন : 'চন্দর বোস! আই হ্যাভ নেভার নোন এ প্যাট্রিয়ট অব হিজ কাইণ্ড।'

নেতাজীর সঙ্গে পরিচয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলতে লাগলেন : চন্দর বোসের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় টোকিয়োতে—জাপ সরকারের উদ্যোগে আহূত এশিয়ান—কো-প্রোসপারিটি কন্‌ফারেন্সে। সেই সম্মেলনে তো আরও কত নেতাই এসেছিলেন,—ডঃ বা মো, ডঃ ওয়াং, ডঃ সুয়েকার্ণো, আরও অনেকে। বাট হি টাওয়ার্ড অ্যাবাভ অল! কী গম্ভীর, নিঃশঙ্ক, নিঃসংশয় তাঁর মুখের ছবি!

কো-প্রোসপারিটি কন্‌ফারেন্সের গঠন ও ভাষণের বিবরণ দিয়ে ডঃ লরেল বল্‌তে লাগলেন : যে-কয়টি দেশ জাপান দখল করে নিয়েছিল তাদের সবাইকার প্রতিনিধি ছিল সেই সম্মেলনে। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা জাপান তখনও স্বীকার করেনি। তাই ডঃ সুয়েকার্ণো উপস্থিত ছিলেন একজন পরিদর্শক রূপে। জাপ-অধিকৃত দেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকৃত হলেও জাপ সরকার কর্তৃক আহূত কো-প্রোসপারিটি কন্‌ফারেন্সের মাধ্যমে জাপ প্রভাবাধীন একটি সহযোগী রাষ্ট্রগোষ্ঠী গঠন করাই ছিল জাপানের প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ব এশিয়ার জাপ-অধিকৃত রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা যে জাপ অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল টোকিও সম্মেলনে উপস্থিত কোন প্রতিনিধিরই একথা অনধিগম্য ছিল না। জাপান কর্তৃক সংগঠিত কো-প্রোসপারিটি গোষ্ঠীতে যোগ না দেওয়ার প্রশ্ন তোলার মত সাহস বা অবকাশও ছিল না কারো পক্ষে।

একমাত্র চন্দর বোস ছিলেন এর ব্যতিরেক। কো-প্রোসপারিটি গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকেও চাপ দিয়েছিলেন তোজো সরকার। কিন্তু চন্দর বোস জানিয়ে দেন যে তাঁর গুরু মিঃ দাশও

একটি এশিয়াটিক ফেডারেশন গঠনের কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু এরূপ একটি সংগঠনে ভারতবর্ষ কি ভাবে অংশ গ্রহণ করবে সেই নীতি স্থির হবে ভারত স্বাধীন হবার পরে। তাই তিনি এই কন্‌ফারেন্সে যোগ দেন একজন ফ্র্যাটারন্যাল ডেলিগেটরূপে, সম্মেলনের অন্তর্ভুক্ত প্রতিনিধিরূপে নয়।

শুধু কি কো-প্রোসপারিটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করার দৃঢ়তাই দেখিয়েছেন চন্দর বোস? এই স্বগত প্রশ্নটি তুলে নিজেই টোকিও সম্মেলনে নেতাজীর ভাষণের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করলেন ডঃ লরেল: আরও তো বক্তৃতা করেছেন অনেকে কিন্তু চন্দর বোসের বক্তব্য ও ভাষণের সঙ্গে কোন ভাষণেরই তুলনা হয় না! তিনি বললেন একজন আদর্শবাদী বিপ্লবীর ন্যায়,—নির্ভীক, সুস্পষ্ট তাঁর বক্তব্য। কেন এই কো-প্রোসপারিটি সম্মেলন,—নিজের দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁর মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করে চন্দর বোস বললেন যে, স্বাধীন, মুক্ত ও শক্তিশালী এশিয়ান দেশগুলির সমবায়ে একটি নতুন এশিয়া গড়ে তোলাই হবে এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের অবসান ঘটানই হবে এই কো-প্রোসপারিটি গোষ্ঠীর আশু কর্তব্য। এই কো-প্রোসপারিটি গোষ্ঠীর ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে এশিয়ার স্বাধীন সার্বভৌম সমমর্যাদাসম্পন্ন সহযোগী রাষ্ট্রপুঞ্জরূপে।

নেতাজীর কথা বলতে বলতে বৃদ্ধ ডঃ লরেলের সারা মন যেন সেদিনের স্মৃতির তরঙ্গে ভাবোন্মুখ হয়ে উঠেছে। তিনি আবেগ-ভরে টোকিও সম্মেলনের কথা বলতে লাগলেন: হি ওয়াজ দি গ্রেটেস্ট ইন্‌ স্ট্যাচার! হিজ স্পীচ মেড গ্রেটেস্ট ইমপ্যাক্ট অন দি কন্‌ফারেন্স। চন্দর বোসের প্রভাবে অনেক প্রতিনিধিরই যেন আত্মসম্বিত ফিরে এলো, তারা যেন অনুভব করলেন যে সম্মেলনের প্রতিনিধিরা কেউ জাপানের তাঁবেদার নয়,—সমমর্যাদাসম্পন্ন এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌম মুখপাত্র।

নেতাজীর নির্ভীকতার আরও একটি পরিচয় দিয়ে ডঃ লরেল বললেন: টোকিওতে নেমে জাপ-সম্রাট্ হিরোহিতোর রাজ-প্রাসাদের দিকে মাথা অবনত করে নমস্কার জানান জাপানের এক রীতি। শুধু জাপানী প্রতিনিধিরাই নয়—সম্মেলনে আগত অন্যান্য প্রতিনিধিরাও জাপানীদের এই রাজ-প্রণামের রীতি অনুসরণ করতেন। কিন্তু চন্দর বোসকে আমি সম্রাট্-প্রাসাদের দিকে মাথা অবনত করতে দেখিনি কোনদিন।

নেতাজীর ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করতে করতে নিজেই প্রশ্ন তুলে তিনি আমাদের লক্ষ্য করে বললেন: জানো, চন্দর বোস কেমন নেতা ছিলেন? হি ওয়াজ অ্যাবসল্যুট্লি ফিয়ারলেস। নিজের জীবনের চেয়েও তাঁর কাছে বড় ছিল তাঁর দেশ, তাঁর আদর্শ। এমন অদ্ভুত প্যাট্রিয়ট আমি দেখিনি। দেশের জন্য কোন ত্যাগই তাঁর কাছে কঠিন ছিল না। নেতা কে? যিনি দেশের দুঃখ নিজের দুঃখ বলে অনুভব করেন তিনিই নেতা। তোমাদের চন্দর বোস ছিলেন তেমনি একজন নেতা। ধীর স্থির শান্ত অথচ আদর্শ ও নীতিতে কৃতসংকল্প। অন্যসব এশিয়ান নেতাদের চেয়ে তিনি ছিলেন পৃথক্। তিনি সব সময়েই সামরিক পোশাক পরতেন কিন্তু তাঁর মধ্যে কোন লোক-দেখানো দম্ভ ছিল না।

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছি আমরা ডঃ লরেলের কথা। টেবিলের পাশে চা দিয়ে গেছে বেয়ারা কিন্তু খেয়াল নেই কারোর। আমরা দু'জন ভারতীয় ডঃ লরেলের কথা শুনছি না যেন অমৃতপান করছি। আমাদের নেতা,—একান্ত আমাদের একজন আত্মীয়, এমন করে গভীর রেখাপাত করেছেন একজন প্রবীণ অভিজ্ঞ সম্মানীয় বিদেশী রাজনীতিজ্ঞের উপরে। বারবার মনে হতে লাগল যদি ডাঃ লরেলের সঙ্গে দেখা না হত নেতাজীর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য-সন্ধানে যেন একটি মস্ত অপূর্ণতা থেকে যেত। নেতাজী প্রসঙ্গে ডঃ লরেল আরো জানালেন: জাপানীদের যুদ্ধের অভিপ্রায় সম্বন্ধে চন্দর বোস সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ

ছিলেন না। টোকিয়োতে চন্দর বোসের সঙ্গে বেশ কিছুদিন একত্র ছিলাম আমি। তখন জাপানের অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তিনি জাপানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সব সময়ে ছিলেন সজাগ ও সতর্ক। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ভারত ও এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির মুক্তিসাধন।

জাপানী রাজনীতিকদের উপরে নেতাজীর কিরূপ প্রভাব ছিল তার উল্লেখ করে ডঃ লরেল বললেন : এমনি প্রবল স্বাধীন ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও তোজো ও অন্যান্য জাপ নেতাদের কাছে চন্দর বোস বিশেষ ভাবে সম্মানীয় ছিলেন। কেন জাপানী নেতারা চন্দর বোসকে এরূপ শ্রদ্ধা করতেন তার কারণ জানো? তারা জানতো যে চন্দর বোস একজন নির্ভীক প্যাট্রিয়ট, একজন আদর্শপ্রাণ রেভল্যুশনারী। টোকিয়োর জাপ নেতাদের নীতি যাই থাক না কেন কোন কোন দেশে জাপ জেনারেলরা নির্মম অত্যাচার করতে দ্বিধা বোধ করেনি। এক সময় ফিলিপিন্সে এমন জুলুম সুরু করে দেয় জাপ সেনারা—গুলি, ফাঁসি, কথায় কথায় বাড়ি চড়াও—এতো বাড়াবাড়ি সুরু হয় সেদিনে ফিলিপিন্সে যে, চন্দর বোসের মাধ্যমে টোকিও-নেতাদের কর্ণগোচর করে তবে আমার পক্ষে জাপ সৈন্যদের হাত থেকে ফিলিপিনোদের রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল।

যে বেদনার্ত প্রশ্নটি ভারতবাসীর মনে আজও উঁকি-ঝুঁকি দেয় ভাসোয়ানীজী সে প্রশ্নটিই এক উৎসুক প্রত্যাশায় তুলে ধরলেন ডঃ লরেলের কাছে: আপনার কি মনে হয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস এখনো বেঁচে আছেন?

আলোচনায় একটু ছেদ পড়লো। ডঃ লরেলের চোখ দুটিতে ভেসে উঠলো একটি বিষণ্ণতার ছায়া। একটু নীরব থেকে তিনি ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন: আমার মনে হয় না তিনি বেঁচে আছেন। জাপানের আত্মসমর্পণের পরে আমি কিছুকাল টোকিও জেলে বন্দী

ছিলাম। সেখানে জাপানীরা আমাকে বলে যে শত্রুপক্ষের ফাইটার চন্দর বসুর বিমান আক্রমণ করে এবং তার ফলে প্লেন-ক্র্যাশে তিনি মারা যান। সংবাদটির গুরুত্ব কতখানি তা আমি জানি না। কিন্তু এজন্য আমার মনে হয় যে চন্দর বোস বেঁচে নেই,—কারণ, তাঁর মত একজন রেভল্যুশনারী প্যাট্রিয়টের পক্ষে এতকাল আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব নয়।

নেতাজীর বিমান গুলিবিদ্ধ হওয়ার সংবাদ শুনে চমকে উঠলাম। এ-সংবাদ তো আগে শুনিনি? ডঃ লরেল উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং তাঁকে এ-সংবাদটি দিয়েছেন উচ্চপদস্থ জাপ কর্মচারী। কিন্তু এরূপ সংবাদের অর্থ কি? সংবাদপত্রে একরকম বিবরণ এবং মুখে আরেকরকম প্রচার? নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনার যে উল্টা-পাল্টা অসামঞ্জস্যকর সংবাদ শুনেছি টোকিয়োতে, ডঃ লরেলের সংবাদে সে বিভ্রান্তির মাত্রা আরও বেড়ে গেল।

ডঃ লরেল কথার মাঝখানে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, চলো আমার স্টাডী দেখাব। সেখানে অনেক কাগজপত্র আছে, চন্দর বোসের গ্রুপ ফটোও আছে।

ডঃ লরেলের সেক্রেটারী আগে আগে গিয়ে তাঁর পড়ার ঘরটি খুলে দিলেন। ঘরটি একটু দূরে, একটি বাগান পার হয়ে যেতে হয় পশ্চিম কোণে। যেতে যেতে ডঃ লরেল বললেন: ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে কিভাবে দেশ গঠন করা হবে তারই আভাষ দেন চন্দর বোস। তিনি বলেন, গোড়াতে ভারতবর্ষে গতানুগতিক রাজনীতি চলবে না। প্রথম কুড়ি বছর 'অথরিটারিয়ান'ভাবে দেশকে চালিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি ভারতবর্ষের নেতাদের মধ্যে গান্ধীকে খুব উচ্চ স্থান দিতেন। কিন্তু নেহরু সম্বন্ধে খুব ক্রিটিক্যাল ছিলেন চন্দর বোস।

কথা বলতে বলতে ঢুকলাম এসে ডঃ লরেলের স্টাডীতে। ঘরে ঢুকেই আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন একটি লম্বা গ্রুপ ফটো।

এতে আছে তোজো এবং জাপ প্রধান সেনাপতি সহ ইস্ট এশিয়ান কো-প্রোসপারিটি কন্‌ফারেন্সে সমাগত এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নেতৃবর্গের ফটো। নেতাজীর ফটো রয়েছে সামরিক বেশে। ডঃ লরেল বললেন, চন্দর বোস সহ আরও গ্রুপ ফটো আছে। কিন্তু সব রয়েছে দলিল-পত্রের মধ্যে। ডঃ লরেলের পড়ার ঘরে অনেক বই। অনেক দলিল-পত্র।

তিনি বললেন ঃ তিনি নিজের 'মেময়ের' লিখবেন এবং তাতে থাকবে চন্দর বোসের বিশেষ স্থান।

এবার ফিরবো। উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম ডঃ লরেলকে।

না না, চলো! তোমাদের এগিয়ে দিয়ে আসি। সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ লরেল এগিয়ে এলেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। সুপরিচ্ছন্ন ডঃ লরেলের বহির্বাটিটি, পুষ্পপত্রে মনোরম একটি সুন্দর গৃহপ্রাঙ্গণ। ফিলিপিনের জাতীয় আন্দোলনের একটি পীঠস্থান।

গাড়ীতে উঠবো। বিদায় নমস্কার জানাবার জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে দাঁড়ালাম ডঃ লরেলের সামনে। মোটরের গায়ে হাতটি রাখলেন ডঃ লরেল। মৌন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণের জন্য দূরদিগন্তে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন। যেন কোন পূর্বস্মৃতির ভাণ্ডার খুলে দেখছেন তিনি। কিছুক্ষণ কাটলো এমনিভাবে। তারপরে একটি অনুপম স্বগত উক্তি তাঁর আবেগ-উষ্ণ কণ্ঠ থেকে উদ্‌গত হলো ঃ অব অল দি গ্রেট মেন আই হ্যাভ এভার মেট চন্দর বোস ওয়াজ দি গ্রেটেস্ট,—যত বড় বড় মানুষের সঙ্গে এযাবৎ আমার সাক্ষাৎ হয়েছে চন্দর বোস ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম!

বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় বিহ্বল হয়ে গেলাম ডঃ লরেলের এই উক্তি শুনে। শ্রেষ্ঠতম মানবত্বের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি কে দিচ্ছেন আমাদের নেতাজীকে?—একজন বিদেশী! প্রবীণ, অভিজ্ঞ, একজন পূর্বতন রাষ্ট্রপতি—যিনি অনেকবার যোগ দিয়েছেন জেনিভার লীগ অব

নেশন্সের বৈঠকে। রুজভেল্ট, চার্চিলের সঙ্গে ছিল যাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। যুদ্ধপূর্ব মিত্রশক্তির যিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়ক। তিনি দিচ্ছেন নেতাজীকে শ্রেষ্ঠ মানবত্বের এই সুমহান্ আসন! আপনজন যে কত মহান্ হতে পারে অন্যের চোখ দিয়ে না দেখলে বুঝি তার অমূল্য পরিচয় জানা যায় না!

নত হয়ে সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম করলাম ডঃ লরেলকে। ধীরে ধীরে চলতে লাগলো গাড়ী। সামনেই ম্যানিলার উন্মুক্ত রাস্তা।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত তিব্বত ও অ্যাফ্রো-এশিয়ান উপনিবেশ-বিরোধী সম্মেলনের প্রতিনিধি হতে রাজী হয়েছিলেন ডঃ লরেল। বলেছিলেন তিনি: চন্দর বোসের দেশে যাওয়ার আগ্রহ আছে আমার অনেকদিন থেকে। কিন্তু স্বাস্থ্যে যদি কুলোয়।

দুর্ভাগ্য আমাদের,—স্বাস্থ্যে তাঁর কুলোয়নি। ভারতে আসার আগেই ডঃ লরেল এজগৎ ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর আত্মস্মৃতিও আর লেখা হয়নি। নেতাজীর অনেক অজানা কাহিনীও আমাদের হয়তো আর জানা হবে না।

—আনন্দবাজার

শুধু ভারতের নয়—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামেও নেতাজীর অবদান কত গুরুত্বপূর্ণ আজও তার তাত্ত্বিক অনুসন্ধান হয়নি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে একে একে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতারা পরলোকের অন্ধকারে চলে যাচ্ছেন। ভারতের দুর্ভাগ্য যে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গের সংকীর্ণতার জন্য নেতাজীর অবদান এবং নেতাজীর সংগ্রামী ঐতিহ্যের তথ্যাবলী উদ্ধার করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়নি।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্বাধীনতা নেতাজীর কাছে কতখানি ঋণী সেই তথ্যটি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র নায়কদের চোখে নেতাজী-নামক প্রবন্ধটিতে।

আজ ভারতীয় রাজনীতির পালা বদল হচ্ছে। দীর্ঘ দুই যুগের অবহেলা ও উপেক্ষার পরে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় স্তরে নেতাজীর অবদান স্বীকৃতি লাভ করতে সুরু করেছে। রাজনৈতিক নেতারা সংকীর্ণ স্বার্থে নেতাজীকে বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন করে দেবার অপচেষ্টা করলেও ভারতীয় জনতার অন্তর্পট থেকে ভারত-পথিকের মহান স্মৃতি মুছে দেওয়া সম্ভব হয়নি। আজ তাই দীর্ঘদিন পরে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হচ্ছেন ভারত সরকার। সেই তথ্যই পরিবেশিত হয়েছে শেষ প্রবন্ধ দুটিতে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রনায়কদের চোখে নেতাজী

একথা আজো আমাদের জাতীয় জীবনে এক চরম আক্ষেপ ও ক্ষোভের বিষয় হয়ে রয়েছে যে, আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর অবদান ও বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের গুরুত্ব ও মর্যাদা এখনও যথাযোগ্যভাবে স্বীকার করে নেয়নি। অথচ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রকর্তৃত্ব কর্তৃক উপেক্ষিত এই মহান নেতার প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নেতৃবর্গ যে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন তা' অপূর্ব।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় সব কয়টি দেশ ঘুরে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম সিঙ্গাপুরের বিস্তীর্ণ সমুদ্র সৈকতের সেই স্থানটিতে, যেখানে নেতাজী স্থাপন করেছিলেন আজাদ হিন্দ্ শহীদ স্তম্ভ। সিঙ্গাপুর পুনর্দখল করেই মাউন্টব্যাটেন এই শহীদ-সৌধটি গোলাবর্ষণ করে উড়িয়ে দেন। অনেক বছর পরে সিঙ্গাপুরের ভারতীয়েরা এই প্রথম সমবেত হয়েছিল নিশ্চিহ্ন শহীদ-স্তম্ভের পবিত্র স্থানটির পাশে আজাদ-হিন্দ শহীদ স্মরণে মাল্য-পুষ্প অর্পণের উদ্দেশ্যে।

শ্রদ্ধাঞ্জলির অনুষ্ঠান স্বুরু হবে,—ঠিক তার আগ মুহূর্তে সিঙ্গাপুরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লী কোয়ানের সেক্রেটারী সতর্ক করে দিয়ে গেলেন অতিথিকে: "বাইরের কেউ এসে সিঙ্গাপুরে রাজনীতি করে এটা সিঙ্গাপুর সরকার অভিপ্রেত বলে মনে করে না।"

এই হুমকির উত্তরে সেদিন ভারতীয় আগন্তুকের কণ্ঠ থেকে সিঙ্গাপুর সরকারের সেক্রেটারী শুনে গিয়েছিলেনঃ "সিঙ্গাপুর শুধু ভারতীয়দের নয়,—সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক পরম তীর্থভূমি। এই তীর্থভূমিতে সমগ্র এশিয়ার মুক্তি-সংগ্রামের পবিত্র স্মারণিকরূপে নেতাজী স্থাপন করেছিলেন শহীদ-স্তম্ভটি।" আশঙ্কা হয়েছিল সবার যে সদ্য-আগত অতিথির গ্রেপ্তার অনিবার্য কিন্তু পরের দিন বরং শহীদ-স্মরণের এই উৎসবের একটি বিশেষ ফটোর সঙ্গে সঙ্গে 'সিঙ্গাপুর স্ট্রেইট টাইমস' কাগজে বড় বড় হরফে ঠিক সেই কথাগুলিই প্রকাশিত হয়েছিল যা' বলা হয়েছিল মিঃ লী কোয়ানের সেক্রেটারীকে।

রেঙ্গুনে এসে প্রথমেই সাক্ষাৎ হয়েছিল বার্মার যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বা মোর সঙ্গে। ডাঃ বা মো স্বতঃই উচ্ছ্বাসপ্রবণ ব্যক্তি কিন্তু নেতাজীর প্রসঙ্গ উত্থাপনে তিনি যেন আবেগে একেবারে ফেটে পড়লেন। নেতাজী প্রসঙ্গে অনেক কথার মধ্যে তিনি বললেন সেদিনের কথা যেদিনে বার্মা সীমান্ত অতিক্রম করে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ মণিপুরে প্রবেশ করেছেঃ "মিঃ বোস অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছেন ইম্ফল পতনের সংবাদের জন্য। তিনি নিজের হেড কোয়ার্টার সরিয়ে নিয়ে গেছেন সীমান্তের প্রায় কাছে। ইম্ফল দখলের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বাধীন ভারত সরকারের প্রথম সামরিক রাজধানী স্থাপন করবেন ইম্ফলে,— এই ছিল তাঁর আশা। ইম্ফলকে ঘাঁটি করে তিনি সুরু করবেন দিল্লী দখলের লড়াই। সেদিনে বোস যেন এক অগ্নিপুরুষে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। এমন দীপ্তি, এমন নির্ভীকতা, এমন বৈপ্লবিক বিশ্বাস আমি জীবনে কখনও আর দেখিনি। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মণিপুরে প্রবেশের পরে তিনি যে বেতার ভাষণ দিয়েছিলেন তার প্রতিটি কথা ছিল যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ-লহরীর মত। আমিও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে সে সময়ে একটি বেতার ভাষণ দিয়েছিলাম। জীবনে এরূপ আর কোন আদর্শবাদী দুর্জয় বিপ্লবীর সান্নিধ্যে আসিনি।"

জাপানের পরাজয় যখন আসন্ন, সেই কঠিন সময়ের কথা স্মরণ করে ডাঃ বা মো আরও বললেনঃ "সেই মর্মান্তিক সময়েও মিঃ বোসের মধ্যে কোন নৈরাশ্য বা চাঞ্চল্য দেখিনি। যখন চারদিকে সব ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছে তখনও তিনি নিখুঁতভাবে তাঁর কর্তব্য করে যাচ্ছিলেন,—তখনও তাঁর মুখ-চোখে ছিল ভারতীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে এক নিঃসংশয় প্রত্যয়। পরাজয়ের মুখেও এমন স্থির-চিত্ত পুরুষ কদাচ দেখা যায়।"

ডাঃ বা মো অতিথিকে বলেছিলে যে, তিনি নিজের আত্মজীবনী লিখবেন এবং তার মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিঃ বোসের স্থান হবে বিশেষ শ্রদ্ধা ও গৌরবের। তাইহোকোর প্লেন দুর্ঘটনা সম্বন্ধে এক প্রশ্নের উত্তরে সহাস্যে তিনি বললেনঃ "আমিও তো প্লেন ক্র্যাশে মারা গিয়েছিলাম জাপানের আত্মসমর্পণের ঠিক পরেই।"

নেতাজী সম্বন্ধে রেঙ্গুণে আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়,—বিশেষ করে বার্মার স্বর্গত বিপ্লবী নেতা আউন সানের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ বার্মার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উ-বা-স্বয়ের সঙ্গে। এই বলিষ্ঠ সুপুরুষ ব্যক্তিটি অপকটে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন নেতাজীর প্রতি।

উ-বা-স্বয়ের কাছে একথাও শুনলাম যে নেতাজীর প্রতি জেনারেল আউন সানের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আস্থা এত গভীর ছিল যে, যুদ্ধের শেষে বার্মায় জাতীয়তাবাদী মহলে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তার মীমাংসা করার জন্য জেনারেল আউন সান 'সুভাষ বোসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে' শরৎবাবুর সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন।

থাইল্যাণ্ডের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী বিপুন সংগ্রাম দেশত্যাগী বলে তাঁর কাছ থেকে নেতাজীর কথা শোনার সুযোগ হয়নি। কিন্তু থাইল্যাণ্ডের আরেকজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নাই খোয়াব অভয়-ওয়েঙের কাছে শুনেছি যে, ব্যাঙ্ককে স্বামী সত্যানন্দপুরীর নেতৃত্বে আগেই "ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ" গঠিত হয়েছিল।

নাই খোয়াব বলেনঃ থাই রাজনীতিকদের কাছে সুভাষ বোস

ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নির্ভীক বিপ্লবী এবং এশিয়ার গৌরব। থাইবাসীরা কোন সময়েই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইঙ্গ-ফরাসীর প্রভাব সুনজরে দেখেনি। তাই সুভাষ বোসের মুক্তি-সংগ্রামকে থাই-বাসীরা এশিয়ার মুক্তি-সংগ্রাম বলেই মনে করতো।"

নমফেন, সাইগন ইত্যাদি স্থানে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ ও আজাদ হিন্দ্ দলের শাখা স্থাপিত হয়েছিল। এই সব কয়টি স্থানেই নেতাজী সফরে গিয়েছেন এবং সাইগনে গিয়েছেন বহুবার। নমফেনে ও সাইগনে শুনেছি যে, নেতাজী ও আজাদ হিন্দের সংগ্রামী তৎপরতা এই অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। উত্তর ভিয়েৎনামের হো চি মিন,—যিনি তখন ভিয়েৎনামের কম্যুনিস্ট নেতারূপে নয়, প্রধানত জাতীয়তাবাদী নেতারূপে পরিচিত ছিলেন,—তিনিও নেতাজীর প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন—কয়েকজন ভিয়েৎনামী সোস্যালিস্টদের কাছে শুনেছি সাইগনে এই কথা।

জাপান নেতাজী কমিটির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মিসেস এমোরীর গৃহে সান্ধ্য-ভোজনের আমন্ত্রণ উপলক্ষে জেনারেল কোয়াবে, জেনারেল ইয়াকুরু এবং আরও কয়েকজন প্রাক্তন জাপ আর্মির বিশেষ উচ্চপদস্থ সামরিক নেতার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল। নেতাজী তাইহোকোর বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি,—এরূপ বিশ্বাসের তাঁরা সমর্থন করেননি বটে, কিন্তু প্রায় একবাক্যে সেদিন সবাই বলে ওঠেন "চন্দর বোস যদি বেঁচে থাকেন সবচেয়ে গভীরভাবে সুখী হবো আমরা,—কারণ, জাপানের পক্ষে চন্দর বোসের মত একজন বন্ধুর আজ বিশেষ প্রয়োজন।"

তাইহোকোর বিমান দুর্ঘটনা সংক্রান্ত প্রকাশিত সংবাদ সম্বন্ধে জাপ-সরকারেরই অগ্রণী হয়ে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করা উচিত,—ভারতীয় অতিথির এই মন্তব্যের উত্তরে জেনারেল কোয়াবে আক্ষেপের সুরে বলেন: "যুদ্ধকালীন জাপানের পাঁচজন নেতার সঙ্গে

চন্দর বোসের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিলো এবং এঁরা প্রত্যেকেই চন্দর বোসের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং এঁরা সবাই চন্দর বোসকে এশিয়ার একজন মহান আদর্শব্রতী ও শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা বলে মনে করতেন। এঁরা হলেন জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তোজো, পররাষ্ট্র-মন্ত্রী সিগুমাৎসু, চীফ অব দি স্টাফ সুগিয়ামা, জার্মানীর জাপ রাষ্ট্রদূত মিঃ সিবু সাওয়া এবং জাপানের দেশরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল ওসামা। এঁদের মধ্যে তিনজনেরই দেহান্ত ঘটেছে এবং জীবিত দু'জনে লোক-চক্ষুর অন্তরালে সুদূর গ্রামাঞ্চলে রিটায়ার্ড জীবনযাপন করছেন।"

সন্ধান করে জানতে পেরেছি যে, শা'নওয়াজ কমিশন এই দু'জন প্রাক্তন জাপ-নেতার সাক্ষ্য গ্রহণের চেষ্টা করেনি।

জেনারেল কোয়াবে নেতাজী সম্বন্ধে একটি বই লিখেছেন,—এই বইটির নাম 'সুভাষচন্দ্র বোস ও জাপান।' এই বইটিতে নেতাজীর জীবন ও রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি নিজের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই বইটি সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজীর বৈপ্লবিক কার্যক্রম, অস্থায়ী স্বাধীন ভারতীয় সরকার পরিচালনা এবং ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সামরিক অভিযান পরিচালনায় তাঁর নেতৃত্ব। এই সংযতবাক্ ধীর ও শান্ত রিটায়ার্ড জেনারেলের কথাবার্তায় নেতাজীর প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের অভিব্যক্তি ফুটে উঠছিল তা' বিস্ময়কর। অন্যান্য জেনারেলদের কণ্ঠেও একই মনোভাব প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। জেনারেল কোয়াবে তাঁর বইটিতে নেতাজীর রাজনীতি, রাজনৈতিক আদর্শ, ভারত ত্যাগ, জার্মানীতে তাঁর কার্যক্রম, নেতাজীর আন্তর্জাতীয় সমীক্ষা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আগমন, আই-এন-এ এবং আজাদ হিন্দ্ সরকার গঠন, আজাদ হিন্দ্ অভিযান পরিচালনা ইত্যাদি অনেক বিষয়ের আলোচনা করেছেন। নেতাজীর ব্যক্তিত্ব, বীর্যবত্তা ও সামরিক নেতৃত্বের এবং তাঁর অপূর্ব ভারত-প্রেমের অনেক তথ্য ও ঘটনা রয়েছে এই বইটিতে।

কী নির্ভীক দুঃসাহসী আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিত্ব ছিল নেতাজীর, তার অনেক ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা জেনারেল কোয়াবে যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন তা' রোমাঞ্চকর। তিনি বললেন : "আই-এন-এ যখন মণিপুরে প্রবেশ করেছে সেই সময়ে তিনি সুপ্রীম কম্যাণ্ডার-রূপে একদিন সীমান্তের হেড কোয়ার্টারে একটি ফৌজের ইন্‌স্পেকশন করছিলেন। ঠিক সেই সময়ে শত্রুপক্ষের বিমান-বাহিনী এসে খুব নীচু থেকে মেশিন-গানিং সুরু করে দেয়। সেখানে অনেক আই-এন-এ, জাপানীজ ও বার্মিজ অফিসার উপস্থিত ছিলেন। শত্রুর এরূপ আকস্মিক ও অতর্কিত আক্রমণে সবাই হতভম্ব হয়ে প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়লেন। অনেকেই ছিটকে গিয়ে গড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু চন্দর বোস অবিরত বুলেট বর্ষণের মধ্যেও অচঞ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং নিরুদ্বেগ কণ্ঠে কম্যাণ্ড দিলেন ডিসপার্স করার জন্য। সব সৈনিক ইন্‌স্পেকশন গ্রাউণ্ড থেকে চলে গেলে তিনি এমনভাবে ধীরপদক্ষেপে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন যেন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর আর্মি ইন্‌স্পেকশনের কাজ সম্পন্ন হলো।"

এই ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে জেনারেল কোয়াবে বল্‌লেন : "চন্দর বোসের ব্যক্তিত্ব ছিল 'ভল্‌কেনোর' মত,—তাই তিনি একটি বৈপ্লবিক সরকার ও ফৌজ গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ছিল আই-এন-এ ও অস্থায়ী ভারত সরকারের মধ্যে সর্বত্র।"

জাকার্তায় ডঃ সুকর্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়নি, কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের ত্রয়ী নেতৃত্বের আর দু'জন তথা ডঃ হাট্টা ও ডঃ শাহরিয়ারের সঙ্গে কথা বলেছি। টোকিওর সেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্মেলনে দর্শক-প্রতিনিধি হিসাবে সেদিনের যুবক-নেতা সুকর্ণও উপস্থিত ছিলেন। ডঃ হাট্টা বলেন যে, এই সম্মেলনে 'সুভাষ বোসে'র কাছ থেকে ড সুকর্ণ গভীর প্রেরণা

নিয়ে ফিরে আসেন। জাকার্তায় নেতাজীর বৈপ্লবিক আত্মমর্যাদা-বোধ সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা শুনি, তথাকার ভারতীয় চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্টের মুখে। জাপ অধিকৃত জাভায় এটা একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, যে-কোন বিদেশীর সেখানে যাওয়ার পরে প্রথমে জাপ সামরিক অধিকর্তার বাড়িতে গিয়ে তাঁকে সম্মান জানিয়ে তবে অন্য কাজে যেতে হতো। অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের রাষ্ট্র-প্রধানরূপে নেতাজী সর্বপ্রথম জাকার্তায় গেলে জাপ গভর্ণর নিজে বিমান-বন্দরে উপস্থিত না হয়ে তাঁর সেক্রেটারীকে পাঠিয়েছিলেন অভ্যর্থনা করে নেতাজীকে গভর্ণরের বাংলোয় নিয়ে আসার জন্যে। জাপ-অধিকর্তার এই কূটনৈতিক দায়িত্ব ও সৌজন্যবোধের অভাব দেখে নেতাজী খুব বিরক্ত বোধ করেন এবং জাপ-জেনারেলের সেক্রেটারীর সঙ্গে নিজের সেক্রেটারীকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি সোজা ভারতীয়দের দ্বারা আয়োজিত জনসভায় চলে যান। অক্ষ-শক্তিবর্গ কর্তৃক স্বীকৃত ডিপ্লোম্যাটিক স্ট্যাটাসে নেতাজীর স্থান ছিল জাভার জাপ গভর্ণরের চেয়ে অনেক উচ্চে। দ্বিতীয় চিন্তায় নিজের আচরণ সম্বন্ধে সেকথা উপলব্ধি করে জাপ-গভর্ণর নিজেই শেষ পর্যন্ত নেতাজীর সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাৎ করে এই অজুহাত দেখান যে, তিনি 'জাকার্তায় ছিলেন না বলে বিমানবন্দরে উপস্থিত হতে পারেননি,—তাই খুবই দুঃখিত।' জাপ গভর্ণরের দাপটে সে সময়ে জাভানীজরা তটস্থ থাকতো। এই ঘটনাটি ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনে গভীরভাবে 'বিদ্রোহীর আত্মমর্যাবোধ' সৃষ্টি করে।

মালয়ের রাজনৈতিক নেতারা তো প্রায় সর্বভাবে নেতাজী ও আজাদ-হিন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মালয় সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী সে সময়ে আজাদ হিন্দের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন,—কারণ, মালয় ছিল আজাদ হিন্দ্ সংগঠনের প্রধান কেন্দ্র। সিঙ্গাপুরের আরেকজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী,ডেভিড মার্শেল, নেতাজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সিঙ্গাপুরের সেই আজাদ হিন্দ্ শহীদ স্তম্ভটির পুনর্নির্মাণ এবং নেতাজীর সিঙ্গাপুরের বাসগৃহ ও আজাদ হিন্দ্ হেড কোয়ার্টার ক্রয় করে সেখানে ভারতীয় সংস্কৃতি মিশন স্থাপনের প্রস্তাব করে সিঙ্গাপুরের ভারতীয়েরা ভারতীয় অতিথির উপস্থিতিতে যে প্রস্তাব করেন, মালয় সরকার ও ডেভিড মার্শেল তার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। ফিরে এসে আমাদের পরলোকগত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সিঙ্গাপুরের ভারতীয়দের এই প্রস্তাব একটি স্মারকলিপির আকারে তাঁদের হাতে দিয়েছিলাম। রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে তিনি স্মারকলিপিটি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেবেন। প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাবটি শুনে নিরুত্তর ছিলেন। পরে লোকসভায় ..মতী লক্ষ্মী মেনন জানান যে এই প্রস্তাবের প্রতি সিঙ্গাপুর সরকার সহানুভূতিশীল নন। কিন্তু এখন ?—এর পরেও বহুবার ভারতীয় পার্লামেণ্টে সিঙ্গাপুরের শহীদ স্তম্ভটি পুনর্নির্মাণ, এবং নেতাজীর বাসগৃহ ও আজাদ হিন্দ্ সরকারের হেড কোয়ার্টারটি ক্রয় করে সেখানে ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন স্থাপনের দাবী উত্থাপিত হয়েছে কিন্তু সরকার আজও অনুদ্যোগ।

—যুগান্তর

নেতাজী প্রসঙ্গে নবচেতনা

চলো দেহলী! রক্তরাঙ্গা আজাদ হিন্দ্ মুক্তি ফৌজের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল একদিন নেতাজীর দেওয়া সংগ্রাম-ধ্বনি। এতদিন পরে শানে হিন্দের সেই ঐতিহাসিক তরবারি, ভারতের ক্ষাত্র-বীর্যের শাণিত প্রতীক এলো দিল্লীর বুকে। কিন্তু রাজধানীতে শুধু তরবারি এলো, এলেন'না মহানায়ক সুভাষচন্দ্র!

উন্মুক্ত হলো লালকেল্লার লৌহ তোরণ। মহাক্ষত্রিয়ের পাদুকা ও তরবারী বুকে নিয়ে এগিয়ে চললো সামরিক শকট। নেতাজীর জয়ধ্বনিতে মুখরিত লালকেল্লা, উল্লসিত জনতার করতালিতে হর্ষোৎফুল্ল কেল্লাপ্রাঙ্গণ। সামরিক ব্যাণ্ড বাজছে তালে তালে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে শকট এসে থামলো দেওয়ানী-আমের সামনে। নেতাজীর তরবারি ও পাদুকা মাথায় তুলে নিয়ে অগ্রসর হলেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অফিসাররা। উত্তেজনা, আগ্রহ ও অভিবাদনে এক উজ্জ্বল চাঞ্চল্য সারা লালকেল্লায়।

কিন্তু! এই বিপুল উল্লাসের মধ্যেও এক অব্যক্ত বেদনায় মনটি যেন হারিয়ে গেল কোন নিঃসীমতার অন্তরালে। রামচন্দ্রের পাদুকা মাথায় নিয়ে ভরতও একদিন ফিরে এসেছিলেন না রাম-বিহীন রাজপুরীতে? পুরবাসীর বুক ফেটে সেদিন আর্তরব উঠেছিল না! পাদুকা এলো, কিন্তু ভারতনন্দন রামচন্দ্র কোথায়? তেমনি আরেক অসীম বেদনা এযুগের রাজপুরীকে আকুল করে তুললো। তরবারি এলো, পাদুকা এলো—কিন্তু প্রিয়দর্শন সুভাষচন্দ্র কোথায়? কোথায় ভারত-প্রাণ নেতাজী?

আনন্দ বেদনায় আন্দোলিত হয়ে সেদিন—ওই ১৫ই ডিসেম্বর দিল্লী এক্সপ্রেস রওনা হলো দিল্লী অভিমুখে। রেলের বিশিষ্ট

কামরায় ফুলমালায় সুসজ্জিত নেতাজীর তরবারি। বাইরে শ্রদ্ধালু জনতার কণ্ঠে নেতাজীর জয়ধ্বনি। যারা এসেছে স্টেশনে তরুণই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। তারুণ্যের জ্বলন্ত প্রতীক সুভাষচন্দ্রকে শ্রদ্ধা জানাতে বাংলার তরুণেরাই তো আসবে। নেতাজী যে তাদের ভাবী জীবনের দীপ্ত দিশারী!

বাংলার প্রতি স্টেশনে এলো জনতা। লাইন করে দেখে গেল নেতাজীর তরবারি। ভোর হতেই গাড়ী এসে দাঁড়াল পাটনার প্লাটফর্মে। বিহারের সশস্ত্র পুলিশ আগে থেকেই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গীন তুলে তারা সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানালো নেতাজীর তরবারিকে। দলে দলে জনতা এসে শ্রদ্ধাতর্পণ করে গেল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি।

নেতাজী জিন্দাবাদের বিপুল রোলের মধ্যে হুস হুস করে দিল্লী এক্সপ্রেস্ আবার চলতে শুরু করলো। তেমনি প্রতি স্টেশনে উদ্বেল সম্বর্ধনা, জয়ধ্বনি, তেমনি করতালি, হর্ষরোল। দুপুর গড়িয়ে ত্রিবেণী পার হয়ে গাড়ী এসে প্রবেশ করলো প্রয়াগে। সংবাদ আগেই প্রচারিত হয়েছিল শহরে। দু'পাশের প্রতি অলিন্দে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে উন্মুখ প্রয়াগবাসীরা। ট্রেন এসে থামলো এলাহাবাদে। কিন্তু এ যেন কোন স্টেশন নয়, এক বিপুল, বিরাট উদ্বেলিত জনসমাবেশ। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, ওভার ব্রীজে, বাইরের রাস্তায় কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই,—নেতাজীর পাদুকা ও তরবারি দর্শনার্থী মানুষ আর মানুষের ভীড়। ট্রেণ থামার অল্প সময়ের মধ্যেই বন্দেমাতরম্ গান হলো, বহু প্রতিষ্ঠান থেকে মালা দেওয়া হলো। জনতার এই ভীড় এত প্রচণ্ড ছিল যে, তরবারি ট্রেনের কামরার বাইরে এনে উঁচুতে তুলে ধরে দেখাতে হল নেতাজী-অনুরাগী জনতাকে—তারপরে ট্রেণ ছাড়ার অনুমতি মিললো জনতার কাছ থেকে।

এলাহাবাদ থেকে গাজিয়াবাদ পর্যন্ত সমস্ত স্টেশনেই এলো অগণিত জনতা। উত্তরপ্রদেশের জনসাধারণের কি আক্ষেপ—তারা আগে জানে না, নইলে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে লক্ষ লক্ষ কিষাণ আসতো তাদের শানে হিন্দের তরবারি দর্শনে। বিনিদ্র রাতেও

কি আনন্দ সবার—রাত বারটা, দুটো, তিনটা, চারটা—কনকনে হাড়ভাঙ্গা শীতকে অগ্রাহ্য করে জনতা এসেছে প্রতি স্টেশনে নেতাজীর তরবারির সম্বর্ধনায়।

গাজিয়াবাদ থেকে আলাদা করে ট্রেণের কামরাটি দিল্লীর দিকে নিয়ে চললো একটি পাইলট ইঞ্জিন। ধীরে ধীরে যমুনা পার হয়ে ট্রেণ গিয়ে পৌঁছলো রাজধানীর স্টেশনে। রেলের কামরায় নেতাজীর তরবারির সামনে দাঁড়িয়ে তখন চলছে সঙ্গীত: 'হম দেহলী, দেহলী জায়েঙ্গে'। সম্মিলিত কণ্ঠে গাইছে বসু-পরিবারের কিশোর-কিশোরীরা।

ট্রেণ থামলো এসে বিস্তীর্ণ প্লাটফর্মে। পাদুকা ও তরবারি নামানো হলো। লোকসভার স্পীকার এলেন সম্বর্ধনা করতে, তাঁর দু-পাশে দণ্ডায়মান পার্লামেণ্টের সদস্যবৃন্দ। কিন্তু অগণিত উন্মুখ জনতার কি আর ধৈর্য্য থাকে! ফিল্ম ক্যামেরা ও টেলিভিসনের লোকেরা ছবি তুলছে, আর জনতা অধৈর্য আবেগে ঠেলে নিয়ে চলছে পাদুকা, তরবারি।

তরবারি উঠলো সামরিক শকটে। দু-পাশে দিল্লীর সারিবদ্ধ সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী সামনে পুলিশ ব্যাণ্ড। এগিয়ে চলছে শকট, দু-পাশে কাতারে কাতারে জনতা। রাস্তার পাশে পাশে নেতাজীর ছবি, সঙ্গে এক শাণিত তরবারির দৃপ্ত ভঙ্গিম উদ্যত চিত্র। সরকারী পাবলিসিটি বিভাগ থেকে বিরাটাকার নেতাজীর ফটো তৈরী হয়েছে। তাই ভি-আই-পি পোস্টে পোস্টে সগৌরবে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে নেতাজী সম্বর্ধনায়।

শানে হিন্দের তরবারি ও পাদুকাবাহী সামরিক শকট এগিয়ে চলছে চাঁদনীচকের ভিতর দিয়ে। পথে পথে অসংখ্য তোরণ, আশে-পাশে বিপুল বিশাল জনস্রোত। দিল্লীবাসীদের মুখে কী প্রচণ্ড জয়ধ্বনি! 'হামারা নেতা—নেতাজী', 'দেশকা নেতা—নেতাজী', 'ভারত কা নেতা—নেতাজী' 'নেতাজী—আয়েঙ্গে'। একসময়ে মনে হলো সামরিক শকটটির পিছনে ভেসে আসছে যেন এক বিশাল জনসমুদ্র। কত যে লোক হয়েছে তার সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। মুহূর্তের মধ্যে মনের আকাশে ঝলক দিয়ে উঠলো একটি কল্প-চিত্র।

যদি নেতাজী স্বয়ং আসতেন কলকাতা থেকে রাজধানীতে? তা' হলে? জনতরঙ্গের উল্লাসে উচ্ছ্বাসে ভারত-সমুদ্রই হয়তো তা'হলে ভেঙ্গে পড়তো দিল্লীর রাজপথে।

শোভাযাত্রা এগিয়ে এলো লালকেল্লার মুখে। বিস্মৃত এই লালকেল্লাকে নেতাজীই আবার জীবন্ত করে তুলেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম লক্ষ্যরূপে নেতাজীই আবার নির্দিষ্ট করেছেন লালকেল্লাকে। ধ্বনি তুলেছেন তিনি "চলো দেহলী পুকারকে কৌমী নিশান সামহালকে, লালকেল্লে পে লহরায়ে লহরায়ে যা।" সেই লালকেল্লায় এলো নেতাজীর তরবারি। এলো ভারতের মুক্তি ফৌজের শাণিত প্রতীক,—ভারতের বীর্যধর্মের বিদ্যুৎ-শপথ!

নেতাজীর তরবারি দিল্লী নেওয়ার শর্ত ছিল,—রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্বর্ধনা জানাতে হবে মহাক্ষত্রিয়ের এই তরবারিকে, সেই শর্ত পূর্ণ হয়েছে। ভারতীয় রাষ্ট্রীয়-সত্তার প্রতীকরূপে রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকীর হোসেন সম্বর্ধনা করলেন নেতাজীর তরবারিকে। ঐতিহাসিক দেওয়ানী-আমের মঞ্চে স্থাপিত হলো মহানায়কের তরবারি,—অগ্নিহোত্রীর বিজয়-নিশান। তরবারির পাশে শোভিত ছিল নেতাজীর এক বিরাট প্রতিকৃতি। যেন জ্বল জ্বল করছিল মঞ্চটি এক অপূর্ব সৌর-দীপ্তিতে। মঞ্চে উপবেশন করলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং নেতাজীর জনকয়েক সুপরিচিত সহকর্মী। মঞ্চের সামনে ছিল দু-হাজার আসন। বিশাল জনতা লালকেল্লার বাইরে থেকেই ফিরে গেছে। এই আসন সংরক্ষিত ছিল মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, পার্লামেন্টের সদস্য, কূটনৈতিক অতিথিবৃন্দ এবং আরও কিছু নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য। দু-হাজার আসনেও স্থান হয়নি, দু-পাশে দাঁড়িয়ে ছিল আরও অনেক দর্শনার্থী বিশিষ্ট ব্যক্তি।

রাষ্ট্রপতি বললেন,—'গান্ধীজীর অহিংস পথ থেকে ভিন্ন হলেও ভারতের মুক্তি সংগ্রামে নিজের বৈপ্লবিক অবদানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র অনন্য।' উপরাষ্ট্রপতি ডঃ গিরি আবেগোচিত কণ্ঠে জানালেন,—'নেতাজীর দুঃসাহসী জীবন উপকথার কল্পনাতীত গরিমায় রোমাঞ্চকর,—তিনি ভারতের জাতীয় পরিকল্পনার জনক।'

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বললেন—'আমার ছোটবেলায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চোখে যে অপূর্ব দীপ্তি দেখছি সেই সতেজ অনুভূতি আজও আমার মনে জেগে রয়েছে।'

নেতাজীর তরবারির রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনা হলো, কিন্তু নেতাজীর প্রতি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা? সত্যিই কি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার কাছে নেতাজীর চোখের দীপ্তি এখনও এক প্রেরণার উৎস? তা'হলে? আজ তো দুই যুগ পার হয়ে গেল,—তবুও নেতাজীর প্রতি এমন রাষ্ট্রীয় উপেক্ষা কেন? তবু কেন সংসদ ভবনের কেন্দ্রীয় কক্ষে অন্যান্য জাতীয় নেতাদের প্রতিকৃতির স্থান হলেও মহানায়ক সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতির স্থান পেলো না এখনও? কেন নেতাজীর শৌর্যময় ঐতিহ্যের কোন স্থান নেই রাজধানী দিল্লীর বুকে? কেন নেতাজীর জন্মদিবস আজও সর্বভারতীয় স্তরে পালন করা হয় না? কেন নেতাজীর প্রতিকৃতি আজও ভারতীয় সামরিক শিবিরে নিষিদ্ধ? কেন সর্বভাবে নেতাজীর প্রতি রাষ্ট্রীয় বঞ্চনা ও অবহেলা? অমর-বীর্য ভারত-পথিকের কি হলো—কেন তার চূড়ান্ত সন্ধান হল না আজও? নেতাজীর প্রতি ভারতীয় রাষ্ট্রের কেন এমন অকৃতজ্ঞ উপেক্ষা, অবহেলা ও অসহ্য ঔদাসীন্য?

নেতাজীর প্রতি রাষ্ট্রীয় অকৃতজ্ঞতার কলঙ্ক কী চরমভাবেই না অপরাধী করা হয়েছে ভারতের গোটা জাতীয় জীবনকে! কিন্তু মহাকালের নির্মোঘ আঘাতে যুগবদলের পালা সুরু হয়েছে, ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের ঈর্ষা ও দ্বন্দ্ব, রাজনীতির সঙ্কীর্ণতা আজ যেন বিস্ময়মান। বিশ বছর পরে ভারতীয় সংসদে আজ এক নতুন সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে মহানায়ক সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে। সুভাষচন্দ্রের প্রতি যে জাতীয় কর্তব্য করা হয়নি একথা আজ ক্ষুব্ধ চিত্তে সংসদের বহু সদস্যই স্বীকার করছেন। তাই ভারতীয় সংসদে এখন নেতাজী প্রসঙ্গ উঠলে সবই সাগ্রহ সম্ভ্রমে সেই আলোচনায় যোগ দেন, পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনেন নেতাজী প্রসঙ্গ। সংসদ ভবনের কেন্দ্রীয় কক্ষে নেতাজীর প্রতিকৃতি যে অবশ্যই রাখতে হবে একথা আজ অধিকাংশ সংসদ সদস্যই অনুভব করছেন। লালকেল্লায় যে 'সোনে লেমিয়ারে' দেখানো হয় সেখানে নেতাজীর স্বকণ্ঠ-বাণী, জয়হিন্দ ধ্বনি ও আজাদ

হিন্দের গান সংযোজনার প্রয়োজনীয়তার প্রতিশ্রুতি অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন মন্ত্রী শ্রীকরণ সিং। বাইশ বছর পরে উনিশ হাজার আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বকেয়া বেতন, পেনশন ও অ্যালাউন্সের দাবীও সরকার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের দাবী নিয়ে আলোচনাকালে সংসদ সদস্যদের তীব্র তিরস্কারের বিরুদ্ধে কোন সাফাই গাইতে পারেননি ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। দিল্লীর কণ্ঠ ও দৃষ্টি বদল হতে সুরু করেছে,—নেতাজীর প্রতি জাতীয় শ্রদ্ধা তর্পণের নতুন প্রচেষ্টা সৃষ্টি হয়েছে রাজধানীতে।

নেতাজীর প্রতি যোগ্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভারত, জাপান ও ফরমোজা সরকারের যৌথ সহযোগিতায় নেতাজী রহস্যের নতুন ও চূড়ান্ত অনুসন্ধানের দাবীতে সংসদ সদস্যেরা রাষ্ট্রপতির কাছে যে স্মারকলিপি দিয়েছেন অল্প প্রয়াসেই তাতে সাড়ে তিনশ' সদস্যের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। কিছুদিন অপেক্ষা করলে আরও একশ' দেড়শ' সদস্যের স্বাক্ষর গ্রহণ করা কঠিন হতো না।

দল মত নির্বিশেষে সবাই এই স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর দিয়েছেন —দেয়নি শুধু কম্যুনিস্ট সদস্যেরা। নেতাজীর তরবারির সম্বর্ধনায়ও একমাত্র তাঁরাই ছিলেন অনুপস্থিত। ভারতে যাদের জন্ম তারা যে ভারত-পথিকের প্রতি কেন এমন শ্রদ্ধাহীন,—দেশবাসীর কাছে নিশ্চয়ই তার জবাব দিতে হবে একদিন।

বরফ গলছে। জাতীয় সঙ্কটের এই দুর্দিনে দিশেহারা দেশবাসী ও জাতীয়তাবাদী সংসদ সদস্যের মনে এক নতুন সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কাজ এখনও অনেক বাকী। নেতাজী-প্রিয় ভারতীয় জনতার জাগ্রত উদ্যম এখন বিশেষ প্রয়োজন। রামচন্দ্রের পাদুকা মাথায় তুলে এনেছিলেন ভরত,—রামচন্দ্রও ফিরে এসেছিলেন একদিন। কিন্তু ভারত-প্রাণ নেতাজী? তাঁর পাদুকা এলো দিল্লীতে, কিন্তু তিনি? এই প্রশ্নের শেষ উত্তর ভারতকে খুঁজে পেতেই হবে।

—যুগান্তর

———